দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ চৈতন্য জীবন-দর্শন অন্বেষণ

বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম চৈতন্য-জীবনী কাব্য হল বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'। বাংলা ভাষায় চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ প্রণয়নের আদি পুরোহিত কবি বৃন্দাবন দাস। অবশ্য বৃন্দাবন দাসের পরে বাংলা ভাষায় আরও কয়েকজন চৈতন্যজীবনী প্রণেতার নাম পাওয়া যায়। যেমন— লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস প্রমুখ। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বৃন্দাবন দাস বাংলা ভাষায় জীবনী গ্রন্থ রচনার সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক। চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবন দাসের এই কাব্যই সর্বাধিক সুপরিচিত, জনপ্রিয় এবং কাব্যগুণান্বিত। বাংলার বৈষ্ণব সমাজে 'চৈতন্যভাগবত'-এর মত এত জনপ্রিয় ও আদরণীয় জীবনীগ্রন্থ আর নেই। ড. বিমানবিহারী মজুমদার 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন—'' 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পণ্ডিতের গ্রন্থ— আপামর জনসাধারণের নহে। শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা প্রগাঢ় প্রেমভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেইজন্য হৃদয়গ্রাহী।''[১] এককথায়, ভক্তি ও অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টিতেই মহামানবের আচরণের তথা জীবন-দর্শনের বর্ণনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। অতি সহজ-সরল কাব্যোপোম ভাষায় তিনি যেভাবে চৈতন্য জীবন উপস্থাপন করেছেন এমন অন্য কোন চৈতন্য জীবনীকাব্যে লক্ষ করা যায় না। আর এই কারণে চৈতন্য জীবনীকারদের মধ্যে একমাত্র বৃন্দাবন দাসের কাব্যেরই হাতে লেখা পুথি এত অধিক সংখ্যক পাওয়া যায়।

আমরা জানি, যে কোন সাহিত্য সৃষ্টিরই মূল উৎস রচয়িতার নিজস্ব মন ও মনন। মানসলোক থেকেই প্রধানত সাহিত্যের সূত্র আবিস্কার করে থাকেন সাহিত্যিক। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। ভক্ত বৃন্দাবন দাসের মনের একটি নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা থেকেই কাব্যটি ভক্ত সাধারণ তথা পাঠক সমাজের কাছে এসেছে। বৃন্দাবনের এই মানস আকাঙ্ক্ষার কথাটি গ্রন্থের একাধিক স্থানে একই রকমের স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। বৃন্দাবন দাস অকপটে স্বীকার করেছেন —

> ''অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
> চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।। ৬০
> চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে শেষের কৃপায়।
> যশের ভাণ্ডার বৈসে শেষের জিহ্বায়।। ৬১''[২]

মনে রাখতে হবে, বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের কোন লীলারই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না; যদিও চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে, চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও বৃন্দাবন শৈশব

থেকে যে আবহাওয়া-পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন, সেখানে চৈতন্যভক্তির ধারা স্রোত ছিল প্রবহমান। পাশাপাশি, তাঁর দীক্ষাগুরু নিত্যানন্দ ছিলেন আবার চৈতন্যভক্ত পরিকরদের মধ্যে অন্যতম। ফলে প্রায় স্বাভাবিক কারণেই বৃন্দাবন দাসের মধ্যে ঘটে যায় চৈতন্য ভক্তির অঙ্কুরোদ্গম। মানসলোকে এই চৈতন্যভক্তি থেকেই যে 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটির জন্ম, বৃন্দাবন দাস ব্যবহৃত 'অন্তর্যামী' শব্দটি তারই ইঙ্গিত দেয়। তবে তাঁর এই অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল নিজ গুরু তথা নিত্যানন্দের আদেশ। নিত্যানন্দের আদেশকে শিরোধার্য করে তাঁরই কৃপায় যে বৃন্দাবন দাস তাঁর মানস আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ দিয়েছেন তার প্রমাণ —

''বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম।। ৯৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।। ১০০''[৩]

সুতরাং, একদিকে মানস আকাঙ্ক্ষা এবং অপরদিকে গুরুদেব নিত্যানন্দের আদেশ বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্য জীবন চরিত কাব্য 'চৈন্যভাগবত' রচনায় উৎসাহিত করে।

আমরা জানি, নবজাতকের জন্ম পরিচয়ে প্রধানত দেখা যায়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ছাপ এবং সেই সূত্রেই হয় জাতকের জন্ম এবং বংশ পরিচয়। কিন্তু চৈতন্যভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবন দাসের জন্ম ও বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রে এই ধারার ব্যতিক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয়। এমনকি, এক্ষেত্রে তিনি নিজের পরিচয় প্রকাশে সমসাময়িক রচয়িতাদের পদাঙ্কও অনুসরণ করেন নি। প্রসঙ্গক্রমে, তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' রচনাকার অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ''চৈতন্য জীবনীকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থ মধ্যে নিজেদের বংশতালিকা, পরিচয় ইত্যাদি স্বল্পপরিসরে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস সম্বন্ধে আমরা অতি অল্প তথ্যই জানিতে পারিয়াছি; ....।''[৪] এই কারণে তাঁর জন্ম এবং জীবন বৃত্তান্ত প্রায় অস্পষ্টই রয়ে গেছে। বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্যজীবনীতে নিজের মাতা সম্পর্কে বলেছেন; চৈতন্য ভক্ত শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্কন্যা নারায়ণীর কথা। যেমন — অন্ত্যখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিজ পরিচয় দান প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন —

''সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান— বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র— নারায়ণী গর্ভজাত।। ১২১
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী'।। ১২২''[৫]

সুতরাং, বোঝা যায়, বৃন্দাবন দাস ছিলেন প্রভু নিত্যানন্দের সর্বশেষ ভৃত্য বা শিষ্য এবং চৈতন্যের অবশেষ পাত্র বা উচ্ছিষ্টভাজন নারায়ণীর পুত্র। আবার, চৈতন্যদেবের প্রভাবে চার বৎসরের বালিকা

শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণীর 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কাঁদবার প্রসঙ্গও ব্যক্ত করেছেন মধ্য খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে —

''সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা— নাম 'নারায়ণী'।। ৩১৮
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'।। ৩১৯
সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী— শ্রীগৌরচান্দ।
আজ্ঞা কৈলা ''নারায়ণী! কৃষ্ণ বলি কান্দ''।। ৩২০
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত।। ৩২১
অঙ্গ বাহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।। ৩২২''[৬]

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নবজাতকের এই জন্ম পরিচয় নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ, কারণ যেহেতু জন্মদাতার নাম অনুল্লেখিত। তবে, বৃন্দাবন জন্মদাতার নাম উল্লেখ না করলেও এ প্রসঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিত নামে বড় চৈতন্যভক্তের নাম করে বলেছেন যে, তাঁর জন্মদাত্রী নারায়ণী ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী। শ্রীবাস পণ্ডিতেরা ছিলেন চার ভাই — শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি এবং শ্রীকান্ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই চারজনের কাউকেই বৃন্দাবন দাস তাঁর মাতামহ হিসাবে চিহ্নিত করে যান নি। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে তবে কি শ্রীবাসের এই চারজন ভাই ছাড়াও অন্য একজন জ্যেষ্ঠ কেউ ছিলেন? অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গতই মন্তব্য করেছেন — ''প্রেমবিলাসে'র মতে শ্রীবাসের আর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাহার নাম নলিনী পণ্ডিত। তিনি পূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা নারায়ণী, বৃন্দাবন দাস এই নারায়ণীর পুত্র।''[৭]

যাই হোক, বৃন্দাবনের জন্মদাত্রীর একটি পরিচয় আমরা এক্ষেত্রে পেলেও জন্মদাতার পরিচয়টি অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়। বৈষ্ণবেরা অপ্রামাণিক বলে মনে করলেও এ বিষয়ে নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থটির সাহায্য নিয়ে জানা যায় বৃন্দাবনের পিতৃপরিচয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ — (১) বৃন্দাবন দাসের পিতা বিপ্র বৈকুন্ঠনাথ; (২) বৈকুন্ঠনাথ কুমারহট্টবাসী ছিলেন (৩) বৃন্দাবন দাস যখন মার্তৃগর্ভে সে সময় পিতা বৈকুন্ঠনাথের মৃত্যু হয়। সুতরাং, বৃন্দাবন দাসের পিতৃপরিচয় সংক্রান্ত উপরি উল্লিখিত তথ্যগুলির সত্যতা মেনে নিলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে — বৃন্দাবন দাসের পিতা ব্রাহ্মণ সন্তান বৈকুন্ঠনাথ এবং বৃন্দাবন দাস ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পরলোক গমন করেন।

তবে, বৃন্দাবন দাসের জন্ম সংক্রান্ত এ তথ্যগুলির সত্যতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ

করেছেন। তাই বৃন্দাবন দাসের জন্ম ও বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রে এ ধরনের অভিমতগুলি নিতান্তই প্রতিকূল হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বৃন্দাবন দাস বৈকুণ্ঠনাথের ঔরসে সাধ্বী সতী নারায়ণীর গর্ভজাত সন্তান। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বৃন্দাবন দাস নিজে পিতার নাম কাব্যমধ্যে কোথাও উল্লেখ করেন নি। আসলে, কবি মনে হয় নিজেই তাঁর পিতৃপরিচয় দিতে চান নি।

বংশ পরিচয়ের মত বৃন্দাবন দাসের জন্ম সনও অনুমান নির্ভর। বৃন্দাবন দাস নিজে তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন তথ্য পরিবেশন করেন নি। আবার, সাহিত্য গবেষক-সমালোচক, ঐতিহাসিকেরাও অনেক অনুসন্ধান করেও একটি সর্বসম্মত জন্ম সনের সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। ফলে এক্ষেত্রেও অনুমান নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও বৃন্দাবন দাসের দেওয়া বিবরণকেই আশ্রয় করা সঙ্গত বলে মনে হয়। বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যে নিজে জানিয়েছেন, গয়া থেকে মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশের সময় বৃন্দাবন দাসের মাতা নারায়ণীর বয়স ছিল চার বছর। কবি কর্ণপূরের বিবরণেও এর সমর্থন মেলে। কবি কর্ণপূর তাঁর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'-য় আরও জানিয়েছেন যে, গয়া থেকে চৈতন্যদেবের প্রত্যাবর্তনের সময়টি ছিল ১৪৩০ শকের পৌষমাস এবং নারায়ণী মহাপ্রভুর কৃপালাভ করেন ঐ শকাব্দেরই পরবর্তী অর্থাৎ মাঘ মাসে। সুতরাং ১৪৩০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫০৮-১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণীর ঐ সময় বয়স ছিল চার। কিন্তু অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে স্পষ্ট জানিয়েছেন — ''এই মত অতি অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়। চারি বৎসরের বালিকার সসত্ত্বা হওয়া কোন লৌকিক-অলৌকিক ব্যাপারের দ্বারাই সম্ভব নহে।''[৮] তাই যেহেতু চোদ্দ বছরের পূর্বে কোন নারীর মাতৃত্ব লাভ সম্ভব নয় সেই হিসাবে বৃন্দাবন দাসের জন্ম সন (১৪৩০ + ১০) = ১৪৪০ শকাব্দ বা ১৫১৮-১৯ খ্রিষ্টাব্দ হওয়া উচিত। আবার, ড. বিমান বিহারী মজুমদারও যথার্থই প্রমানিক মন্তব্য করেছেন— ''শ্রীচৈতন্যভাগবতের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বিচারপূর্ব্বক আমি বৃন্দাবদ দাসের জন্মকাল ১৪৪০ শকের বা ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি স্থির করিতে চাহি।''[৯]

জন্মকালের মতই বৃন্দাবন দাসের পরবর্তী জীবন কাহিনিও অস্পষ্ট। শোনা যায়, নবদ্বীপের কাছে মামগাছিতে বৃন্দাবন দাসের বাল্যজীবন কেটেছে। এই গ্রামের কাছেই যে বড়গাছি গ্রাম ছিল, সেখানে মাঝে মাঝে নিত্যানন্দ বাস করতেন। এই সূত্রেই কবি বৃন্দাবন দাস অতি অল্প বয়সেই নিত্যানন্দের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। এই মামগাছিতে বাসুদেব দত্তের একটি সেবাপাট ছিল। সেই সেবাপাটের ভার নিয়েছিলেন নারায়ণী। বৃন্দাবন দাসও মায়ের সঙ্গে মামগাছিতেই থাকতেন। এখানেই বৃন্দাবন দাসের পাঠশালার প্রথম পাঠ থেকে শুরু করে টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন এবং পণ্ডিত্য অর্জন সমস্তই ঘটে। তবে, শোনা যায়, নিত্যানন্দ অপ্রকট হওয়ার পর বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপ থেকে প্রায় চার ক্রোশ পশ্চিমে বর্ধমানের দেনুড় গ্রামে চলে যান। সেখানে তিনি একটি সেবাপাট তৈরী করে গৌর-নিতাই বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠা করেন। কেউ কেউ বলেন, বৃন্দাবন দাস এই দেনুড়ে বসেই নাকি 'চৈতন্যভাগবত' লিখেছিলেন। তবে, বৃন্দাবন দাস যে দীর্ঘ জীবনের অধিকারী ছিলেন — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' রচনার সময় কালটিও আবার আমাদের কাছে অজ্ঞাত। নিজের জন্ম ও জীবন পরিচয়ের মত এক্ষেত্রেও বৃন্দাবন দাস নীরব ছিলেন। গ্রন্থারম্ভ কিংবা সমাপ্তি-এর কোন স্থানেই তিনি তাঁর গ্রন্থরচনার কালসীমার পরিচয় দিয়ে যান নি। ফলে নানা ঐতিহাসিক, সাহিত্য-গবেষক নানা সময় কালের উল্লেখ করে গেছেন। তবে, বলা বাহুল্য, সকলের দেওয়া তথ্যই অনুমান নির্ভর। তবে, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় শ্লোকটি মুরারি গুপ্তের কড়চা থেকে উদ্ধৃত হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, মুরারিগুপ্তের গ্রন্থ রচনার পর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' রচিত হয়েছিল। আবার, বৃন্দাবন দাস নিজে তাঁর কাব্যের মধ্যে যে সূত্র নির্দেশ করেছেন তা থেকেও একটা সম্ভাব্য গ্রন্থ রচনা কালের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। বৃন্দাবন দাস মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের এক জায়গায় বলেছেন—

> ''শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা— নাম 'নারায়ণী'।। ৩১৮
> অদ্যাপিহ বৈষ্ণব মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
> 'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী'।। ৩১৯''[১০]

এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'অদ্যাপিহ'-শব্দটির অর্থ আজ পর্যন্ত বা এখনও পর্যন্ত। এই শব্দের ব্যবহার ইঙ্গিত দেয় যে, 'চৈতন্যভাগবত' রচনার সময় নারায়ণী দেবী প্রকট ছিলেন না। অর্থাৎ নারায়ণী দেবীর মৃত্যুর পর এই গ্রন্থটি লিখিত হয়েছিল। তবে, 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি যে, বৃন্দাবন দাসের যুবক বয়সের রচনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ গ্রন্থের বর্ণনায় কবি বৃন্দাবন দাস এমন কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা তার অসহিষ্ণুতার ও যুবজনোচিত তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছে। যেমন —

> ''এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
> তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।। ১৫৬''[১১]

এই একই উক্তি তিনি কাব্যের মধ্যে বার বার ব্যবহার করেছেন। কবি যদি কাব্যটি যৌবনের মধ্য অথবা শেষ ভাগে লিখতেন তা হলে এতটা অসহিষ্ণু উক্তি তিনি ব্যবহার করতেন না, সে ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি ধৈর্য্য ও ক্ষমা প্রদর্শিত হত বলেই মনে হয়। তাই অধ্যাপক ড. বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বলতে হয় — ''১৫৪৬ হইতে ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাসের জন্ম যদি ১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার সময়ে তাঁহার বয়স হয় ২৮ হইতে ৩৩ বৎসর।''[১২]

এবার আসা যাক, বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটির নামকরণ বিষয়ে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম চরিতগ্রন্থের মর্যাদা পেলেও গ্রন্থখানির নামকরণ নিয়েও

নানা মতভেদ রয়েছে। এই সব বিতর্কের প্রধান কারণ হল বৃন্দাবন দাস- পরবর্তী চৈতন্যচরিত-রচয়িতাদের দেওয়া বিভিন্ন তথ্য ও মন্তব্য। ফলে গ্রন্থখানির আসল নাম আদতে 'চৈতন্যমঙ্গল' না 'চৈতন্যভাগবত' ছিল তা নিয়ে নানা মহলে সংশয় ও বিতর্ক বাড়তে থাকে। এই বিতর্ক জোরালো হয় প্রধানতঃ নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কিছু মন্তব্য এবং আধুনিক সমালোচক ড. বিমান বিহারী মজুমদারের দেওয়া তথ্যকে ভিত্তি করে। বৃন্দাবন দাসের পরবর্তী কবি দার্শনিক কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর পূর্বসুরীদের গ্রন্থ প্রসঙ্গে 'চৈতন্যভাগবত'কে একাধিক জায়গায় 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে উল্লেখ করেছেন।

১. "অরে মূঢ়লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল।। ২৯
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস— বৃন্দাবন দাস।। ৩০
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।। ৩১
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা।। ৩২
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি করিয়া উদ্ধার।। ৩৩
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ।। ৩৪
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।। ৩৫
বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার।। ৩৬"[১৩]

২. "বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল।। ৪০
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ।। ৪১"[১৪]

৩. "বৃন্দাবন দাস— নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্য মঙ্গল যেঁহো করিলা রচন।। ৫১

ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।

চৈতন্যলীলাতে ব্যাস— বৃন্দাবন দাস।। ৫২”[১৫]

কিন্তু, গৌরগুণানন্দ ঠাকুর প্রণীত ‘শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব’ গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি গল্প রচিত হয়েছে। লোচনদাস তাঁর ‘চৈতন্যমঙ্গল’ সমাপ্ত করে পড়ে দেখবার জন্য নরহরি সরকারকে দিলে তিনি লোচনকে বৃন্দাবন দাসের অনুমতি নিতে বলেন। কারণ — ইতিপূর্বে একই নাম দিয়ে বৃন্দাবন দাস ‘চৈতন্যমঙ্গল’ রচনা করেছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস নাকি লোচনের গ্রন্থ দেখে অভিভূত হয়ে নিজে স্বেচ্ছায় নিজ গ্রন্থের নাম পাল্টে ‘চৈতন্যভাগবত’ রাখেন। এ বিষয়ে গৌরগুণানন্দ ঠাকুর তাঁর ‘শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব’ গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা নিম্নরূপ —

“শ্রীবৃন্দাবনদাস বলিলেন, ‘লোচন! তুমি নরহরির অনুগ্রহে শ্রীনিত্যানন্দ যথার্থই উপলব্ধি করিয়াছ, কারণ গৌর নিত্যানন্দকে তুমি অভেদ মূর্তিতে বর্ণনা করিয়াছ। অদ্য হইতে তোমার গ্রন্থের নাম ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ ও আমার শ্রীচৈতন্যঙ্গলের নাম ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ হইল।’ যখন এই ঘটনা হয় তখন শ্রীবৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রচারিত হইয়াছে এবং ইহার সৌরভ শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট পঁহুছিয়াছে। এইজন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন দাসের গ্রন্থকে ‘চৈতন্যমঙ্গল’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌর নিত্যানন্দকে অভেদ মূর্তি বর্ণনা করায় লোচনের নিকট নিত্যানন্দগত প্রাণ বৃন্দাবন দাসের আর কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। এইজন্য তিনি এক ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন যে আমি প্রভুর ভগবত্তা বর্ণনা করিয়াছি এবং লোচন মাধুর্য বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব আমার গ্রন্থের নাম ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ হইল। বৃন্দাবন দাসের এই ব্যবস্থাপত্র দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামীগণ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।”[১৬]

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত উক্তি বৈষ্ণব ভক্তগণের স্বকল্পিত, এর কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। আবার এই নামভেদের সত্যতা নির্ণয়ে আধুনিক কালের গবেষক সমালোচক ড. বিমান বিহারী মজুমদার মন্তব্য করেছেন —

“আমার মনে হয়, বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম প্রথম হইতেই চৈতন্যভাগবত ছিল — কিন্তু চণ্ডীর মাহাত্ম্যসূচক গান যেমন চণ্ডীমঙ্গল, মনসার মাহাত্ম্যসূচক গান মনসামঙ্গল, তেমনি শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্যসূচক বাঙ্গালা বইকে চৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করা যায়। এইজন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসের বইয়ের নাম চৈতন্যমঙ্গল বলিয়াছেন।”[১৭] কিন্তু এই মন্তব্যের বিপক্ষে গিয়ে আমরা বলতে পারি, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত একজন দার্শনিক পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রন্থের আসল নাম ছেড়ে মঙ্গলকাব্যের অনুসরণে ‘চৈতন্যমঙ্গল’ নাম ব্যবহার করবেন — এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, কৃষ্ণদাসের সময়েও কাব্যটি ‘চৈতন্যমঙ্গল’ নামেই অভিহিত হত।

আবার, পাশাপাশি অনেকে এমনও বিশ্বাস করেন যে, বৃন্দাবন দাস নাকি তাঁর মায়ের অনুরোধেই

'চৈতন্যমঙ্গল' নামটি পরিবর্তন করে 'চৈতন্যভাগবত' রেখেছিলেন। তবে, উক্ত সকলের যুক্তি থেকেই এটুকু অনুভূত হয় যে, বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থখানির আদি নাম পরিবর্তন করে 'চৈতন্যভাগবত' রেখেছিলেন— একথা প্রায় সকল সমালোচকই বিশ্বাস করতে চান। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বৃন্দাবন দাস গ্রন্থটির নাম প্রথম থেকেই 'চৈতন্যভাগবত' রেখেছিলেন। কারণ, বৃন্দাবন দাস তাঁর এই গ্রন্থটিতে ভাগবতীয় লীলাকথার আধারেই চৈতন্যজীবনকে বর্ণনা করেছেন। এই 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে প্রায় বেদব্যাসের অনুরূপ নিষ্ঠায় চৈতন্যজীবনের ভাগবতীয় আদর্শ প্রতিফলিত। পরবর্তী জীবনী গ্রন্থকারের কাছে এই কারণেই তিনি 'চৈতন্য লীলার ব্যাস' নামে চিহ্নিত হয়েছেন। কারণ, মানব দেহধারী হলেও বৃন্দাবন দাসের কাছে চৈতন্যদেব স্বয়ং নারায়ণ কৃষ্ণ। একদা দ্বাপরে যিনি ব্রজলীলায় ব্রজবাসীদের প্রেমমাধুর্য দান করেছিলেন, তিনিই কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে। ভাগবতের 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণ' শ্লোকের উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যের ভাগবতীয় স্বরূপকে স্বীকার করেছেন। কাজেই মনে করা অনুচিত হবে না যে, গ্রন্থখানির নাম 'চৈতন্যভাগবত' এবং এই নামটি বৃন্দাবন দাস নিজেই দিয়েছিলেন।

কবি বৃন্দাবন দাস ঠিক কোন্ সময়ে 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন — এর কোন সুনির্দিষ্ট সন তারিখের তথ্য প্রমাণ কাব্যটির মধ্যে কবি দেন নি। তাই বিভিন্ন সমালোচকদের মধ্যে কাব্যটির রচনাকাল নিয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন কাব্যটির রচনাকাল প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে— ''১৫৩৫ খৃ. অব্দের বৈশাখ মাসে শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন; তাহা হইলে চৈতন্যপ্রভুর তিরোধানের দুই বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাব হয়; তিনি মহাপ্রভুকে দেখেন নাই বলিয়া বারংবার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন- ''হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখন" - (চৈ.ভা., আদি:১০ম অ. ও মধ্য, ১ম ও ৮ম অধ্যায়)। বৃন্দাবন দাস দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, এবং এই দীর্ঘ জীবন তিনি বৈষ্ণব সমাজে পরম আদরে অতিবাহিত করেন, খেতুরির উৎসব উপলক্ষ্যে 'বিজ্ঞবর' বৃন্দাবন দাস উপস্থিত ছিলেন;১৫৭৩ খৃ. অব্দে অর্থাৎ মহাপ্রভুর তীরোধানের ৪০ বৎসর পরে 'চৈতন্যভাগবত' ও 'নিত্যানন্দবংশমালা' রচনা করেন।"[১৮] কিন্তু শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মনে করেন এরও আগে গ্রন্থটি রচিত হয়। তিনি মন্তব্য করেছেন— ''চৈতন্যের তীরোধানের পরে যে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যমঙ্গল রচনায় হাত দেন তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। চৈতন্যের বর্তমান কালে কোন ভক্ত, বিশেষ করিয়া নিত্যানন্দের অনুচর, এ কাজে হাত দিতেই পারিতেন না চৈতন্যের তীব্র বিরক্তির ভয়ে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লীলা সূত্র বর্ণনার শেষে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

''শেষ খণ্ডে গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টবিংশতি বৎসর।।

সুতরাং চৈতন্যের তিরোভাব বৃন্দাবনের জানা ছিল। তবে চৈতন্যের তিরোধানের অল্পকাল পরেই যে

বইটি লেখা হইয়াছিল তাহার পরোক্ষ প্রমাণ কিছু আছে। গ্রন্থ রচনাকালে জ্যেষ্ঠ মাতামহ শ্রীবাস জীবিত ছিলেন, গদাধর পণ্ডিত জীবিত ছিলেন, নিত্যানন্দ জীবিত ছিলেন এবং অদ্বৈত জীবিত ছিলেন। চৈতন্যের দেহত্যাগের পর নিত্যানন্দ আট দশ বৎসর ও অদ্বৈত দশ বার বৎসর জীবিত ছিলেন। শ্রীবাস ও গদাধর ইহাদের বেশ কিছুকাল আগেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের বিবাহ ও পুত্র লাভের উল্লেখ করেন নাই। ইহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে। গ্রন্থরচনাকালে নিত্যানন্দ হয় দারপরিগ্রহ করেন নাই নয় তখন বীরভদ্রের জন্ম হয় নাই। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে চৈতন্যভাগবতের রচনার সমাপ্তিকাল ১৫৩৫-৩৬ অব্দ ধরিতে হয়। এমনও হইতে পারে, গ্রন্থ রচনা শেষ হইবার আগেই নিত্যানন্দের বিবাহ ও পুত্রলাভ হইয়াছিল। চৈতন্যের লীলাপ্রসঙ্গে সে ঘটনা তাৎপর্যহীন বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। চৈতন্যভাগবত যে অসমাপ্ত রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন অসমাপ্ত তাহার কোন উত্তর মিলে না।”[১৯] তবে, ড. বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় এই ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যের রচনাকলের সন-তারিখ নিয়ে যে গবেষণা করেছেন, তা নানান দিক থেকে যুক্তিসংগত বলে মনে হয়। তিনি তাঁর ‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’ গ্রন্থে বলেছেন যে,— “১৫৪৬ হইতে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাসের জন্ম যদি ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার সময়ে তাঁহার বয়স হয় ২৮ হইতে ৩৩ বৎসর।

শ্রীচৈতন্যভাগবত যে যুবকের রচনা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থের বর্ণনা অসহিষ্ণুতা ও যুবজনোচিত তেজস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের তত্ত্বকে যাঁহারা মানেন না, কবি তাঁহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা দেখাননি।

> “এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
> তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে।।”

এই উক্তি তিনি পুনঃপুন করিয়াছেন। কবি যদি যৌবনের মধ্য বা শেষভাগে গ্রন্থ লিখিতেন তাহা হইলে অধিকতর ধৈর্য্য ও ক্ষান্তি প্রদর্শন করিতেন।”[২০] সুতরাং ড. বিমানবিহারী মজুমদারের এই অভিমত অনুসারে বলতে পারি, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত কাব্যটি রচিত হয়—(১৫১৮ + ৩০) = ১৫৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। আমরা পূর্বেই বলেছি বৃন্দাবন দাসের লেখা ‘চৈতন্যভাগবত’ প্রথম বাংলা জীবনী কাব্য। এর আগে সংস্কৃতে চৈতন্য বিষয়ক কাব্য, নাটক কিংবা স্তোত্র রচিত হলেও পূর্ণাঙ্গ চৈতন্যজীবনী কাব্য বৃন্দাবন দাস-ই প্রথম রচনা করেন তাঁর কাব্যটিতে। কবি বৃন্দাবন দাস নিজেই তিন খণ্ডে কাব্যটি রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন — ১. আদিখণ্ড (পনেরো অধ্যায়ে সম্পূর্ণ), ২. মধ্যখণ্ড (ছাব্বিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ) এবং ৩. অন্তখণ্ড (দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ)। তিনটি খণ্ডে মোট অধ্যায়ের সংখ্যা (১৫ + ২৬ + ১০) = ৫১ এবং ছত্র সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। কবি বৃন্দাবন দাস খণ্ড বিভাগের এই পরিকল্পনা যেমন কাব্যটির শুরুতেই করেছিলেন ঠিক তেমনি প্রতিটি খণ্ডের বিষয়সূচিও তিনি আদি খণ্ডের প্রথম অধ্যায়েই করে

দিয়েছেন। কাব্যটির শুরুতেই তিনি বলেছেন —

“মন দিয়া শুন ভাই! শ্রীচৈতন্য কথা।
ভক্ত সঙ্গে যে যে লীলা কৈল যথা তথা।। ৬৮
ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড নাম।। ৬৯
আদিখণ্ডে প্রধানত বিদ্যার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন প্রকাশ।। ৭০
শেষখণ্ডে সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড়ক্ষিতি।। ৭১”[২১]

আদিখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের ‘বিদ্যার বিলাস’-এর বর্ণনার কথা তিনি বললেও জন্ম থেকে শুরু করে চৈতন্যদেবের গয়াগমন পর্যন্ত যে বর্ণনা করা হবে তা বৃন্দাবন দাস কাব্যের প্রথম অধ্যায়েই জানিয়েছেন—

“বাল্যলীলা আদি করি যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি আদিখণ্ডের বিলাস।। ৯৮”[২২]

ঠিক একই ভাবে, বৃন্দাবন দাস মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশের কাহিনি বর্ণনার কথা জানিয়ে প্রথম অধ্যায়েই বলেছেন —

“মধ্যখণ্ডে সব জীব উদ্ধার কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে।। ১৩১
কীর্ত্তন করিয়া আদি, অবধি সন্ন্যাস।
এই হৈতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস।। ১৩২”[২৩]

আবার, শেষ খণ্ডের বিষয় যে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে নীলাচলে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অষ্টবিংশতি বছর অতিবাহিত করার কাল পর্যন্ত বর্ণিত হবে, তার সূত্র জানিয়ে বৃন্দাবন দাস প্রথম অধ্যায়েই বলেছেন —

“শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ সংবৎসর।। ১৬০
শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তরিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস।। ১৬১”[২৪]

সুতরাং, আদি খণ্ডের মত মধ্য ও শেষ খণ্ডেরও বিষয়সূচি পূর্বেই উল্লেখ করেছেন কবি বৃন্দাবন দাস। কিন্তু শেষ খণ্ডের বিষয়সূচির তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শেষ পর্যন্ত অবর্ণিত থেকে গেছে বলে অনেকে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থটির সম্পাদনার

'ভূমিকা' অংশে জানিয়েছেন —

"আদি খণ্ডের মতো মধ্য ও শেষ খণ্ডেও বিষয়সূচী দেওয়া আছে। কিন্তু সে সূচীর শেষ কয়টি ব্যাপার অবর্ণিত রহিয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত গ্রন্থে রূপসনাতনের সঙ্গে মিলনের পরে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কথায় সমাপ্তি ঘটিয়েছে। অথচ বিষয়সূচীতে পাই —

"শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী।।
শেষখণ্ডে পুনঃ নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশি করিলেন হরিসঙ্কীর্তন।।
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কতেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীর পর্যটন রস।।"[২৫]

প্রসঙ্গত বলতে হয়, আমরা এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচকের দেওয়া মন্তব্যের প্রামাণিক যথার্থতা নিয়ে বিচার করব— কাব্যটির শেষখণ্ডের পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বিচারকালে। তবে কাব্যটির বিষয় সম্পর্কে আলোচনার সূচনাতেই মনে হয়— বৃন্দাবন দাস হয়তো কাব্যটির অধ্যায় বিভাজন প্রথমে করেন নি। কারণ— 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটির মধ্যে কোথাও অধ্যায়ের উল্লেখ নেই। তবে, 'অধ্যায়'-এর নাম না দিলেও তিনি 'ভনিতা' দিয়ে যেভাবে প্রত্যেকটি বর্ণনার ইতি টেনেছেন— তাতেই অধ্যায়ের কাজ করেছে বলেই মনে হয়। আমরা রাধাগোবিন্দ নাথ সম্পাদিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর যে গ্রন্থগুলি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে চাই সেই গ্রন্থটিতে আদি খণ্ডে - ১২, মধ্য খণ্ডে - ২৬ এবং শেষ খণ্ডে - ১১; সর্বমোট (১২ + ২৬ + ১১) = ৪৯টি অধ্যায় রয়েছে।

সুতরাং, কবি বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' জীবনী গ্রন্থটিকে যে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত করে কাব্যরচনার পরিকল্পনা করেছিলেন — তার প্রথম খণ্ডের নাম 'আদিখণ্ড'। এই 'আদিখণ্ড'-এর প্রথম অধ্যায়ে তিনি চৈতন্যজীবনকে কেন্দ্র করে যে সুবৃহৎ জীবনীকাব্য রচনা করতে চলেছেন, সেই পূর্বপরিকল্পিত ভূমিকার কথা 'সূত্রবর্ণন' অংশে বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ কাব্যটি সম্পর্কে তাঁর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা তিনি প্রথমেই পাঠক বর্গকে জানিয়ে দিয়েছেন। লক্ষণীয়, বৃন্দাবন দাস কাব্যটির প্রথম অধ্যায়ের শুরুতেই সর্বপ্রথমে চারটি সংস্কৃত শ্লোক গ্রন্থপ্রতিপাদ্য ইষ্টদেবের বন্দনারূপ মঙ্গলাচরণ করেছেন। এই চারটি শ্লোকের মধ্যে প্রথমটি হল—

"আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করেট করুণাবতারৌ।। ১"[২৬]

অর্থাৎ, ‘‘যাঁহাদের ভুজদ্বয় জানু পর্যন্ত বিলম্বিত, যাঁহাদের বর্ণ বা কান্তি সুবর্ণের ন্যায় পীত এবং মনোরম, যাঁহাদের নয়নদ্বয় কমলদলের ন্যায় আয়ত, যাঁহারা সঙ্কীর্তনের একমাত্র পিতা (জনক, সৃষ্টিকর্তা, প্রবর্তক), যাঁহারা বিশ্বের ধারণ-পোষণকর্তা, যাঁহারা যুগধর্মের পালনকর্তা, এবং যাঁহারা জগতের (জগদ্বাসীর) প্রিয়কারী, করুণার অবতার সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠদ্বয়কে (শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দকে) আমি বন্দনা করি।’’[২৭] একই ভাবে বৃন্দাবন দাস অপর তিনটি শ্লোকেও পর পর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বন্দনা করেছেন এবং বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে তিনি দুই ভাই (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে।।) বলেও উল্লেখ করেছেন। কারণ যেহেতু দুইজনেই শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত হরিনাম সঙ্কীর্তন প্রচার করেছিলেন। তাছাড়া বৃন্দাবন দাস যেহেতু নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন তাই তিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দকেও সম আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

লক্ষণীয়, বৃন্দাবন দাস যেহেতু ‘শ্রীমদ্‌ভাগবত’-এর অনুসরণে তাঁর ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যটি লেখেন, তাই কাব্যটির শুরুতেই তিনি চৈতন্যভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম করেছেন এবং তারপর চৈতন্যদেবকে বন্দনা করেছেন। তিনি নিজেই ‘শ্রীমদ্‌ভাগবত’-এ কৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত করে এরপর বলেছেন —

‘‘ ‘আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।’
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়।। ৩’’[২৮]

সুতরাং, আমাদের বুঝতে হবে, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ লেখার পূর্বেই ‘শ্রীমদভাগবত’ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সেই অনুসারেই কৃষ্ণের অবতার চৈতন্যদেব ধরেই জীবনী গ্রন্থটি লিখতে শুরু করেছিলেন। এরপর, বৃন্দাবন দাস সরাসরি তাঁর গুরুদেব তথা ‘ইষ্টদেব’-এর বন্দনা গান গেয়েছেন। সেইসঙ্গে, তিনি যেহেতু মনে করতেন ব্রজের বলরামই গৌরলীলায় নিত্যানন্দ, তাই নিত্যানন্দের মহিমা কীর্ত্তন করতে গিয়ে কয়েকটি পয়ারে বলরামেরও মহিমা বর্ণনা করেছেন—

‘‘ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।। ৫
সহস্র-বদন বঁন্দো প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র মুখ কৃষ্ণ-যশোধাম।। ৬’’[২৯]

শুধু তাই নয়, বৃন্দাবন দাস ব্রজের কৃষ্ণ ও বলরামকে একই ‘ঈশ্বরতত্ত্ব’ বা ‘ভগবৎতত্ত্ব’ বলে বর্ণনা করেছেন। তাই তিনি এরপর একটি শ্লোকে বলেছেন —

‘‘যাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্প বৃষ্টি করে।
দেবে জানে, এক তত্ত্ব কৃষ্ণ হলধরে। ২১’’[৩০]

আসলে, কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই ভিন্ন হলেও, তত্ত্বের বিচারে তাঁরা অভিন্ন। আর এই দুই ভাইয়ের অভিন্ন

তত্ত্বের কথাই এখানে বর্ণনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। এরপর আরও কয়েকটি পয়ারে ভাগবতের অনুসরণে অনন্তদেবের মহিমার কথা, করুণার কথা এবং ভক্তবাৎসল্যের কথা বলেছেন বৃন্দাবন দাস। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, অনন্তদেব হলেন ব্রজের শ্রীবলরামেরই একটি অংশমাত্র। আবার, ব্রজের এই বলরামই গৌরলীলার নিত্যানন্দ। তাই বৃন্দাবন দাস পয়ারে বাঁধলেন —

" 'দ্বিজ', 'বিপ্র', 'ব্রহ্মণ' যেহেন নাম ভেদ।
এইমত 'নিত্যানন্দ', 'অনন্ত', 'বলদেব'। ৫৯"[৩১]

এই নিত্যানন্দের আদেশেই যে জীবনীকার বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' লিখেছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ আমাদের বুঝতে হবে চৈতন্যচরিত গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা থাকলেও বৃন্দাবন দাসের সে সাহস ছিল না। তাই নিত্যানন্দ যখন তাঁকে আদেশ করলেন তখনই তিনি এই বৃহৎ জীবনীকাব্যটি লিখতে শুরু করেন। তাই তিনি বলেছেন —

"অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে।। ৬০"[৩২]

এরপর বৃন্দাবন দাস নিজেই জানিয়ে দেন যে, তিনি স্বচক্ষে চৈতন্যদেবকে এবং তাঁর লীলা প্রদর্শিত হতে দেখেন নি। পরবর্তীকালে চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবদের কাছ থেকে তিনি যা যা শুনেছিলেন তাই ব্যক্ত করেছেন মাত্র। তাছাড়া চৈতন্যচরিত বর্ণনা করার সামর্থও তাঁর নেই, গৌরচন্দ্র তাঁকে যা বলাবেন তাই তিনি বলবেন মাত্র। তাই তাঁর অপরাধ যেন না হয়, এই বৈষ্ণবোচিত দৈন্য তিনি নিজেই স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন—

"বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাহা লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে।। ৬৪
চৈতন্যকথার আদি-অন্ত নাহি দেখি।
তাহান কৃপায় যে বোলায়েন তাহা লেখি।। ৬৫
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়।। ৬৬
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার।। ৬৭"[৩৩]

এভাবে বৈষ্ণবোচিত দীনতা স্বীকার করে নিয়ে বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' লিখতে শুরু করেন। এরপর তিনি সূত্রবন্ধ মুখবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে কাব্যটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সূত্র নির্দেশ করেন। তিনি শুরুতেই জানিয়ে দেন তাঁর গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে পরিসমাপ্ত হবে। যথা — আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং শেষখণ্ড। বৃন্দাবন দাস আরও জানান, মহাপ্রভু চৈতন্যের জন্ম থেকে গয়াদর্শন পর্যন্ত সময়ের বর্ণনা

থাকবে আদিখণ্ডে; আর গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত সময়ের বর্ণনা থাকবে মধ্যখণ্ডে এবং সন্ন্যাসের পরবর্তী নীলাচলে অবস্থানকালের বর্ণনা থাকবে অন্ত্যখণ্ডে। সুতরাং, বৃন্দাবন দাস প্রথমেই চৈতন্যের জীবন পরিক্রমাকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে নেন। তাই পয়ারে বৃন্দাবন দাস বললেন —

''আদিখণ্ডে প্রধানত বিদ্যার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন-প্রকাশ।। ৭০
শেষখণ্ডে সন্ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দস্থানে সমর্পিয়া গৌড়ক্ষিতি।। ৭১'' [৩৪]

এই সূত্র নির্দেশ করেই বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের মাতা পিতার পরিচয় দেন। তিনি বলেন, চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রবর। তিনি নবদ্বীপের শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষণীয়, বৃন্দাবন দাস এই জগন্নাথ মিশ্রকে স্বভাব ধর্মে কৃষ্ণের পিতা বাসুদেবের তুল্য বলে মূর্তরূপ দেন এবং শুধু তাই নয়, জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী এবং চৈতন্যের মাতা মহাপতিব্রতা শচীদেবীকেও কৃষ্ণের মাতা দেবকীর সঙ্গে উপমায়িত করেন। এরপর লক্ষণীয়, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবকে 'নারায়ণ' বলে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ তিনি যে বিশ্বাসী ছিলেন ভাগবতের কৃষ্ণই কলিযুগে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন — এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তাছাড়া এই মতাদর্শের অবলম্বী হয়েই বৃন্দাবন দাস কাব্যটি রচনা করেন। এরপর বৃন্দাবন দাস আদিখণ্ডে চৈতন্যের বাল্য ও অধ্যাপনা জীবনের কী কী বর্ণিত হবে তার সূত্র তুলে ধরেন। লক্ষণীয়, তিনি কোনও সালের উল্লেখ না করলেও জানিয়ে দেন —

''আদিখণ্ডে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভ দিনে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে।। ৭৫'' [৩৫]

অর্থাৎ, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রিবেলায় যেদিন চন্দ্রগ্রহণ লেগেছিল সেদিন চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। এরপর বৃন্দাবন দাস বেশ কয়েকটি পয়ারের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের শৈশবাবস্থার সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছেন। একটি সাধারণ গ্রাম্য শিশুর সরল বাল্যসুলভ কার্যকলাপের বর্ণনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। তবে সেই সব সাধারণ ঘটনায় মাঝে মাঝে কবি অলৌকিকতার স্পর্শে দেব পরিগ্রহের সংযোজন করেছেন ভাগবতের অনুসারে। এখানে তিনি শুধুমাত্র সূত্র নির্দেশ করেছেন কি কি বর্ণনা করবেন পরবর্তী অংশে তার। ঠিক একই ভাবে আদিখণ্ডের মতই মধ্য ও শেষ খণ্ডে কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্য জীবনের কি কি বর্ণনা করবেন প্রথম অধ্যায়ে তার সূত্র নির্দেশ করেছেন মাত্র। তাই কবি নিজেই বলেছেন —

''এই যে কহিল সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহাই গাইয়া।। ১৬৪'' [৩৬]

আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়েও বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বন্দনা দিয়েই কাহিনির শুরু করেছেন। সেই সঙ্গে চৈতন্যের ভক্ত বৈষ্ণবদের চরণেও নমস্কার জানিয়ে তাঁদের কৃপাও প্রার্থনা করেছেন

বৃন্দাবন দাস। তাই তিনি বলেছেন —

"পুন ভক্ত সঙ্গে প্রভু পদে নমস্কার।

স্ফুরুক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার।। ৪"[৩৭]

এরপর, বৃন্দাবন দাস ভগবানের অবতারের কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন —

"কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।

কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাঁহার? ১৩

তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।

তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে।। ১৪"[৩৮]

অর্থাৎ, কি উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন, তা কেউ জানতে পারে না ঠিকই, তবু 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা'য় ভগবান অবতারের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে —

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।"

অর্থাৎ, যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান বা আধিক্য হয়, তখনই ধর্মানুষ্ঠানকারী সাধুদিগের রক্ষণের জন্য, দুষ্কর্মকারীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মের সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। সুতরাং ভগবান তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অবতীর্ণ হয়ে থাকেন — (১) সাধুগণের রক্ষা (২) দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং (৩) ধর্ম-সংস্থাপন। 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর এই কথাই ব্যক্ত করলেন আবার কবি বৃন্দাবন দাস। তিনি ভগবানের অবতারের কারণ বলতে গিয়ে জানান —

"ধর্ম্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।

অধর্ম্মের প্রবণতা বাঢ়ে দিনে দিনে। ১৫

সাধুজন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ কারণে।

ব্রহ্মা-আদি প্রভুর পা'য় করেন বিজ্ঞাপনে।। ১৬

তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।

সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে।। ১৭"[৩৯]

সুতরাং, চৈতন্যের অবতারের কারণ বর্ণনার পর বৃন্দাবন দাস কলিযুগে সকলের একমাত্র ধর্ম বলতে বলেন হরিনাম সঙ্কীর্তন। আর এই ধর্ম পালনের জন্যই সর্ব পরিকর সহকারে চৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছেন—

"কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।

অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে।। ২১"[৪০]

তবে, এই চৈতন্যের পরিকরেরা কিন্তু সকলে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন না। বৃন্দাবন দাস প্রসঙ্গতই বলেন —

"কারো জন্ম নবদ্বীপে, কারো চাটিগ্রামে।
কেহো রাঢ়ে, ওড্র দেশে, শ্রীহট্টে, পশ্চিমে।। ২৫"[৪১]

এদের মধ্যে রাঢ় বঙ্গের একটি গ্রাম 'একচাকা'য় জন্মগ্রহণ করেন বৃন্দাবন দাসের গুরুদেব নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দের পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত এবং মায়ের নাম পদ্মাবতী। এরপর বৃন্দাবন দাস নিজেই প্রশ্ন করেছেন —

"আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ কেনে জন্মায়েন দূরে?।। ৪১"[৪২]

কিন্তু এর উত্তর দিতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস নিজেই জানিয়েছেন আসলে যেখানে কৃষ্ণ নাম হয় না সেখানে জীবের প্রতি বৎসল হয়ে পরিকরদের জন্মগ্রহণ করিয়েছেন স্বয়ং ভগবান। তাই বৃন্দাবন দাস বলেন—

"সে সব জীবের কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহা-ভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া।। ৪৩"[৪৩]

এভাবে, সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়ে পরিকরদের জন্ম হলেও তাঁরা সকলেই এসে মিলিত হন নবদ্বীপে। বৃন্দাবন দাস তাই বলেছেন —

"নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভার হইল মিলন।। ৪৯"[৪৪]

এরপর বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে জানতে পারি, তৎকালীন নবদ্বীপে বিদ্যা শিক্ষার জন্য নানা দেশ থেকে বিদ্যার্থীরা আসতেন। তৎকালীন বঙ্গের সাহিত্য সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। তাই নবদ্বীপে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাও ছিল লক্ষাধিক। বৃন্দাবন দাস নিজেই বলেছেন —

"নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে?
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।। ৫৩" [৪৫]

তাছাড়া, নবদ্বীপে প্রায় সকল লোকই সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করতেন। কারও কোন অন্ন-বস্ত্রের অভাব-অনটন ছিল না। অর্থাৎ সকলেই বৈষয়িক সুখে নিমজ্জিত ছিল ঠিকই, কিন্তু মানব জীবনের যা মূল লক্ষ্য সেই পরমার্থিক বিষয়ের দিকে কারও লক্ষ ছিল না। বৃন্দাবন দাস তাই বলেছেন —

"রমা-পৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।। ৫৮" [৪৬]

এছাড়া, বৃন্দাবন দাস আরও বলেছেন, তৎকালীন সময়ে সাধারণ লোক 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' কাকে বলে তা

জানত না। তাই মঙ্গলচণ্ডীর গীত কিংবা মনসা পূজাকেই ধর্ম-কর্ম বলে মনে করত। আর এর জন্য বৃথা অর্থব্যয়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের বাহাদুরী প্রকাশেও তারা পটু ছিল। আবার নিজেদের পুত্র- কন্যার বিয়েতেও বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করত বলে জানিয়েছেন বৃন্দাবন দাস —

" 'ধর্ম্ম-কর্ম্ম' লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।। ৬০
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে।। ৬১
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে।
এইমত জগতে ব্যর্থ কাল যায়ে।। ৬২"[৪৭]

সুতরাং, একটি বিষয়ে আমাদের অবহিত হতে হবে যে, তৎকালীন সমাজে লৌকিক দেব-দেবীর প্রাধান্য ছিল অধিক। তাই প্রচুর অর্থ দিয়ে যেমন — মনসা, চণ্ডীর পূজা প্রচলিত ছিল, তেমনি পাশাপাশি 'বাশুলী' দেবী ও 'যক্ষ' দেবের পূজাও অনেকে করতেন। তুলনায় সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের হরিনাম সঙ্কীর্তন ছিল অনেকটাই সমাজ-বিচ্ছিন্ন। তাই বৃন্দাবন দাস আক্ষেপের সুরে বলেছেন —

"বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।। ৮৩
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে।। ৮৪" [৪৮]

সুতরাং, 'বিষ্ণুভক্তিশূন্য' এক সমাজ পরিমণ্ডলে যখন নবদ্বীপ আচ্ছন্ন, তখন মুষ্টিমেয় বৈষ্ণব ভক্তদের আক্রান্তও হতে হয়েছিল বলে জানিয়েছেন বৃন্দাবন দাস। তাই দিনের বেলা নয়, রাত্রিবেলায় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করতে হত নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে। আর নরপতি যেহেতু ছিলেন 'যবন' অর্থাৎ মুসলমান, তাই স্বাভাবিক ভাবে একটা ভীতির কারণ ছিলই। এই কারণে বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

"চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চ-স্বরে।। ১০৭
শুনিঞা-পাষণ্ডী বলে — "হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ।" ১০৮
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে, প্রমাদ নদীয়ার।। ১০৯" [৪৯]

নবদ্বীপের সামাজিক পরিমণ্ডলে যখন এভাবে বৈষ্ণব সমাজ আক্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল তখন রাঢ় বঙ্গে জন্মগ্রহণ করলেন নিত্যানন্দ প্রভু। বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন —

"মাঘ মাসে শুক্লা-ত্রয়োদশী শুভদিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে।। ১২৫
... ...
কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ-প্রাণ বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা, ধরি নিত্যানন্দ নাম।। ১২৭"[৫০]

এরপর বৃন্দাবন দাস কয়েকটি পয়ারে চৈতন্যের অবতরণের বৃত্তান্ত জানিয়েছেন। লক্ষণীয়, নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রবরকে তিনি স্বধর্মে বসুদেবের সঙ্গে উপমায়িত করেছেন এবং 'সর্ব্বময়-তত্ত্ব' বলে প্রকাশ করেছেন। আর তাঁর পত্নী শচীমাতাকে বলেছেন জগতের মাতা। তবে, তাঁদের 'বহু কন্যা-পুত্রের' শৈশবেই জন্মানোর পর মৃত্যু ঘটায় একমাত্র বিশ্বরূপই চৈতন্যের আবির্ভাব কালে প্রকট ছিলেন। সুতরাং, লক্ষণীয় বৃন্দাবন দাস যেন সাধারণ এক গ্রাম্য-দম্পতির দাম্পত্য জীবনের নিপুণ বর্ণনা করেছেন বলেই মনে হয়। তবে, সেখানে তিনি দেবত্বের একটি আবরণ ছুঁইয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। তাই চৈতন্য অবতীর্ণ হবেন জেনে ব্রহ্মা এবং শিবও স্তব করতে শুরু করেছেন। আবার, ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে চৈতন্যের যেদিন জন্ম হয় সেদিন স্বাভাবিক ভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে ছিল চন্দ্রগহণ। কিন্তু বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন —

"ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়।
চন্দ্র আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায়।। ১৯৩
সর্ব্ব-নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরিকীর্ত্তন।। ১৯৪"[৫১]

আবার লক্ষণীয়, এখানে বৃন্দাবন দাস তৎকালীন গ্রহণের সময়ের সামাজিক চিত্রও বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন। গ্রহণের সময় শিশু, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ, সজ্জন-দুর্জ্জন সকলেই যে একসাথে নদীর ঘাটে স্নান করে এই চিত্রের অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস—

"গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিগে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।। ১৯৯
কিবা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জ্জন।
সভে 'হরি হরি' বোলে দেখিয়া গ্রহণ।। ২০০"[৫২]

আবার, যার মুখে কখনো 'হরি' নাম সঙ্কীর্তন শোনা যায় না, সেও গ্রহণের সময় পাপ থেকে উদ্ধারের জন্য 'হরি' নাম করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ, তৎকালীন সমাজে কুসংস্কারের মাত্রা যে কতটা প্রকট ছিল তা বর্ণনা করেছেন বৃন্দাবন দাস —

"চতুর্দ্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।

গঙ্গা-স্নানে 'হরি' বলি যায়েন ধাইয়া।। ২৩৩

যার মুখে এ জন্মেও নাহিক হরিনাম।

সেহো 'হরি' বলি ধায় করি গঙ্গা-স্নান।। ২৩৪"[৫৩]

এভাবে, চৈতন্যের অবতরণের বৃত্তান্ত বর্ণনার পর বৃন্দাবন দাস তৎকালীন শিশুর জন্মযাত্রা-মহোৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। পুত্রের মুখ দেখে শচী মাতা এবং জগন্নাথ মিশ্র এতটাই আনন্দে বিহ্বল যে, তাঁরা কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। এই শিশু স্নেহ-বাৎসল্যের যে চিত্র বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন তা গ্রাম বাংলার প্রত্যেক পিতা-মাতার। তাই এই চৈতন্যের জন্ম মহোৎসবের বর্ণনা সর্বজনীন ও সর্বকালীন স্নেহ বাৎসল্যে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

"শচী-জগন্নাথ দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।

দুইজন হইলেন আনন্দ-স্বরূপ।। ২৩৬

কি বিধি করিব ইহা, কিছুই না স্ফুরে।

আথেব্যথে নারীগণ জয়কার পূরে।। ২৩৭"[৫৪]

এরপর, নব আগন্তুক শিশুকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত মঙ্গলাচরণের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন, তাও গ্রাম-বাংলার সহজ স্বাভাবিক চিত্র বলেই মনে হয়। বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন —

"ধাইয়া আইলা সভে যত আপ্তগণ।

আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন।। ২৩৮"[৫৫]

আজও নতুন কোন শিশু কোন গ্রামে বা পাড়ায় জন্মগ্রহণ করলে তাকে দেখতে এরকমই চিত্র ফুটে ওঠে। অর্থাৎ চোখে দেখা স্বাভাবিক সামাজিক চিত্রের সঙ্গে চৈতন্যের জন্মযাত্রা-মহোৎসবের বর্ণনাকে এক করে দিয়েছেন কবি বৃন্দাবন দাস। আবার, চৈতন্যকে দেখে শচী মাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী বলেন —

"মহারাজলক্ষণ সকল লগ্নে কহে।

রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইলা বিস্ময়ে।। ২৪০" [৫৬]

এভাবে, নব আগন্তুক শিশুর ভবিষ্য বর্ণনা কিংবা 'কোষ্ঠী গণনা' প্রথা বাংলার সামাজিক রীতিতে আজও বিদ্যমান। তবে, এই ভবিষ্য-কথকেরা শুধুমাত্র যে সুখকর বক্তব্যই করে থাকেন, দুঃখকর কিছু প্রকাশ করেন না তার প্রমাণ —

"হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।

অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস।। ২৫৮"[৫৭]

সেইসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় নব শিশু জন্মগ্রহণ করলে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে তাকে অভ্যর্থনারও ব্যবস্থা থাকত। বৃন্দাবন দাস এই রীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন —

“ততক্ষণে আইলা সকল বাদ্যকার।

মৃদঙ্গ সানাঞি বংশী বাজয়ে অপার।। ২৬৩” [৫৮]

আবার, ধান-দুর্বা দিয়ে নব-আগন্তুক শিশুর ‘চিরায়ু’ প্রার্থনার যে রীতির বর্ণনা দিয়েছেন বৃন্দাবন দাস, তা গ্রাম-বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় আজও প্রচলিত —

“দেবমাতা সব্য হাথে ধান্য দুর্ব্বা লৈয়া।

হাসি দেন প্রভু-শিরে ‘চিরায়ু’ বলিয়া।।২৬৫” [৫৯]

সুতরাং, এভাবে চৈতন্যের ‘জন্মযাত্রা-মহোৎসব’-এর মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন দাস আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৎকালীন গ্রাম-বাংলার যে সামাজিক চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্যিই অনুপম হয়ে উঠেছে।

আদি খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়েও বৃন্দাবন দাস শচী-সুত চৈতন্যের বাল্যলীলার বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে চৈতন্যের ‘জন্মযাত্রা-মহোৎসব’-এর বর্ণনার পর তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই বৃন্দাবন দাস বলেন —

“হেন-মতে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।

শচী-গৃহে দিনে দিনে বাঢ়য়ে আনন্দ।। ৩” [৬০]

তবে, নব শিশু জন্মানোর পর যে সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন, তা খুবই বাস্তব-সম্মত। শিশু চৈতন্যকে কেন্দ্র করে নদীয়া-নবদ্বীপের সকলে আনন্দে লিপ্ত হলেও যেহেতু শচীদেবীর ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি সন্তান শৈশবেই মারা যায় তাই চিন্তার অন্ত ছিল না এই ব্রাহ্মণ দম্পতির। বালকের নিরাপদ রক্ষার জন্য তাই যেমন অনেকে বিষ্ণুর স্তব-স্তুতি করেছেন, তেমনি অনেকে করেছেন দেবী দুর্গার স্তব-স্তুতি। আবার, বালকের রক্ষার জন্য কেউ কেউ দেব-দেবীর মন্ত্র উচ্চারণ করে ঘরের চারিদিকে ভ্রমণ করেও থাকেন —

“বিষ্ণু-রক্ষা কেহো, কেহো দেবী-রক্ষা পঢ়ে।

মন্ত্র পঢ়ি ঘর কেহো, চারি-দিগ বেঢ়ে।। ৭ [৬১]

আবার, মাতৃসঙ্গে নব শিশু যেই ঘরে থাকে, সেই ঘরে কোনো ‘ছায়া মূর্তি’ দেখতে পেলে সকলে ভাবে নব শিশুকে হরণ করতে যেন কোনো ‘জাত-হরিণী’ এসেছে। আসলে এই সমস্ত ঘটনার বর্ণনা বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে। সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রসূত লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কারকে এখানে কবি বাণীরূপ দিয়েছেন বলেই মনে হয়। তাই, নানা মন্ত্রে নব শিশুর ঘরের ‘দশ দিক বন্ধ’ করা কিংবা ওঝা ডাকার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়েছে কবি বৃন্দাবন দাসের পক্ষে —

“সভে বোলে “ধর ধর এই চোরা যায়।”

‘নৃসিংহ নৃসিংহ’ কেহ দাকয়ে সদায়।। ১৪

কোনো ওঝা বোলে “আজি এড়াইলি ভাল।

না জানিস্ নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল।। ১৬”[৬২]

এভাবে, চৈতন্যের একমাস বয়স উত্তীর্ণ হলে শুরু হয় ‘বালক উত্থান পর্ব’ বা ‘নিষ্ক্রমণ সংস্কার’। সূতিকাঘর থেকে শিশুকে নিয়ে মায়ের বের হবার সময় এই সংস্কার করা হয়ে থাকে। বৃন্দাবন দাস এই ক্ষেত্রেও যে বর্ণনা দিয়েছেন তা তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রসূত বলেই মনে হয় —

“বালক উত্থান পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন।। ১৮
বাদ্য গীত কোলাহলে করি গঙ্গা স্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠী স্থান।। ১৯
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ।। ২০
খই, কলা, তৈল, সিন্দুর, গুয়া, পান।
সভারে দিলেন আই করিয়া সম্মান।। ২১
বালকেরে আশিষিয়া সর্ব্ব-নারীগণ।
চলিলেন গৃহে, বন্দি আইর চরণ।। ২২”[৬৩]

এরপর, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের অপর যে একটি বাল্য লীলার বর্ণনা দিয়েছেন তাও অনুপম হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি শিশুর মতো চৈতন্যও কেবল যখন সবেমাত্র হামাগুড়ি দিতে শিখেছে তখন —

“যে সময়ে যখন না থাকে কেহো ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিচারে।। ৩০
বিচারিয়া সকল ফেলায় চারি ভিতে।
সর্ব্বঘর ভরে তৈল, দুগ্ধ, ঘোল, ঘৃতে।। ৩১” [৬৪]

এই যে বাল্যলীলার বর্ণনা বৃন্দাবন দাস করেছেন, তা আজও প্রত্যেক শিশুতেই লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক শিশুই ঘরে জিনিসপত্র ছড়িয়ে আনন্দ অনুভব করে। বাল্যভাবের আবেশে তদ্রূপ চৈতন্যও আনন্দ অনুভবের জন্য জিনিসপত্র ছড়িয়েছেন। তবে, এটি যতই চৈতন্যের নর-শিশুবৎ বাল্যলীলা হোক্ না কেন, বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

“কে ফেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য, চালু, মুদ্গ।
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ।। ৩৪
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কেহো বুঝিতে না পারে।। ৩৪”[৬৫]

অর্থাৎ, চার মাসের শিশুর বিছানা থেকে উঠে এসব করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং, এখানে অলৌকিকতার

সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন বৃন্দাবন দাস।

এভাবে প্রতিদিন নতুন নতুন কৌতুকের মধ্য দিয়ে চৈতন্যের যখন নামকরণের সময় উপস্থিত হল তখন —

''নাম থুইবার সভে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক, অন্যে বোলে আর।।৪৪''[৬৬]

নামকরণের এই স্বাভাবিক প্রকাশ যেন প্রত্যেকটি বাঙালি ঘরেই লক্ষ করা যায়। ডাকনাম ও প্রকৃত নামের যে রীতি বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে তার ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় না চৈতন্যের ক্ষেত্রেও। তাই পতিব্রতা নারীগণ চৈতন্যের নামকরণ করেন এই মনে করে যে —

''ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে 'নিমাঞি'।। ৪৫''[৬৭]

কিন্তু বিচারজ্ঞ পণ্ডিতগণ সমস্তরকম বিচার করে বলেন যে —

''অতএব ইহান 'শ্রী বিশ্বম্ভর' নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান।। ৪৯''[৬৮]

অর্থাৎ, যিনি বিশ্বকে ধারণ করবেন বা পোষণ করবেন, তিনিই বিশ্বম্ভর। আবার, আমাদের চারপাশের লৌকিক জগতে দেখতে পাই নব শিশুর স্বাভাবিক মনোবৃত্তি জানার জন্য নামকরণের সময়ে পাত্রে ধান, পুঁথি, খড়ি, সোনা, রূপা প্রভৃতি এনে শিশুর সামনে রাখা হয় এবং শিশুর ইচ্ছানুসারে তাদের মধ্যে যে কোনও একটি বস্তু টানবার জন্য শিশুকে বলা হয়। বৃন্দাবন দাস এই নিজ অভিজ্ঞতা প্রসূত লৌকিক সংস্কারটি চৈতন্যদেবের বাল্যলীলাতেও বর্ণনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন —

''ধান্য, পুঁথি, খড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত।
ধরিতে আনিঞা করিলেন উপনীত।। ৫৩
জগন্নাথ বোলে ''শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্বর।। ৫৪''[৬৯]

কিন্তু শিশু চৈতন্যদেব এসব বস্তু ছেড়ে দিয়ে 'ভাগবত' নিয়ে আলিঙ্গন দিলেন। এই ঘটনাটি শিশুর নিছক খেয়ালী প্রকাশ হলেও, বৃন্দাবন দাস হয়তো বলতে চেয়েছেন, 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এ যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের নাম-গুণ-রূপ-লীলাদির বর্ণনা রয়েছে, তাই 'ভাগবত'-কে আলিঙ্গন করে চৈতন্যদেব শৈশবে শ্রীকৃষ্ণকেই আলিঙ্গন করেন। অর্থাৎ শিশুর একটি স্বাভাবিক ঘটনায় বৃন্দাবন দাস বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। বৃন্দাবন দাস তাই বলেন —

''সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন।। ৫৫''[৭০]

এভাবে ধীরে ধীরে শিশু চৈতন্য একটু একটু করে বেড়ে উঠছেন সকল নদীয়াবাসীর চোখের সামনে। তাই বৃন্দাবন দাস বললেন —

"জানুগতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর।। ৬৫" [৭১]

অর্থাৎ হামাগুড়ি দিতে শিখে গেছেন শচীমাতার শিশুটি। এই সময়ের শিশুদের স্বাভাবিক ধর্ম হল —

"পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি, সর্প, যাহা দেখে, তাহি ধরে।। ৬৬"[৭২]

অর্থাৎ, প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি ঔৎসুক্য বা জেনে না জেনে হাত দেওয়া শিশুদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। শৈশবে চৈতন্যদেবের মধ্যেও এর ব্যত্যয় হয় নি। আসলে, তিনি তো মানুষ চৈতন্য। তাই বৃন্দাবন দাস বলেন —

"একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক লীলায়।। ৬৭
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেঢ়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা সর্প উপরে শুইয়া।। ৬৮"[৭৩]

শিশু চৈতন্যের এই অবস্থা দেখতে পেয়ে বাড়ির সকলেই ব্যতিব্যস্ত ও আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। আর এটা হওয়াই স্বাভাবিক। তাই বৃন্দাবন দাস বলেন —

"কেহো রক্ষা বান্ধে, কেহো পঢ়ে স্বস্তিবাণী।
কেহো অঙ্গে দেই বিষ্ণুপাদোদক আনি।। ৭৩
কেহো বোলে "বালকের পুনর্জ্জন্ম হৈল।"
কেহো বোলে "জাতিসর্প তেঞি না লঙ্ঘিল।। ৭৪"[৭৪]

সাপটি কেন শিশু চৈতন্যকে দংশন করল না, সে হয়তো শিশুটির অলৌকিক ক্ষমতার কারণে, কিন্তু কবি বৃন্দাবন দাস এক্ষেত্রে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সামাজিক বাস্তব অভিজ্ঞতার গুণে সত্যিই অনুপম হয়ে উঠেছে।

এরপর বৃন্দাবন দাস বালক চৈতন্যের অপরূপ রূপলাবণ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন —

"সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল নয়ান যেন গোপালের বেশ।। ৭৯
আজানু-লম্বিত ভুজ, অরুণ অধর।
সকল লক্ষণযুত বক্ষ পরিসর।। ৮০
সহজে অরুণ গৌর দেহ মনোহর।

বিশেষে অঙ্গুলি, কর, চরণ সুন্দর।। ৮১” [৭৫]

বালক চৈতন্যের এই অপরূপ রূপ দর্শনে শচীমাতা এবং জগন্নাথ মিশ্রও বিস্মিত এবং তাই তাঁরা পুত্রের এই মনোহর রূপের দর্শনে নির্ধন হলেও আনন্দিত। তবে, ছেলেবেলা থেকেই চৈতন্যদেব ছিলেন চঞ্চল স্বভাবের। তাই বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

“নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে।। ৯৩
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
দই, কলা, সন্দেশ, যা দেখে তাই চায়।। ৯৪” [৭৬]

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের বাল্যসুলভ চাপল্যের পরিচয় দিতে গিয়ে আরও বলেছেন —

“কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।
হাণ্ডি ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছুই না পায়।। ১০১
যার ঘরে শিশু থাকে, তাহারে কান্দায়।
কেহো দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়।। ১০২” [৭৭]

সুতরাং, বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনা গ্রাম বাংলার এক সাধারণ চঞ্চল বালকের কথাই মনে করিয়ে দেয়। চৈতন্যদেব যে আসলে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ, তাই শৈশবে তাঁর বাল্যসুলভ চাপল্য থাকাটাই স্বাভাবিক। আসলে বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে চৈতন্যের মানবীয় সত্তাটাই বড়ো হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

এরপর, বৃন্দাবন দাস তৎকালীন শিশু চুরির মতো সামাজিক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনাটিও বৃন্দাবন দাসের সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রসূত বলেই মনে হয়। বৃন্দাবন দাস তাই জানিয়েছেন—

“একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে, “কার শিশু বেড়ায় নগরে।।” ১০৮
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার।
হরিবার দুই চোরে চিন্তে পরকার।। ১০৯” [৭৮]

তবে, এই দুই চোরেরা চৈতন্যকে চুরি করলেও এবং মায়াশক্তির প্রভাবে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে বলে কবি জানালেও এই শিশু চুরি একটি সামাজিক ঘটনা বলেই মনে হয়। তৎকালীন সমাজে এই শিশু চুরির প্রবণতা যে অধিক ছিল তা কবি বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়।

এরপর বৃন্দাবন দাস বালক চৈতন্যের মধ্য দিয়ে স্বয়ং ভগবানের নূপুর ধ্বনি শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র শ্রবণের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে অলৌকিকতার স্পর্শ থাকলেও কবির বর্ণনার গুণে সত্যি হয়ে উঠেছে। তাই বৃন্দাবন দাস বলেন —

"সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।

ধ্বজ, বজ্র, পতাকা অঙ্কুশ ভিন্ন ভিন্ন।। ১৫০

আনন্দিত দোঁহে দেখি অপূর্ব্ব চরণ।

দোঁহে হৈলা পুলবিতসজল-নয়ন।। ১৫১"[৭৯]

বালক চৈতন্যের এরকম অদ্ভুত স্বভাবের আরো পরিচয় দিতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

"আরো এক কথা শুন পরম অদ্ভুত।

যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ সুত।। ১৫৭"[৮০]

এই পরম অদ্ভুত ব্যাপারটি যে তৈর্থিক ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঘটেছে তার পরিচয় দিতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

"পরম সুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্যটন।। ১৫৮

ষড়ক্ষর গোপালমন্ত্রে করে উপাসন।

গোপাল নৈবেদ্য বিনে না করে ভোজন।। ১৫৯"[৮১]

অর্থাৎ, এই তৈর্থিক ব্রাহ্মণটি কৃষ্ণকে লাভের উদ্দেশ্যে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেন। তিনি ষড়ক্ষর গোপাল মন্ত্রে কৃষ্ণের উপাসনা করেন। গোপালের প্রসাদ ব্যতীত তাই তিনি কিছু ভোজন করেন না। তাঁর কণ্ঠে ছিল বাল-গোপালের ভূষণ স্বরূপ শালগ্রাম। এছাড়াও —

"নিরবধি মুখে বিপ্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে।

অন্তরে গোবিন্দ রসে দুই চক্ষু ঢুলে।। ১৬২"[৮২]

এই তৈর্থিক ব্রাহ্মণটি তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে আসেন নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িতে। তাঁকে দেখে জগন্নাথ মিশ্র সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে অতিথি-আপ্যায়নের সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেন —

"অতিথি ব্যভার ধর্ম্ম যেন মত হয়।

সম করিলেন জগন্নাথ মহাশয়।। ১৬৪

আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন।

বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।। ১৬৫"[৮৩]

এরপর, জগন্নাথ মিশ্র সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণের আহারের জন্য অনুমতি চেয়ে বলেন —

"বিশেষে ত আজি আমার পরম সৌভাগ্য।

আজ্ঞা দেহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য।। ১৬৯"[৮৪]

ব্রাহ্মণের অনুমতি পেয়ে, জগন্নাথ মিশ্র রান্নার ব্যবস্থা করেন। এরপর —

"সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।

বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন।। ১৭২”[৮৫]

কিন্তু, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যখন তিনি ধ্যানে বসেন এবং গোপাল মন্ত্র জপ করেন তখন ব্রাহ্মণ দেখতে পান—

“ধ্যান মাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগোরসুন্দর।। ১৭৫
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ-নয়ন-কর-চরণ সুন্দর।। ১৭৬
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন, দেখে বিপ্রবরে।। ১৭৭”[৮৬]

এভাবে, বালক চৈতন্য যখন ব্রাহ্মণের দেবতাকে উৎসর্গ করা প্রসাদে হাত দিয়ে দেয়, তখন অন্ন অশুচি হয়েছে বলে মনে করে তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, একটি শিশুর পক্ষে এ ঘটনা ঘটানো খুবই স্বাভাবিক। কারণ অবুঝ বালক বোঝে না কিসে তার হাত দেওয়া উচিত নয়। প্রসাদের প্রতি আগ্রহের লোভে তাই শিশুর প্রসাদের থালায় হাত দেওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এই কারণে জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে মারতে উদ্যত হলে —

“বিপ্র বোলে, “মিশ্র! তুমি বড় দেখি আর্য্য।
কোন্ জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কার্য্য? ১৮১
ভাল মন্দ জ্ঞান যার থাকে মারি তারে।
আমার শপথ যদি মারহ উহারে। ১৮২”[৮৭]

এরপর, ঘটনাক্রমে দেখতে পাই, ব্যথিত জগন্নাথ মিশ্রের অনুরোধে সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ পুনরায় রন্ধনে সম্মতি দেন। আর সবার উপদেশ মত —

“তবে শচীদেবী পুত্র কোলে ত করিয়া।
চলিলেন আর বাড়ী প্রভুরে লইয়া।। ১৯৮”[৮৮]

চৈতন্যকে নিয়ে শচীদেবী যাবার পথে প্রতিবেশীদের যে বাক্যালাপ তা সমাজের জাত-পাতের বিভেদকে স্পষ্ট করে —

“সভেই বোলেন, অয়ে নিমাই ঢাঙ্গাতি।
কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি।। ১৯৭
কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেবা চিনে।
তার ভাত খাই জাতি রাখিব কেমনে? ১৯৮”[৮৯]

অর্থাৎ, সামাজিক নিয়ম অনুসারে কোনও ব্রাহ্মণ সন্তান অজ্ঞাত কোন ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করতেন না।

আর এই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ তো সকলের কাছে অপরিচিত। ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে নিমাই তাঁর হাতের তৈরী অন্ন খেয়েছেন। সুতরাং, নিমাইয়ের জাত নষ্ট হয়েছে বলেই অভিমত প্রতিবেশিনী নারীগণের। অর্থাৎ, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় জাত-পাতের বিভেদ যে কত স্পষ্ট ছিল তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন কবি বৃন্দাবন দাস।

এরপর, তৈর্থিক ব্রাহ্মণ আবার রন্ধনাদি করে বালগোপালের উদ্দেশ্যে ধ্যানে বিভোর হলে বালক শ্রীচৈতন্য —

''অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লই করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু দেখে বিপ্রবরে।। ২০৭''[৯০]

অর্থাৎ চঞ্চল বালককে যতই না করা হোক্ না কেন, প্রসাদের প্রতি লোভের বশবর্তী হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর তাই সকলের বারণ সত্ত্বেও বার বার দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত প্রসাদে হাত দিয়েছে বালক চৈতন্য। এই স্বাভাবিক বালকের ঘটনায় দেবত্বের আরোপ হয়তো ঘটিয়েছেন বৃন্দাবন দাস, এবং তাতে অলৌকিকতার স্পর্শ হয়তো লেগেছে, কিন্তু শিশুসুলভ বালক চৈতন্যের শৈশবের চঞ্চলতার যে চিত্র অঙ্কণ করেছেন কবি বৃন্দাবন দাস এই অংশে তা সত্যিই অনুপম হয়ে উঠেছে। তাই বৃন্দাবন দাস বলেন —

''ভাল-মন্দ-জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ, যে এমন শিশু মারে।। ২১৫
মারিলেই কোন্ বা শিখিব হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়।। ২১৬''[৯১]

তবে, এই কাহিনির শেষে বালক চৈতন্য তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে যে কথা বলেছেন তা ভগবানের ঐশ্বর্যলীলা হলেও কবির অলৌকিক কল্পনার গুণে রসবেদ্য হয়ে উঠেছে —

প্রভু বোলে 'অয়ে বিপ্র! তুমি ত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার? ২৬৬
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা-স্থান।। ২৬৭''[৯২]

সুতরাং, এভাবে বালক নিমাইয়ের শিশুসুলভ চঞ্চলতার পরিচয় দিয়ে কবি বৃন্দাবন দাস আদি খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটান।

আদিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়েও বৃন্দাবন দাস বালক গৌরাঙ্গের শিশুসুলভ চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে, এই অধ্যায়ে চৈতন্যের বয়স পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাই নিমাইয়ের এই সময়ের চাঞ্চল্যকে 'পৌগণ্ড-লীলা' বলে অভিহিত করেছেন রাধাগোবিন্দ নাথ তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'

(আদিখণ্ড)-এর সম্পাদনায়। এই অধযায়ের শুরুতেই বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

''হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল।। ১
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর।। ২''[৯৩]

অর্থাৎ, 'হাতে খড়ি' নামক সামাজিক রীতিটি যে সমাজে প্রচলিত ছিল তা বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনা থেকে সহজেই বুঝতে পারি। অর্থাৎ, লেখা-পড়া শুরুর প্রথম দিনটি যে একটি বিশেষ শুভদিনে ও শুভক্ষণে করা হত— তা সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই বর্ণনা করেছেন কবি। সামাজিক এই 'হাতে খড়ি' দেবার প্রথাটি আজও আমাদের সমাজে প্রচলিত। শুধু তাই নয়, 'কর্ণবেধ' নামক অপর একটি সামাজিক সংস্কারের বর্ণনা দিতে গিয়েও বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

''কিছু শেষে মলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ।। ৩''[৯৪]

আবার লক্ষণীয়, শিশুদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা হলো জেদ বা অসম্ভবকে লাভ করবার একটা অদম্য আগ্রহ। অর্থাৎ অপ্রাপ্য বস্তুকে প্রাপ্তির জন্য আবদার। চৈতন্য যেহেতু মানুষ, তাই স্বাভাবিক ভাবে মানুষের ছেলেবেলার বৈশিষ্ট্যগুলিও তাঁর মধ্যে প্রকটিত ছিল। এই কারণে বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

''আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষ তাহা চাহে।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি যায়ে।। ১০
ক্ষণে চাহে আকাশের চন্দ্র তারাগণ।
হাথ-পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন।। ১১
সান্ত্বনা করেন সভে করি নিজ কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর 'দেও দেও' বোলে।। ১২'' [৯৫]

বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনা দেখে মনে হয় আসলে তিনি একটি মানুষ চৈতন্যের জীবন বর্ণনা করতে বসেছিলেন। আর এই কারণেই শিশুদের সহজ-স্বাভাবিক সরলতাকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন এত সুন্দর ভাবে।

আবার, বালক চৈতন্য মানুষ বলেই একাদশীর দিন জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবতের দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত নৈবেদ্য অবুঝ শিশুর মত ভক্ষণ করে ফেলেছে। কিন্তু এর সঙ্গেই কবি যুক্ত করেছেন অবতার ভাবনা। যেহেতু নিমাই 'বৈকুণ্ঠের রায়' তাই বিপ্রের নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন গ্রহণ করতে চলে গেছেন শিশু নিমাই। এই কাহিনিতে হয়তো অলৌকিকতর স্পর্শ লেগেছে, কিন্তু চৈতন্যের বাল্যরূপের যে সহজ-স্বাভাবিকতা কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই অনুপম হয়ে উঠেছে। চৈতন্যের

শৈশবের চাঞ্চল্যরসের পরিচয় দিতে গিয়ে তাই বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

''সভার সহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে।। ৪৩
অন্য শিশু দেখিলে করয়ে কুতূহল।
সেহো পরিহাস করে, বাজয়ে কোন্দল।। ৪৪''[৯৬]

অর্থাৎ এক নেহাতই চোখে দেখা চঞ্চল বালকের বর্ণনা করেছেন কবি। অবশ্য স্মরণীয়, বৃন্দাবন দাস নিজে কিন্তু চৈতন্যকে সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পান নি। তিনি গুরুদেব নিত্যানন্দের কাছ থেকে চৈতন্য সম্পর্কিত জীবন চরিতের যে বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে বর্ণনা করেছেন। আর, এই কারণেই ধূলায় ধূসরিত চৈতন্য কিংবা পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে কালির দ্বারা লিপ্ত বালক চৈতন্য কবির বর্ণনার গুণে এত সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মনে রাখতে হবে শুধু বালক চৈতন্যের বর্ণনাই নয়, সেইসঙ্গে নবদ্বীপের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিত্রেরও বর্ণনা করেছেন বৃন্দাবন দাস। এই কারণেই তিনি বলেছেন—

''নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে।। ৪৯''[৯৭]

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় তৎকালীন নদীয়া-নবদ্বীপ ছিল বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। আর এই কারণেই এই অঞ্চলেই ছিল বহু মানুষের সমাগম। সকল মানুষ একসঙ্গে নদীতে গিয়ে যে স্নান-আহ্নিক করত, এই চোখে দেখা বাস্তব অভিজ্ঞতারই বর্ণনা করেছেন কবি বৃন্দাবন দাস। সমাজে জাত-পাতের বিভেদ থাকলেও নদীতে স্নানের সময় সকলেই কিন্তু একই সঙ্গে একই ঘাটে স্নান করত।

আবার, বৃন্দাবন দাস এই অধ্যায়েই চৈতন্যের জলক্রীড়ার যে বর্ণনা করেছেন, তা 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এর অনুসারী হলেও কবির বর্ণনার সহজ-স্বাভাবিকতার গুণে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। দুরন্ত চঞ্চল বালক চৈতন্য নদীতে স্নান করতে গিয়ে সবার গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। আবার কারও গায়ে 'কুল্লোল প্রদান' অর্থাৎ মুখের জল ছুঁড়ে দেয় কিংবা কাউকে ছুঁয়ে তার স্নান পরবর্তী শুচিতা নষ্ট করে দেয়। বৃন্দাবন দাস তাই বলেছেন —

''সভে মানা করে তভো মানা নাহি মানে।
ধরিতেও কেহো নাহি পারে এক স্থানে।। ৫৩
পুনঃপুন সভারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছুঁয়ে, কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান।। ৫৪''[৯৮]

এছাড়া বালক চৈতন্য স্নানের সময় কারো ধ্যান ভেঙে দেয় কিংবা কারো পুজোর শিবলিঙ্গ চুরি করে নেয়। আবার, কারো বা পূজার আসনে বসে ফুল-দুর্ব্বা, নৈবেদ্য, চন্দন নষ্ট করে দেয়। কাউকে আবার

জলের মধ্যেই সন্ধ্যা-আহ্নিক করবার সময় পা টেনে নিয়ে যায় গভীর জলে কিংবা কোন বাচ্চার কানের মধ্যে জল দিয়ে দেয়, আবার, নদী থেকে সদ্য স্নান করে উঠলে পুনরায় গায়ে বালি ছিটিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় —

> ‘‘স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাসে করয়ে বদল।
> পত্থিবার বেলে সভে লজ্জায় বিকল।। ৬৯’’ [৯৯]

বৃন্দাবন দাসের দেওয়া চৈতন্যের এই শৈশবের বর্ণনা দেখে মনে হয় তিনি যেন এখানেও চোখে দেখা এক বাস্তব চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন। কারণ, অভিজ্ঞতা ও বাস্তব বোধ ব্যতীত এই অনুপম বর্ণনা দেওয়া কবির পক্ষে সম্ভব হত না। বৃন্দাবন দাস যতই নবদ্বীপের পুরনারীদের মুখ দিয়ে শচীমাতার কাছে বলান না কেন—

> ‘‘পুরুবে শুনিলা যেন নন্দের কুমার।
> সেইমত সব করে নিমাঞি তোমার।। ৮০’’[১০০]

কিন্তু চৈতন্যের এই চঞ্চলতার বর্ণনা দেখে মনে হয়, বৃন্দাবন দাস হয়তো চৈতন্যলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে সূত্রটি নিয়েছিলেন ‘শ্রীমদভাগবত’ থেকে, তবে উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সমসাময়িক গ্রামবাংলার মধ্য থেকেই। আর এই কারণে এতো সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে চৈতন্য চরিত্রটি। এরপর বালক চৈতন্যের পিতাকে ছলনা করা এবং পুনরায় ঘাটে স্নান করতে যাওয়ার যে বর্ণনা বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন তাতে হয়তো অলৌকিকতার সমাবেশ ঘটেছে; কিন্তু বালক শিশুর যে ছলনাময় কৌতুকময়তার পরিচয় কবি এ অংশে দিয়েছেন তা তাঁর বর্ণনার গুণে অভূতপূর্ব হয়ে উঠেছে।

আদিখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়েও বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের শিশুসুলভ চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে, তার পাশাপাশি এই অধ্যায়ে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস বর্ণনা করতে গিয়ে কবি যে করুণ রসের পরিচয় দিয়েছেন তা সর্বজনীনতা লাভ করেছে। এই অধ্যায়ের প্রথমেই বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের বাল্যরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন —

> ‘‘শিখাইলে আরো হয় দ্বিগুণ চঞ্চল।
> গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল।। ৫’’[১০১]

পূর্বেই বলা হয়েছে, শিশুদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতাই হল নিষেধকে লঙ্ঘন করা কিংবা বারণ করলে সেই কাজকে জেদের বশবর্তী হয়ে আরো বেশি করে করা। আর এই কারণেই ভয়ে অন্যান্য শিশুদের পিতা-মাতার মতো শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রও নিমাইকে কিছু বলতেন না। অবশ্য পিতা-মাতাকে ভয় না পেলেও অগ্রজ দাদা বিশ্বরূপকে কিন্তু তিনি মান্য করতেন। আর তাই বৃন্দাবন দাস বলেন —

> ‘‘পিতা মাতা কাহারে না করে প্রভু ভয়।
> বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়।। ৮’’[১০২]

এরপর কবি চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপের পরিচয় দান করেছেন। শিশুকাল থেকেই বা জন্মাবধি তিনি ছিলেন সংসার সুখে অনাসক্ত। আবার সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতেই তিনি বিষ্ণুভক্তি যে সার, তা প্রমাণ করতেন। সুতরাং এক শুদ্ধ বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করবার পাশাপাশি চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও ছিলেন সর্ব্বৈব বৈষ্ণব। বৃন্দাবন দাস তাই বিশ্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন —

''নিরবধি থাকে সর্ব্ববৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকথার রঙ্গে। ১৬''[১০৩]

এই বর্ণনার পাশাপাশি বৃন্দাবন দাস তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক চিত্রটিও ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন— তৎকালে সকলেই ধন-পুত্র নিয়ে মিথ্যা সুখে জীবন অতিবাহিত করত। কিন্তু কারো মুখে 'হরিনাম' ছিল না। এমনকি বৈষ্ণবদের দেখলে সমাজের সকলেই উপহাস করত। সেই সমস্ত উপহাসকারি বৈষ্ণবদের বলতেন —

''এতে যে গোসাঞি ভাবে করহ ক্রন্দন।
তভু ত দারিদ্র্য দুঃখ না হয় খণ্ডন।। ২০''[১০৪]

সুতরাং, শুদ্ধ 'বৈষ্ণব ভক্তি' সমাজে ছিল অপাংক্তেয়। কারণ পারমার্থিক ঈশ্বর চিন্তায় কারো বিশ্বাস ছিল না। সকলেই ইহলৌকিক সুখ ভোগের নিমিত্ত লৌকিক দেব-দেবীর পূজা আরাধনায় নিয়ত থাকতেন। কিন্তু বিশ্বরূপ সকল বৈষ্ণবের সাঙ্গে অদ্বৈত আচার্যের সভায় গিয়ে কৃষ্ণভক্তি যে সর্বশাস্ত্রের সার তা ব্যাখ্যা করতেন।

এরপর বৃন্দাবন দাস সরাসরি বলেন গৌরচন্দ্রই হচ্ছে দ্বাপর-লীলার নন্দ-যশোদার তনয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ এবং জগন্নাথ সুত গৌরচন্দ্র তত্ত্বগত দিক থেকে অভিন্ন —

''এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশুসঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বুলে।। ৪৭''[১০৫]

আর এই কারণেই 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এ বর্ণিত কৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুরূপে চৈতন্যবাল্যলীলাকে বর্ণনা করেছেন কবি বৃন্দাবন দাস। তাই দ্বাপরলীলায় যেমন সকল ব্রজবাসী কৃষ্ণকে ভালোবাসতেন, ঠিক তেমনি নবদ্বীপের সকলেই বালক চৈতন্যকে স্নেহ করেন।

এরই পাশাপাশি বৃন্দাবন দাস বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন চৈতন্যের অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস যাত্রার। এই বিয়োগান্ত বর্ণনা সর্বজনীনতা লাভ করেছে শচী ও জগন্নাথ মিশ্রের বিলাপের মধ্য দিয়ে। বালক চৈতন্য কিন্তু অগ্রজ ভ্রাতা বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর কিছুটা সুস্থির হয়েছেন। আগের সেই চঞ্চলতা আজ তাঁর মধ্যে নেই। তিনি এখন সবসময় পিতা-মাতার কাছেই থাকেন এবং বিদ্যার্জনের পুস্তক ছেড়ে কখনোই ওঠেন না। বৃন্দাবন দাস তাই বলেছেন —

''নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে।

দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে।। ১১৪

খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পঢ়ে।

তিলার্দ্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে।। ১১৫"[১০৬]

এই শৈশবেই চৈতন্যের অপূর্ব বিদ্যা-বুদ্ধি দেখে নবদ্বীপের সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি যে অংশটি একবার পাঠ করতেন সেই অংশ দ্বিতীয়বার পাঠ করবার প্রয়োজন হত না। এমনকি, একবার শুনলেই চৈতন্য সকল শাস্ত্রের নিখুঁত ব্যাখ্যা করতে পারতেন। চৈতন্যের এই অভূতপূর্ব বিদ্যার্জনের ধারণ ক্ষমতা দেখে জননী শচীদেবী আনন্দিত হলেও জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন ভীত। কারণ তাঁর মনে ভয় ছিল পাছে দাদা বিশ্বরূপের মতই চৈতন্য সর্ব্বশাস্ত্র জেনে গৃহত্যাগী হয়। কারণ — সর্ব্বশাস্ত্রের মূলেই রয়েছে সংসারের অনিত্যতার কথা। এই কারণেই জগন্নাথ মিশ্র চাইছিলেন —

"অতএব ইহার পঢ়িয়া কার্য্য নাঞি।

মূর্খ হই ঘরে মোর রহুক নিমাঞি।। ১২৭"[১০৭]

জগন্নাথ মিশ্র চৈতন্যকে বিদ্যালাভে বিরত করলে বালক চৈতন্য পুনরায় আবার উদ্ধত হয়ে ওঠেন। তাঁর চঞ্চলতার বহুরূপ প্রকাশ পায় এই সময়। কখনো নিজের ঘরের জিনিস কিংবা কখনো অন্যের ঘরের জিনিস শিশুসুলভ চাপল্যে অপচয় করে বালক চৈতন্য। আবার, কখনো সারারাত্রি বাড়ি না ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে দুষ্টামি করে বেড়ায় সে। এমনকি, দিনের বেলায় দেখে রাখা কারো কলাবন থেকে যেমন কলা ভেঙে খায়, তেমনি আবার অনেক গৃহস্থের দরজা বাইরে থেকে লাগিয়ে দিয়েই আমোদ অনুভব করে। বালক চৈতন্যের এই রকমই এক দুষ্টুমির বর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন—

"এ বড় নিগূঢ় কথা শুন একমনে।

কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে।। ১৬২" [১০৮]

এরপর তিনি বলেন, বালক চৈতন্য বিদ্যার্জন করবার উপায় হিসাবে এক চতুরতার আশ্রয় নেন। তিনি বিষ্ণু নৈবেদ্যের পর ফেলে দেওয়া বর্জ্য হাড়ির স্তুপের ওপরে গিয়ে আশ্রয় নেন। বালক চৈতন্যের এরূপ জ্ঞান দেখে মাতা সন্দিহান হলে পুত্র বলে —

"মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভাল-মন্দ-স্থান।

সর্ব্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয়-জ্ঞান।। ১৬৯"[১০৯]

অর্থাৎ, বিদ্যা জ্ঞান নেই বলেই শুদ্ধ-অশুদ্ধ জ্ঞান নেই তাঁর। আর এ কারণেই মাকে প্রশ্ন করেন — তবে কেন আমাকে বিদ্যার্জন করতে দেও না? বালক চৈতন্যের এই কথা শুনে সকলেই শচীদেবীকে অনুযোগ করেন। বৃন্দাবন দাস এই কাহিনির অন্তরালে 'দত্তাত্রেয় ভাব'-এর তত্ত্ব সন্নিবেশিত করলেও কবির সহজ-সরল বর্ণনার গুণে কৌতুকময় হয়ে উঠেছে। এভাবেই বালক চৈতন্য চতুরতার আশ্রয়ে জগন্নাথ

মিশ্রের কাছ থেকে পুনরায় বিদ্যার্জনের আজ্ঞা লাভ করেন।

আদিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়েও বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের বাল্যাবস্থার বর্ণনা করেছেন। তবে, উল্লেখ্য এই অধ্যায়টিও তিনি অন্যান্য অধ্যায়ের মতই চৈতন্য ও নিত্যানন্দের বন্দনা দিয়েই শুভসূচনা করেছেন। এই অধ্যায়ের শুরুতেই তিনি বলেন, বালক চৈতন্যের উপনয়ন সংস্কারের সময় এসে উপস্থিত। উপনয়ন হল এমন একটি সংস্কার যা যজ্ঞসূত্র ধারণের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। মূলত ব্রাহ্মণ সন্তানদের জন্মাবার পর থেকে ষোলো বছর বয়সের মধ্যেই এই উপনয়ন সংস্কারটি করা হয়ে থাকে। তবে, আট বছর এই উপনয়নের জন্য মুখ্য সময়। অতীতের মত বর্তমানেও উপনয়ন সংস্কারটি একটি বহুল পরিচিত সামাজিক রীতি। বৃন্দাবন দাস নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে চৈতন্যের এই উপনয়ন সংস্কারটির বর্ণনা করেছেন বিস্তৃত ভাবে। বৃন্দাবন দাস প্রসঙ্গতই বলেছেন —

> ‘‘এইমত গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা।
> যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা।। ৭’’[১১০]

এরপর, কিভাবে সমগ্র আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুবর্গ সহকারে জগন্নাথ মিশ্র পরম আনন্দে, নৃত্য-গীত ও বাদ্যের সমন্বয়ে পুত্রের উপনয়ন ক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন কবি। আবার, উপনয়নের এই সামাজিক ক্রিয়াটি যেহেতু এক শুভ কাজ তাই —

> ‘‘শুভ মাসে, শুভ দিন, শুভ ক্ষণ করি।
> ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।। ১৩’’[১১১]

শৈশবে গৌরচন্দ্র এই উপনয়ন গ্রহণ করবার পর তাকে দেখতে যেন বামনদেবের মতই মনে হচ্ছিল বলে বর্ণনা করেছেন কবি। শুধু তাই নয়, এই উপনয়ন প্রথার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল— যেদিন এই প্রথাটি সংঘটিত হয় সেইদিন হাতে দণ্ড ও কাঁধে ঝুলি নিয়ে ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করে মায়েদের কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। চৈতন্য যেহেতু মানব দেহধারী এবং তাঁর লীলাটি যেহেতু ‘নরলীলা’ তাই অন্যান্য ব্রাহ্মণ সন্তানের মত তিনিও —

> ‘‘হাথে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি, শ্রীগৌরসুন্দর।
> ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব্বসেবকের ঘর।। ১৭
> যার যথা শক্তি ভিক্ষা সভেই সন্তোষে।
> প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে।। ১৮’’[১১২]

তবে লক্ষণীয়, কবি বৃন্দাবন দাসের পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির। কারণ — সমাজ সম্পর্কিত নিখুঁত বাস্তবতাবোধ ও পর্যবেক্ষণ শক্তি ব্যতীত এই অনুপম বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। কবি জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত নিজ অভিজ্ঞতা প্রসূত ঘটনাবলীকেই যে কাব্য মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন— এ বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই।

এরপর বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাশিক্ষা লাভ ও বাল্যাবস্থাতেই নিমাইয়ের প্রখর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। শৈশব থেকেই চৈতন্য যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই বৃন্দাবন দাস যখন বলেন —

"গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।

পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন।। ৩৪"[১১৩]

শুধু তাই নয়, বিদ্যাশিক্ষার পাশাপাশি নিজের সমবয়স্ক সহপাঠীদের সঙ্গে বালক চৈতন্য যেমন শাস্ত্র ও শিক্ষাগুরু নিয়ে তর্কযুদ্ধ করতেন, তেমনি আবার এই কলহ অনেক সময় গালাগালি কিংবা মারামারির পর্যায়েও পৌঁছায়—

"এইমত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি।

তবে জল ফেলাফেলি তবে দেন বালি।। ৪৬

তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে।

কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহো মারে।। ৪৭"[১১৪]

তবে, এই বর্ণনার পাশাপাশি কবি আবার তৎকালীন নবদ্বীপের সামাজিক চিত্রের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বার বার উল্লেখ করেছেন — তৎকালে নবদ্বীপ ছিল বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এখানে যেমন এক অধ্যাপকের কাছে সহস্র শিষ্য বিদ্যাশিক্ষা লাভ করত, তেমনি আবার প্রতি গ্রামেই এইরকম অজস্র বিদ্যার্থী শিক্ষালাভের জন্য দেশের নানা প্রান্ত থেকে নবদ্বীপে এসে বসবাস করত। তবে, এই সকল অজস্র পড়ুয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বালক চৈতন্য। তিনি শাস্ত্র ও তত্ত্ব আলোচনায় সকলের ব্যাখ্যা ও যুক্তিকে খণ্ডন করে নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করতেন যুক্তি সহকারে। আর এই কারণেই সমবয়স্ক সকল বিদ্যার্থীর মধ্যে সহজেই বুদ্ধির প্রখরতায় শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল বালক চৈতন্য। এছাড়াও বিদ্যাশিক্ষা লাভের একটি প্রধান উপকরণ হল — পাঠাভ্যাসের প্রতি নিয়মানুবর্তিতা, আর বালক চৈতন্য যে প্রতিদিন নিয়ম করে নির্জ্জন স্থানে পাঠাভ্যাস করতেন, তার প্রমাণ আমরা পাই কবির এই বর্ণনা থেকে—

"ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।

পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে।। ৭২

আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।

ভুলিলা পুস্তকরসে সর্ব্বদেবমণি।। ৭৩"[১১৫]

লক্ষণীয় যে, বাল্যাবস্থাতেই কিন্তু চৈতন্যদেব কলাপ ব্যাকরণের টীকা লিখেছিলেন বলে এখানে উল্লেখ করেছেন কবি। যদিও, চৈতন্যদেবের এই টীকা গ্রন্থটি এখনও উদ্ধার করা যায় নি।

এরপর চৈতন্যের রূপসুধা দেখে পিতা জগন্নাথ মিশ্র কিভাবে রূপমাধুর্যের আস্বাদনে

আত্মস্মৃতিহারা হয়ে পড়েছিলেন তার বর্ণনা এরূপ—

"ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে। ৮১"[১১৬]

ঠিক এমন সময়ই আবার চৈতন্যের ভবিষ্যৎ সন্ন্যাস যাত্রা নিয়ে স্বপ্নদর্শন করেন জগন্নাথ মিশ্র। তবে, তাঁকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে প্রবোধ দান করেন শচীদেবী—

"পুঁথি ছাড়ি নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যারস তার হইয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্ম।। ১০৪"[১১৭]

এভাবে পুত্রস্নেহে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর জগন্নাথ মিশ্রের দেহান্তর ঘটে। অর্থাৎ লক্ষণীয়, বৃন্দাবন দাস কিন্তু সমগ্র চৈতন্য জীবন পর্যায়কে তুলে ধরেছেন। আর তাই তিনি যেমন চৈতন্যের পরিবার বর্গের অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি পাশাপাশি তৎকালীন নবদ্বীপের সামাজিক চিত্রও যথার্থ ফুটিয়ে তুলেছেন। আসলে 'জীবনচরিত কাব্য' রচনার মূল বৈশিষ্ট্যই হল তাই। এক্ষেত্রে, চরিতকারের জীবনের কোন কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। তাই যেমন — জীবনের আনন্দ-কৌতূহলের কথা এই ধরনের কাব্যে স্থান পায়, ঠিক তেমনি পাশাপাশি বেদনাময় দুঃখের জীবনাভূতির কথাও কবি মমতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। বৃন্দাবন দাস প্রথম বাংলা চৈতন্যজীবনী কাব্যকার হলেও, তিনি সার্থক ভাবেই জগন্নাথ মিশ্রের মহাপ্রয়াণের পর শচীদেবী ও চৈতন্যদেব-এর দুঃখময় বেদনাভূতিকে চিত্রিত করেছেন। মৃত্যু যেহেতু জীবনেরই একটি স্বাভাবিক পরিণাম, তাই ধীরে ধীরে শচীদেবীও পুত্রের দিকে তাকিয়ে দুঃখময় স্মৃতিকে ভোলবার চেষ্টা করেছেন। বৃন্দাবন দাস তাই বলেছেন —

"শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহ-স্মৃতি-মাত্র নাহি থাকে কিসে দুঃখ।। ১১৬"[১১৮]

কিন্তু জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই শচীর সংসারে নেমে এসেছিল দারিদ্র্য। কিন্তু বালক নিমাইয়ের অল্প বয়স হওয়ায় সংসার সম্পর্কিত অভাববোধ বোঝবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই —

"কি থাকুক, না থাকুক, নাহিক বিচার।
চাইলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর।। ১২১"[১১৯]

আসলে কবি মানুষ চৈতন্যের জীবনাচরিত রচনা করতে বসেছিলেন। আর তাই চৈতন্যের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম-ক্রোধ থাকাটাও স্বাভাবিক। এই কারণে একদিন গঙ্গাস্নান করতে যাবার সময় শচীদেবীকে বালক চৈতন্য বলেন —

"দিব্য-মালা-সুগন্ধি-চন্দন দেহ' মোরে।
গঙ্গাস্নান করি চাঙ গঙ্গা পূজিবারে।। ১২৫"[১২০]

কিন্তু শচীদেবী নিমাইকে বলেন —

''জননী কহেন, ''বাপ! শুন মন দিয়া।

ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আঁনো গিয়া।।'' ১২৬''[১২১]

মায়ের কাছে একথা শ্রবণ করে বালক চৈতন্য কিন্তু রাগে উন্মত্ত হয়ে পড়েন। অবুঝ চৈতন্য তখন ক্রোধান্বিত হয়ে প্রথমে ঘরে রাখা সমস্ত মাটির কলসি ভেঙে ফেলেন। তারপর —

''তৈল, ঘৃত, লবণ আছিল যাতে যাতে।

সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাথে।। ১৩০''[১২২]

ক্রোধান্বিত অবস্থায় অবুঝ বালক চৈতন্যের যে চরিত্রগত চিত্র কবি বৃন্দাবন দাস এক্ষেত্রে অঙ্কন করেছেন তাতে হয়তো অতিশয়োক্তির সমাবেশ ঘটেছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও কবি যে বাস্তবাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই শিল্পসার্থকতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই রাগের মাথায় ঘরের সমস্ত কিছু ভেঙে নষ্ট করে দিলেও পরে যখন রাগ কমে গেছে তখন নিজেই লজ্জিত হয়েছে চৈতন্যদেব। তবে, কবি কিন্তু জানাতে ভোলেন নি যে, বালক চৈতন্য এতো দুষ্টামি করা সত্ত্বেও সর্বদাই হাতে পুস্তক রাখতেন। অর্থাৎ পাঠাধ্যায়নের প্রতি চৈতন্যদেবের আগ্রহ কিন্তু ছিল আশৈশব। আর এই কারণেই চৈতন্যদেব বাল্যাবস্থাতেই শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্নেহধন্য হয়েছিলেন।

চৈতন্যদেবের এরূপ শৈশবের বর্ণনার পাশাপাশি বৃন্দাবন দাস কিন্তু তৎকালীন নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থার চিত্র বর্ণনা করতে ভোলেন নি। তিনি তাই বলেন —

''হরিভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।

অসৎসঙ্গ অসৎপথ বহি নাহি আর।। ১৯৫

নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।

দেহ-গেহ-ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে।। ১৯৬''[১২৩]

অর্থাৎ, গৃহাদির সাজ-সজ্জা কিংবা দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই এই সময় মানুষ দিন অতিবাহিত করত। আবার নিজ পুত্রের জন্ম কিংবা অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আড়ম্বরপূর্ণ অর্থব্যয় করলেও কারো মধ্যেই পরমার্থিক ঈশ্বরবিশ্বাস ছিল না।

এরপর বৃন্দাবন দাস এই আদি খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়েই নিত্যানন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। নিত্যানন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন —

''পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায়।

রাঢ়ে অবতীর্ণ হই আছেন লীলায়।। ২০৫

হাড়ো-ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।

একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি।। ২০৬''[১২৪]

অর্থাৎ চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই নিত্যানন্দ রাঢ়বঙ্গের বীরভূম জেলায় 'একচাকা' গ্রামে জন্মগ্রহণ

করেন; যেখানে 'মৌড়েশ্বর' নামে শিব লিঙ্গের বিগ্রহ স্থাপিত। তাঁর পিতার নাম হাড়াই ওঝা বা হাড়াই পণ্ডিত এবং মাতা পদ্মাবতী। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের শৈশবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —

''শিশু হৈতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান্।
জিনিঞা কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের ধাম।। ২০৭''[১২৫]

অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই নিত্যানন্দ ছিলেন ধীরস্থির, বুদ্ধিমান ও প্রভূত গুণের অধিকারী। আবার, শিশুকাল থেকেই যে নিত্যানন্দ দেবভক্ত ছিলেন এবং দেবকাহিনিগুলির নাট্যাভিনয় যে করতেন তার প্রমাণ মেলে কবির দেওয়া বর্ণনা থেকে। নিত্যানন্দ মূলত শৈশবে তাঁর সমবয়সী শিশুদের নিয়ে কৃষ্ণ লীলারই অনুকরণ করে অভিনয়গুলি করতেন। তবে, সেইসঙ্গে রামায়ণের কাহিনি অনুসারেও যে নাট্যাভিনয়গুলি হত, তার প্রমাণও মেলে এই অংশের বর্ণনা থেকে—

''কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে।। ২৪৬
... ...
শ্রীলক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিলা আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে।। ২৪৮''[১২৬]

কবির দেওয়া এই বর্ণনা দেখে মনে হয়, তিনি একদিকে যেমন 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তেমনি পাশাপাশি 'রামায়ণ', 'মহাভারত' সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। কারণ— বিশালায়তন রামায়ণের কাহিনী সম্পর্কে অণুপুঙ্ক্ষ জ্ঞান না থাকলে এমন বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

এরপর বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন— নিত্যানন্দের বয়স যখন বারো বৎসর, তখন তিনি তীর্থযাত্রা করতে বেরিয়ে পড়েন এবং তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে কুড়ি বৎসর অতিক্রান্ত হলে তিনি চৈতন্য সম্পর্কে নানা সংবাদ জানতে পারেন। কবি তাই প্রসঙ্গতই লিখেছেন—

''তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর।। ৩০২''[১২৭]

নিত্যানন্দ কোন্ কোন্ তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছিলেন তার একটা তালিকা দেবার চেষ্টা করেছেন কবি বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের আদিখণ্ডের এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে। প্রথমে তিনি ভ্রমণ করেন বীরভূম জেলার অন্তর্গত 'বক্রেশ্বর'। তারপর 'বৈদ্যনাথ ধাম' যা বর্তমানে দেওঘর নামে পরিচিত। এরপর ক্রমান্বয়ে নিত্যানন্দ গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বাদশ বন, হস্তিনাপুর, দ্বারকা, সিন্ধুপুর, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চী, কুরুক্ষেত্র, ত্রিতকূপ, প্রতিস্রোতা, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, গুহক, চণ্ডালরাজ্য, সরযু, পুলহ-আশ্রম, গোমতী, গণ্ডকী, শোন, মহেন্দ্র পর্ব্বত, হরিদ্বার, সপ্তগোদাবরী, শ্রীপর্ব্বত, দ্রাবিড়, কাবেরী, শ্রীরঙ্গনাথ স্থান, ঋষভ পর্ব্বত, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, মলয় পর্ব্বত, বদরিকাশ্রম, বৌদ্ধাশ্রম, দক্ষিণ সাগর,

অনন্তপুর (দক্ষিণ ভারত), গোকর্ণাখ্য, কেরল, রেবা, মনুতীর্থ, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, বিজয়ানগর, গঙ্গাসাগর, নীলাচল প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। নিত্যানন্দের এই সর্ব তীর্থ ভ্রমনের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রে দেবভক্তির আবেশকে আমরা লক্ষ্য করি। তবে, নিত্যানন্দের ক্রোধোন্মত্ত রূপের প্রকাশ আমরা পাই, যখন তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে তিনি বৌদ্ধাশ্রমে এলেন, তখন —

"তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।

দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ।। ৩৪৫

জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।

ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে।। ৩৪৬"[১২৮]

নিত্যানন্দের এই তীর্থ ভ্রমণ করবার সময়ই আবার পরম বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞ মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই উভয়ের সাক্ষাতে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বলে মনে করেন। নিত্যানন্দ ও মাধবেন্দ্র পুরী — পরস্পর এই প্রেম-সান্নিধ্যে কিছুদিন একসঙ্গে থাকবার পর, নিত্যানন্দ পুনরায় চলে আসেন মথুরায়। এভাবে বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের তীর্থ ভ্রমণের অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা করেছেন। তবে, তিনি স্বীকার করেছেন—

"তান তীর্থ-যাত্রা সব কে পারে কহিতে।

কিছু লিখিলাঙ মাত্র তান কৃপা হৈতে।। ৪০৪"[১২৯]

এরপর কবি নিজ গুরু নিত্যানন্দের বন্দনা গান করেছেন বেশ কিছু পয়ার জুড়ে। এই অংশে কবি প্রথমে নিত্যানন্দ প্রভুকে ভজনা করবার জন্য অনুনয়-বিনয়, মিনতি, অনুরোধ করেছেন ভক্ত-পাঠক বর্গের কাছে। কিন্তু শেষে নিজেই ধৈর্যের সীমাকে অতিক্রম করে খেদোক্তি করেছেন এই বলে যে —

"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।

তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।। ৪২৬"[১৩০]

বৃন্দাবন দাসের এই গুরু বন্দনা থেকেই বোঝা যায়, তিনি কতটা একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আর এই কারণেই চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থ লিখতে বসে তিনি গুরুদেবের প্রতি নিজ কৃতাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। এছাড়াও তিনি যে গুরুদেবের নির্দেশেই এই বৃহৎ চৈতন্যজীবনী কাব্যটি লিখতে শুরু করেছিলেন তাও স্বীকার করেছেন এই অংশে। তবে লক্ষণীয়, এই আদিখণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাস জানাতে ভোলেন নি যে, এখনও পর্যন্ত নিত্যানন্দ ও চৈতন্যের কিন্তু সাক্ষাৎ ঘটে নি। আর এই কারণেই কবি বলেছেন —

"বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে' নিত্যানন্দ।

যাবত না আপনা' প্রকাশে' গৌরচন্দ্র।। ৪৩৭"[১৩১]

আদিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়েও কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের 'বিদ্যাবিলাস' দিয়েই কাহিনির সূচনা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন চৈতন্য বিদ্যা শিক্ষা অধ্যয়নের আনন্দে দিবারাত্রি মগ্ন থাকতেন। অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প্রতিদিন যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে পক্ষ-প্রতিপক্ষ হত কিশোর চৈতন্য তাতে

অংশগ্রহণ করতেন। লক্ষণীয়, এই প্রতিপক্ষে অংশগ্রহণ করবার সময় চৈতন্যের কিন্তু কোনো সহায়ক পুথির দরকার হত না। এই সময় প্রেক্ষিতে চৈতন্যের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

''গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদন-মোহন।
যোড়শ-বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন।। ১৪''[১৩২]

আবার, এই তর্কযুদ্ধগুলি মূলত যে ব্যাকরণের বিষয় নিয়েই করা হত তার উল্লেখ পাই কবির এই অংশের বিবরণ থেকে। তবে, এই সমবয়সীদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ অনেক সময় ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়ে দাঁড়াত পক্ষ-প্রতিপক্ষের কাছে। তাই চৈতন্যদেব তাঁর ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান নিয়ে যেমন গর্ব অনুভব করেছেন, তেমনি পাশাপাশি বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও মুরারি গুপ্তকে তীব্র ব্যঙ্গের ভাষায় কশাঘাত হেনেছেন। তবে, পাণ্ডিত্যের দিক থেকে মুরারি গুপ্তও চৈতন্যের সমতুল্য হওয়ায়, বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

''গুপ্ত বোলে এক অর্থ, প্রভু বোলে আর।
প্রভু-ভৃত্যে কেহো কারে নারে জিনিবার।। ২৯''[১৩৩]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তার প্রমাণ আমরা বৃন্দাবন দাসের এই 'বিদ্যাবিলাস' অংশের বিবরণ থেকে পাই। এরই পাশাপাশি বৃন্দাবন দাস তৎকালীন টোলগুলিতে শিক্ষা ব্যবস্থার যে অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন তা তাঁর সমাজ অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। কারণ — সমাজ সম্পর্কিত সামাজিকবোধ ব্যতীত কোনো কবির পক্ষে এমন অনুপম বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

চৈতন্যদেবের এই অধ্যয়ন পর্যায়ের বর্ণনার পর বৃন্দাবন দাস উল্লেখ করেছেন তাঁর অধ্যাপক পর্বের। মূলত মুকুন্দ-সঞ্জয় নামে এক ব্যক্তির চণ্ডীমণ্ডপেই চৈতন্যদেব অধ্যাপনা করতেন। চৈতন্যদেবের কাছে যে অজস্র শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের জন্য এই চণ্ডীমণ্ডপে আসত, তার বিবরণও দিয়েছেন কবি। চৈতন্যদেব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করতে গিয়ে ব্যাকরণের কোনো বিষয় নিয়ে নিজেই ব্যাখ্যা দিতেন, আবার নিজেই তা খণ্ডন করে পুনরায় অপর একটি ব্যাখ্যা দিতেন। চৈতন্যদেবের এহেন কার্য থেকে আমরা তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে থাকি।

এরপর বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন —

''কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন।
বিবাহের কার্য মনে চিন্তে অনুক্ষণ।। ৪৬''[১৩৪]

নবদ্বীপের সুব্রাহ্মণ বল্লভ আচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয় চৈতন্যদেবের। এই বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন কবি বৃন্দাবন দাস। তিনি জানিয়েছেন — বনমালী আচার্য নামে এক ঘটক শচীদেবীর কাছে আসেন বল্লভ আচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে চৈতন্যদেবের পরিণয় সংঘটিত করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শচীদেবী তাঁকে বলেন —

''আই বোলে, পিতৃহীন বালক আমার।

জীউক পঢ়ুক আগে, তবে কার্য্য আর।। ৫৭”[১৩৫]

একথা শুনে ঘটক বনমালী বিষণ্ণ মুখে চলে যাবার সময় পথে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্যদেব তাকে কোথায় গিয়েছিল জিজ্ঞেস করলে, বনমালী ঘটক বলেন —

“তোমার বিবাহ লাগি বলিলাঙ তানে।
না জানি, শুনিঞা শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে।। ৬১”[১৩৬]

ঘটকের কাছ থেকে একথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব বিষণ্ণ হন এবং শচীদেবীকে এসে জিজ্ঞাস করেন — কেন তিনি বনমালীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন? বৃন্দাবন দাসের দেওয়া এই বর্ণনা দেখে মনে হয়, চৈতন্যদেব ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার পূর্ব প্রণয় ছিল এবং চৈতন্যদেবই হয়তো বনমালীকে ঘটক করে শচীদেবীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। যাই হোক, শচীদেবী পুত্রের বিবাহের ইচ্ছা বুঝতে পেরে বনমালীকে ডেকে আনেন এবং পুত্রের বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলেন। তখন বনমালী বল্লভ আচার্য্যের কাছে গিয়ে তাঁর কন্যাকে চৈতন্যদেবের হাতে সমর্পিত করবার প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবে আচার্য্য খুশি হয়ে বনমালীকে বলেন—

“কন্যা-মাত্র দিব পঞ্চ হরীতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া।। ৭৫”[১৩৭]

এই প্রস্তাবে শচীদেবী রাজি হলে শুভদিনে, শুভক্ষণে এবং শুভলগ্নে চৈতন্যদেবের বিয়ে স্থির হয়। নৃত্য-গীত-বাদ্য সমারোহে অধিবাস করা হয় চৈতন্যদেবের। বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় খই-কলা-চন্দন-তেল-সিঁদুর-তাম্বুল প্রভৃতির অণুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। কবির দেওয়া চৈতন্যদেবের বিয়ের বর্ণনা দেখে মনে হয়, তিনি যেন স্বচক্ষে দেখা কোনো বিবাহের বর্ণনা দান করেছেন। কবি যে, কতটা সামাজিক ছিলেন এবং বাস্তব সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তাঁর যে কতটা গভীর ছিল তার প্রমাণ মেলে এই বর্ণনা থেকে—

“সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে।
জামাতারে বরিলেন পরম কৌতুকে।। ৯২
শেষে সর্ব্ব-অলংকারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ।। ৯৩
হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিলা করিতে।
তুলিলেন সভে প্রভুরে পৃথ্বী হইতে।। ৯৪
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
জোড় হস্তে রহিলেন করি নমস্কার।। ৯৫”[১৩৮]

এরপর মালাবদল এবং তারপর বল্লভাচার্য্যের কন্যা সম্প্রদানের পর পতিব্রতা নারীরা বিয়ের আনুষঙ্গিক মঙ্গলাচার করেন। চৈতন্যদেব সেই রাত্রি সেখানে থেকে পরদিন সন্ধ্যাবেলায় পাল্কী করে বাড়ি আসেন।

তখন এই নব-দম্পতিকে দেখবার জন্য প্রতিবেশীরা সকলেই যেমন ছুটে আসেন, তেমনি প্রত্যেকেই আবার নানারূপ মন্তব্যও করেন। অবশ্য সকলেই এই নব-দম্পতিকে হয় 'লক্ষ্মী-নারায়ণ', না হয় 'রাম-সীতা' কিংবা 'হর-গৌরী' বলে উপমিত করেছেন। এরপর বৃন্দাবন দাস বলেন —

''তবে, শচীদেবী বিপ্রপত্নীগণ লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া।। ১১৭''[১৩৯]

এভাবে চৈতন্যদেব ও লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিবাহ সংঘটিত হবার পর পূর্বের ন্যায় মিশ্র পরিবারের দারিদ্র্য অনেকটাই ঘুচে যায়। শচীদেবী তখন মনে মনে ভাবেন পুত্রবধূ সুলক্ষণা হওয়ায় তাদের দারিদ্র্য দূরীভূত হয়েছে। এমন সময়ই শচীদেবী পরম এক অদ্ভুত জ্যোতি দর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাসের যে ব্যাখ্যা তাতে হয়তো অলৌকিকতার স্পর্শ রয়েছে; তবে শচীদেবী নব পুত্রবধূ সম্পর্কে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তা কিন্তু যথার্থই বাস্তব। কারণ, আজও অনেক পুত্রবধূকে সুলক্ষণা লক্ষ্মী বলে শ্বশুরবাড়িতে আখ্যাত করা হয়। তাই বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

''এইমত নানা মনকথা আই কহে।
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয়ে।। ১২৭''[১৪০]

চৈতন্যদেব যেহেতু নিজেকে অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন তাই বিবাহ পরবর্তী জীবনেও তিনি বিদ্যারসেই নিয়োজিত থাকতেন। এই সময় চৈতন্যদেব তাঁর অজস্র শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নগর ভ্রমণ করতেন এবং নানান শাস্ত্র ও ব্যাকরণ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে নিজের ঔদ্ধত্যভাব প্রকটন করতেন। লক্ষণীয়, তখনও পর্যন্ত কিন্তু চৈতন্যদেবের মধ্যে কোনোরূপ কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণভক্তি জনিত আনন্দের প্রকাশ দেখা যায় নি। আর একারণে অনেকে চৈতন্যদেবকে বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করলেও তিনি কিন্তু এসব বিষয়কে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। এই বর্ণনার পাশাপাশি বৃন্দাবন দাস তৎকালীন নবদ্বীপের শিক্ষাব্যবস্থার প্রভূত প্রশংসা করে বলেছেন —

''চতুর্দ্দিগ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায়।। ১৪৭
চাটীগ্রাম নিবাসীও অনেক তথায়।
পঢ়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায়।। ১৪৮''[১৪১]

অর্থাৎ তৎকালে নবদ্বীপ যে ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র তা জানাতে ভোলেন নি কবি। শিক্ষা ও শিক্ষানুরাগী পণ্ডিত মানুষদের সাহচার্য এবং পরিশীলিত সাংস্কৃতিক পরিবেশ-পরিমণ্ডলই যে চৈতন্যদেবকে অধ্যাপক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছিল, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। তবে, নবদ্বীপ শিক্ষা-সংস্কৃতির পাশাপাশি সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম চর্চার পীঠস্থানও যে ছিল তাও বোঝা যায় যখন বৃন্দাবন দাস বলেন, অদ্বৈত পণ্ডিতের বাড়িতে প্রতিদিন বিকালে ভাগবৎ চর্চার কথা এবং তাতে প্রভূত বৈষ্ণবের

সমাগমের কথা। এমনকি অদ্বৈতের বাড়িতে এই বৈষ্ণবীয় আলোচনায় মুকুন্দ দাসও যে আসতেন, তা কবি উল্লেখ করেছেন। তবে, এই বৈষ্ণবীয় তাত্ত্বিক আলোচনায় চৈতন্যদেব কিন্তু আসতেন না। তিনি বরং কিছুটা উদাসীনতা ও ঔদ্ধত্যের মধ্য দিয়ে ব্যবহারিক বিদ্যানুশীলনেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়োজিত থাকতেন। চৈতন্যদেব মনে করতেন শুধু বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মে নিজেকে বৈষ্ণব মনে করলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না, এর জন্য বহুত অনুশীলনের প্রয়োজন। আর তাই মুকুন্দের মতো বৈষ্ণবকেও ব্যঙ্গ করতে চৈতন্যদেব ছাড়েন নি।

এদিকে তৎকালে বৈষ্ণবেরা যে নদীয়া তথা নবদ্বীপে অপাংক্তেয় একটি গোষ্ঠীতে শুধুমাত্র আবদ্ধ ছিল, তাও জানা যায় কবির কথা থেকে। বৈষ্ণবদের দেখলে তৎকালীন ব্যবহারিক সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিরা নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নিক্ষেপ করত। ভাগবত কীর্তন-বিরোধী এই মানুষেরা বৈষ্ণবদের দেখে বলত—

"ধীরে ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে কাঁদিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে।। ১৮৬"[১৪২]

এসব কীর্তন-বিরোধী লোকদের কীর্তন সম্পর্কিত নিন্দায় বৈষ্ণব ভক্তরা বড় দুঃখ অনুভব করতেন এবং অদ্বৈতের কাছে গিয়ে তাদের নিবেদন জানাতেন। সুতরাং গোঁড়া বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মানুষেরা যে তৎকালে অপমানিত ও নিগৃহীত হয়েছিলেন তা বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যায়। চৈতন্যদেব কিন্তু এই সময়েও অধ্যয়ন সুখেই নিয়োজিত ছিলেন। বৃন্দাবন দাস জানান—

"হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বর-পুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত বেশ ধরি।। ১৯৯"[১৪৩]

ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আগমন করে অলক্ষিতবেশে অর্থাৎ নিজেকে আত্মগোপন করে অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে, মুকুন্দ দত্তের মুখে কৃষ্ণলীলাত্মক গান শ্রবণ করে প্রেমাবেশে লিপ্ত হন এবং নিজের স্বরূপ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করান। হঠাৎই একদিন ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয় এবং চৈতন্যদেবের অনুরোধে তাঁর বাড়িতে ঈশ্বরপুরী আতিথ্য গ্রহণ করেন। লক্ষণীয়, এই সময়েও কিন্তু চৈতন্যদেবের মধ্যে ভগবৎ প্রেমাবেশের প্রকাশ ঘটে নি। ঈশ্বরপুরী এরপর কয়েকমাস নবদ্বীপবাসী গোপীনাথ আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করেন। এসময়ই তাঁর সঙ্গে গদাধর পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হয়। গদাধর পণ্ডিতও বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। তাঁকে ঈশ্বরপুরী নিজগ্রন্থ 'কৃষ্ণলীলামৃত' পাঠ করতে দেন। শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবকেও ঈশ্বরপুরী এই গ্রন্থটি পাঠ করতে ও তার সমালোচনা করতে দেন। কিন্তু চৈতন্যদেব বলেন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক যে কোনো কাব্যই ভক্তি ও প্রীতি সহকারে লেখা হয়। তাই এরূপ কাব্যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও তা গ্রাহ্য নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে আনন্দলাভ করেন এই কাব্য থেকে। চৈতন্যদেবের এই অভিনব ব্যাখ্যা শুনে ঈশ্বরপুরী বড়ই প্রীত হন। কিন্তু তবু অধ্যাপক চৈতন্যদেবকে

ঈশ্বরপুরী তাঁর গ্রন্থের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দিতে বললে চৈতন্যদেব ব্যাকরণের ‘ধাতু’ বিষয়ক ত্রুটি ধরিয়ে দেন। এভাবে ঈশ্বরপুরী ও চৈতন্যদেব বেশ কিছুদিন বিদ্যারসে নিয়োজিত থাকার পর ঈশ্বরপুরী তীর্থ পর্যটন করবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। লক্ষণীয়, বৃন্দাবন দাস এই অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়াও অধ্যাপক রূপে তিনি যে যশস্বী হয়েছিলেন তারও উল্লেখ করেছেন কবি বৃন্দাবন দাস।

আদিখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়েও বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। চৈতন্যদেব মূলত ব্যাকরণ শাস্ত্রেরই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং অনুশীলন করতেন। কিন্তু মুকুন্দের সঙ্গে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্র নিয়েও পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বিচার করেন। অলঙ্করশাস্ত্র সম্পর্কিত চৈতন্যদেবের ব্যাক্যবলী মুকুন্দ খণ্ডন করতে পারেন নি। সুতরাং বোঝা যায়, সর্ব বিষয়েই সমান পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যদেব। তাঁর পাণ্ডিত্যের আরো প্রমাণ আমরা পাই গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে ন্যায় শাস্ত্র আলোচনার মাধ্যমেও। চৈতন্যদেব মুক্তির লক্ষণ কী?— জিজ্ঞেস করলে গদাধর যা ব্যাখ্যা করেন তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি তিনি। প্রত্যুত্তরে, চৈতন্যদেব যা ব্যাখ্যা করেন তা আবার খণ্ডন করতে পারেন না গদাধর পণ্ডিত। কবি বৃন্দাবন দাস তাই বলেছেন —

> ‘‘হেন জন নাহিক যে প্রভু মনে বোলে।
> গদাধরী ভাবে ‘আজি বর্ত্তি পলাইলে’।। ২৬’’[১৪৪]

অর্থাৎ, বিদ্যা ও শাস্ত্র বিষয়ক তার্কিক আলোচনায় চৈতন্যদেবের সঙ্গে কোনো পণ্ডিতই যুক্তি-তর্ক করতে সমর্থ হত না। সুতরাং, একদিকে পাণ্ডিত্য ও অন্যদিকে অধ্যাপক রূপে তৎকালীন নবদ্বীপ সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছিলেন প্রভূত শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত অসাধারণ এই বিদ্বান মানুষটি। সকলেই তাঁকে বিদ্বান বলে সম্ভ্রম করতেন। সকল নবদ্বীপবাসীই ভাবতেন যে —

> ‘‘মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাঞি।
> কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই।। ৪০’’[১৪৫]

সুতরাং, বিদ্যারসে উন্মত্ত চৈতন্যের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান না দেখে বৈষ্ণবেরা মনে মনে দুঃখ পেলেও চৈতন্যদেব বলতেন —

> ‘‘হাসি বোলে প্রভু ‘বড় ভাগ্য সে আমার।
> তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি সার।।’ ৪০’’[১৪৬]

এরকম ভাবে চৈতন্যদেব বিদ্যারসের আস্বাদনে উন্মত্ত হয়ে সকল শিষ্য সহকারে নবদ্বীপের নগরে নগরে পরিভ্রমণ করতেন। এছাড়াও প্রতিদিন বিকালে তিনি গঙ্গাতীরে সমস্ত পড়ুয়াদের নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করতেন। চৈতন্যদেবের এই তাত্ত্বিক আলোচনায় বৈষ্ণবেরাও এসে মিলিত হতেন এবং তন্ময় হয়ে তাঁর শাস্ত্র বিষয়ক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শুনতেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

''একদিন বায়ু দেহ মান্দ্য করি ছল।

প্রকাশেন প্রেমভক্তি বিকার সকল।। ৬৭''[১৪৭]

অর্থাৎ, একদিন বায়ুরোগের ছলনার মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্তরে এতদিন ধরে চৈতন্যদেবের মধ্যে যে ভগবৎ কৃষ্ণপ্রেম সুপ্ত ছিল, তা এবার বাইরে প্রকাশ পেতে শুরু করে। অবশ্য চৈতন্যদেব যেহেতু একজন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষ ছিলেন তাই তাঁর মধ্যে বায়ুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াটাও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। যদিও কবি বলেছেন এই বায়ুরোগ আসলে চৈতন্যদেবের ছলনা মাত্র। তবে আমাদের মনে হয়, চৈতন্যদেবের মধ্যে এতদিন যে সর্বশাস্ত্রের অধ্যাপক রূপে জ্ঞান মার্গের সাধনা চলছিল তা থেকে তিনি যেন এবার ভক্তিমার্গে উত্তরণ শুরু করলেন। আর এই জ্ঞান মার্গ থেকে ভক্তিমার্গে উত্তরণের চাবিকাঠি হল চৈতন্যদেবের বায়ু রোগের বিকার। অবশ্য চৈতন্যদেবের এই বায়ুরোগ দেখে সকলেই প্রতিকার করবার জন্য ছুটে আসে। বৃন্দাবন দাস তাই বলেছেন—

''বিষ্ণুতৈল নারায়ণতৈল দেন শিরে।

সভে করে প্রতিকার, যার যেন স্ফুরে।। ৭৩''[১৪৮]

বহুবিধ এরকম প্রতিকারের বেশ কিছুদিন পর চৈতন্যদেব স্বাভাবিক হন। তাঁর এই প্রেম বিকার সম্বরণ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সংবাদে নবদ্বীপের সকলেই আনন্দের উচ্ছ্বাসে লিপ্ত হন। সকলেই চৈতন্যদেবের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। সুস্থ হয়ে চৈতন্যদেব কিন্তু পুনরায় অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন। চৈতন্যদেবের এই বহু শিষ্য সমন্বিত অধ্যাপনা কার্যকে বৃন্দাবন দাস নারায়ণের বদরিকাশ্রমের সঙ্গে উপমিত করে বলেছেন —

''সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ।

নিশ্চয় জানিহ এই শ্রীশচীনন্দন।। ৯৭''[১৪৯]

অর্থাৎ, নারায়ণ বা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যে শচীনন্দন চৈতন্যদেব, — তা আরও একবার পাঠকবর্গের কাছে জানালেন কবি বৃন্দাবন দাস। এভাবে, প্রতিদিন পুনরায় বিদ্যাবিলাসে এবং অধ্যাপনা কার্যে নিত্যকৃত্য কর্মের মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেব নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তবে, এতদিনের অর্জিত বিদ্যাজ্ঞানের মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেব এবার পারিপার্শ্বিক নবদ্বীপ সমাজকে প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেন। আর তাই বিদ্বান, অহংকারী, ঔদ্ধত্যপূর্ণ এই অধ্যাপক মানুষটি সাধারণের কাছে নেমে আসেন। বুঝতে চান তাঁর লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখকে। অর্থাৎ অহংকারী, গর্বী চৈতন্যদেবের হৃদয়ানুভবের প্রকাশ ঘটে এখান থেকেই। তাই তৎকালীন নবদ্বীপের নগর ভ্রমণে বেরিয়ে চৈতন্যদেব প্রথমেই গেলেন তন্তুবায়ের কাছে। তার কাছ থেকে বস্ত্র নিয়ে দাম দিতে না পারলেও তন্তুবায় চৈতন্যদেবকে বলেন—

'' 'বস্ত্র লৈয়া পর' তুমি পরম-সন্তোষে।

পাছে তুমি কড়ি মোর দিও সমাবেশে।। ১১২”[১৫০]

বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনাটি যেমন আমাদের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক চিত্রটি চেনাতে সহায়তা করে, ঠিক তেমনি পাশাপাশি তন্তুবায়ের মহানুভবতার দিকটিও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এরপর, চৈতন্যদেব গোয়ালাদের গোপ সমাজে গিয়ে উপনীত হন। তাদের কাছে চৈতন্যদেব 'দধি, দুগ্ধের' আবদার করলে গোপগণেরা তাঁকে যেভাবে আপ্যায়ন করেন— তা আন্তরিকতায় পূর্ণ। আর, একারণেই বৃন্দাবন দাস জানিয়েছেন —

''দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর, সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সর্ব্ব গোপ দেয় আনি।। ১২১”[১৫১]

একইভাবে চৈতন্যদেব গন্ধবণিক সমাজে গিয়ে দিব্য-গন্ধ যেমন পরম আন্তরিকতার সঙ্গে সংগ্রহ করেন, ঠিক তেমনি মালাকরের কাছ থেকেও সুন্দর মালা পরিগ্রহ করেন। আবার তাম্বূলীর ঘরে গিয়ে পরম স্নেহের সঙ্গে 'দিব্য-চূণ-কপূরাদি' সহকারে তৈরী করা পানও ভক্ষণ করেন। এভাবে চৈতন্যদেব সমস্ত শিষ্যবৃন্দ সহকারে নবদ্বীপে যে নগর ভ্রমণ করেন, তা থেকে তৎকালীন সমাজের একটি বাস্তব চিত্র পরিস্ফুট হয়। বৃন্দাবন দাস প্রসঙ্গতই জানিয়েছেন —

''মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপ পুরী।
একো জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি।। ১৪৩”[১৫২]

অর্থাৎ, নবদ্বীপ যেহেতু ছিল তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র তাই এখানে একই সঙ্গে বহু জাতের বহু মানুষ বসবাস করতেন। তবে, প্রত্যেক জাতিই নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল। চৈতন্যদেবকে প্রত্যেক জাতির বিনম্র আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে যেমন সমাজের উচ্চ ব্রাহ্মণ্য জাতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে তেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মানও প্রদর্শিত হয়েছে। আবার লক্ষণীয়, প্রত্যেক জাতির সরল আতিথ্যপরায়ণতাও। চৈতন্যদেবের প্রতি প্রত্যেক জাতির মানুষ যে মহানুভবতা ও আন্তরিকতা দেখিয়েছে তা তৎকালীন সমাজে উচ্চ-নীচ ভাবনাযুক্ত মানুষের মধ্যে সম্মিলন ঘটানোর চিত্রটিকেই পরিস্ফুট করে। আবার কড়ি অর্থাৎ টাকা দিতে না পারলেও চৈতন্যদেবকে জিনিস দেওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের সততা-সরলতা-বিশ্বাসময় হৃদয়েরই প্রকাশ পেয়েছে।

এরপর চৈতন্যদেব সর্ব্বজ্ঞের কাছে গিয়ে নিজের পূর্বজন্ম বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন। সর্ব্বজ্ঞ কিন্তু তখন চৈতন্যদেবের মধ্যে নিজের উপাসক বালগোপালের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। সেই সঙ্গে তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভিত চতুর্ভুজ রূপ শ্রীকৃষ্ণকে যেমন প্রত্যক্ষ করেন তেমনি শ্রীকৃষ্ণের দিগম্বর দ্বিভুজরূপও প্রত্যক্ষ করেন। আবার, পাশাপাশি চৈতন্যদেবের মধ্যে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর রূপ যেমন প্রত্যক্ষ করেন তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বরূপে যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু তবু সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্যদেবকে ঠিক বুঝতে পারেন না। তাই মনে মনে সর্ব্বজ্ঞ

ভাবেন —

''চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।

হেন বুঝি 'এ ব্রাহ্মণ মহামন্ত্রবিত।। ১৭৩

অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে।

পরীক্ষিতে আমারে বা ছলে' বিপ্ররূপে।। ১৭৪''[১৫৩]

এরপর চৈতন্যদেব খোলাবেচা শ্রীধরের গৃহে গমন করেন। আগের থেকেই চৈতন্যদেব শ্রীধরকে স্নেহ করতেন। শ্রীধর চৈতন্যদেবকে দেখতে পেয়ে বিনয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তার সঙ্গে ঔদ্ধত্যের ভাব প্রকাশ করবার মধ্য দিয়ে কৌতুক করেন এই বলে যে—

''প্রভু বোলে 'শ্রীধর! তুমি যে অনুক্ষণ।

'হরি হরি' বোল, তবে দুঃখ কি কারণ? ১৮৩

লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।

অন্ন-বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি?' ১৮৫''[১৫৪]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব শ্রীধরকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি তো সর্বদা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে হরিনাম কীর্ত্তন কর, তাও তোমার এতো দুঃখ দৈন্য-কেন? আবার, তুমি সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর স্বামী নারায়ণের ভজনা কর, তবু তোমার অন্নবস্ত্রের দুঃখ কেন? চৈতন্যদেবের মুখে এই কথা শুনে শ্রীধর প্রত্যুত্তরে বলেন — আমার অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ কোথায়? আমি তো উপবাসী থাকি না। আবার, ছোট হোক, কিংবা বড় হোক, আমি তো বিনা বস্ত্রে নেই, কাপড় পরিধান করেই থাকি। কিন্তু শ্রীধর যতই বলুক না কেন সুখে আছে, তার শত ছিদ্র কাপড় এবং খড়ের ছাউনিহীন ঘর দেখে চৈতন্যদেব তাঁকে বলেন —

''দেখ এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।

কে না ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া।। ১৮৭''[১৫৫]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব শ্রীধরকে কৌতুকময়তার সঙ্গে পরিহাস করে বলেন, এই নবদ্বীপে যারা চণ্ডীর কিংবা বিষহরির পূজো করে তাদের কারোরই অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই। তারা সকলেই সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করে। চরম বৈভবের মধ্য দিয়ে তারা জীবনের ভোগের বাসনাকে পরিতৃপ্ত করে। সুতরাং তুমিও লক্ষ্মীকান্তের উপাসনা ছেড়ে চণ্ডী কিংবা বিষহরির পূজা কর। তাহলে তোমারও দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত হবে। কিন্তু শ্রীধর চৈতন্যদেবকে যা প্রত্যুত্তর করেছে, তা যথার্থই এক পরম বৈষ্ণবের উক্তি —

''রত্নাঘরে থাকে রাজা, দিব্য খায় পরে।

পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে।। ১৮৯

কাল পুন সভার সমান হই যায়।

সভে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায়।। ১৯০''[১৫৬]

শ্রীধরের এই উক্তির মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন দাস কয়েকটি বৈষ্ণবীয় শিক্ষা পাঠকবর্গকে দিতে চেয়েছেন। যেমন— প্রথমত; নিজ নিজ কর্মফল অনুসারেই কেউ ধনী এবং কেউ দরিদ্র হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত; যে দ্রব্য যার কর্মফলের অনুরূপ নয়, শত চেষ্টার দ্বারাও সেই ব্যক্তি সেই বস্তু পেতে পারে না। সুতরাং, আমরা যেটুকু পাই, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত; যে যতই বিষয় বৈভবের দ্বারা ভোগের মধ্যে লিপ্ত থাকুক না কেন সময় শেষ হলে সকলকেই চলে যেতে হবে অর্থাৎ মৃত্যু অবশ্যই হবে। চতুর্থত; শ্রীধরের মত যারা ভগবৎ উপাসনায় নিয়ত তারা কখনোই কোনো প্রলোভনে বিচলিত হয় না। কিন্তু পাশাপাশি তৎকালীন বঙ্গসমাজে যে ইহলোকিক ইচ্ছাপূরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে চণ্ডী এবং মনসার পূজা বহুল প্রচলিত ছিল তাও কৌশলে জানিয়েছেন কবি বৃন্দাবন দাস। তবে, ইহলৌকিক এবং পারমার্থিক ঈশ্বর উপাসনার যে পার্থক্য কবি বৃন্দাবন দাস এখানে মুন্সিয়ানার সঙ্গে দেখিয়েছেন তা সত্যিই অনুপম হয়ে উঠেছে।

এই তাত্ত্বিক আলোচনার পর চৈতন্যদেব শ্রীধরের কাছে স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীধর চৈতন্যদেবের এই স্বীয় তত্ত্ব না বুঝতে পেরে হেঁয়ালী ভেবে বলেন —

"বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে।
তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাঢ়য়ে।। ২১২"[১৫৭]

এরপর, চৈতন্যদেব বাড়ি এসে বার বার নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। শচীমাতা তাই কখনো যেমন ত্রিভুবনমোহনের মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করেন, তেমনি কখনো নৃত্য-গীত সমারোহে মহা-রামলীলাও শ্রবণ করেছেন। আবার কখনো যেমন বাড়িতে জ্যোতি দর্শন করেন, তেমনি সাক্ষাৎ দেব-দেবীও প্রত্যক্ষ করেন। শচীমাতা এভাবে চৈতন্যের বৈভব দর্শন করলেও তাঁর স্বরূপ-তত্ত্ব কিন্তু বুঝতে পারেন নি। চৈতন্যদেবও কিন্তু নিজের অন্তঃস্থিত তত্ত্ব সকলের কাছে প্রকাশ না করে শিষ্যগণ সহকারে গঙ্গাতীরে বিদ্যা বিলাসের মধ্য দিয়ে অধ্যাপনা কার্যেই নিযুক্ত থাকেন। হঠাৎ একদিন এমন সময় শ্রীধরের সঙ্গে পুনরায় চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হলে, তিনি তাঁকে বলেন —

"কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য্যে গোঙাও?
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পঢ়াও? ২৫০
পঢ়ে লোক কেনে? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে? ২৫১"[১৫৮]

অর্থাৎ, অধ্যয়নের বাস্তব সার্থকতাই হল কৃষ্ণভক্তির অবগতিতে। অধ্যয়ন করে হয়তো পণ্ডিত হওয়া যায়, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি লাভ করা যায় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন ধারণও করা যায়, কিন্তু মায়াময় এই জগৎ থেকে অব্যাহতির জন্য কৃষ্ণভক্তির প্রয়োজন। তাই বিদ্যার দ্বারা আমরা যে লব্ধ জ্ঞান অর্জন করি, তা পারমার্থিক চিন্তায় প্রয়োগ করাই যথার্থ বলে মনে করে থাকেন বৈষ্ণবেরা। শ্রীধর যেহেতু একজন

নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন তাই তাঁর মুখে বিদ্যা-শিক্ষার উদ্দেশ্যের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে কবি বৃন্দাবন দাস খুবই মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তবু বৃন্দাবন দাস বলেন, তখনও পর্যন্ত চৈতন্যদেবের মধ্যে বাহ্যিক দিক থেকে ভক্তিমার্গের বিকাশ ঘটে নি। বরং তিনি বহু শিষ্যের সমন্বয়ে প্রতিদিন অধ্যাপনা কার্যের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় নিজের অহংবোধকেই প্রতিষ্ঠা করতেন এবং প্রতিদিনই তাঁর বিদ্যার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

আদি খণ্ডের নবম অধ্যায়েও বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের 'বিদ্যাবিলাস'-এর বর্ণনা দিয়েই সূচনা করেছেন। তৎকালীন নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে অধ্যাপনা কার্যে চৈতন্যদেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজয়ী। তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রভূত প্রভাব যখন নবদ্বীপে বহু প্রশংসিত তখন —

''হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।
আইল পরম-অহঙ্কার যুক্ত হই।। ১৯''[১৫৯]

এই অতি প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সরস্বতীর আশির্বাদ ধন্য। জগৎ সংসারকে জানবার জন্য তিনি বহু স্থান ভ্রমণ করেন এবং তর্কযুদ্ধে সকল পণ্ডিতকে পরাজিত করে বহু ধনসম্পত্তি এবং হাতি-ঘোড়া লাভ করেন। অবশেষে নবদ্বীপে খ্যাতনামা পণ্ডিত হিসাবে পরিচিত চৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ করে, তাঁকে পরাজিত করবার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে উপনীত হন। নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে এবং প্রতি পণ্ডিত সভায় এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সম্পর্কে চর্চা হতে থাকে। পড়ুয়া শিষ্যদের মাধ্যমে এই অহংকারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কথা গিয়ে পৌঁছায় চৈতন্যদেবের কাছে। চৈতন্যদেব তাঁর শিষ্যদের কাছে তখন তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন। তিনি শিষ্যদের বলেন—

''শুন ভাইসব! এই কহি তত্ত্ব কথা।
অহংকার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা।। ৪৩
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার।। ৪৪''[১৬০]

চৈতন্যদেব শিষ্যদের কাছে ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্র থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখান যে অহংকারীর পতন অবশ্যই হয়ে থাকে। গাছের প্রকাশ যেমন ফলের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে, তেমনি প্রকৃতই যে গুণের অধিকারী তার প্রকাশও স্বভাবের নম্রতায়, বিনয়ের মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। আর এই কারণেই চৈতন্যদেব সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গাতীরে গিয়ে যখন 'শাস্ত্র-কথা' এবং 'ধর্ম্ম-কথা' আলোচনায় নিয়োজিত হন, তখন মনে মনে চিন্তা করেন কীভাবে এবং কোন স্থলে দিগ্বিজয়ীর অহংকারকে ধূলিসাৎ করবেন। আসলে, চৈতন্যদেব দিগ্বিজয়ীকে প্রকৃত পাণ্ডিত্যের অধিকারী বলেই জানতেন; তাই বহু লোকের সামনে সম্মানিত ব্যক্তির অসম্মান করা সঙ্গত নয় মনে করেন। কিন্তু এরকমই একদিন গঙ্গাতীরে চৈতন্যদেব তাঁর পড়ুয়া বহু শিষ্যের সঙ্গে যখন শাস্ত্রের তত্ত্বকথা আলোচনায় মগ্ন, তখন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সেখানে এসে উপনীত

হন। তাঁকে বসবার জন্য চৈতন্যদেব অনুরোধ করলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চৈতন্যের ভুবনমোহন রূপে মুগ্ধ হন এবং কিসের এক ভয় মিশ্রিত সঙ্কোচ অনুভব করেন। এরপর চৈতন্যদেব তাঁকে বহুত প্রশংসা করে বলেন —

''গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিঞা সভার হউ পাপ-বিমোচন।। ৭৯''[১৬১]

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তখন অবিশ্রান্তভাবে খুব গর্বের সঙ্গে গঙ্গার মাহাত্ম বর্ণনা করতে থাকেন। তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ বাক্যোচ্চারণ শুনলে মনে হয় যেন বহু মেঘ একসঙ্গে গর্জন করছে। একই বর্ণনা তিনি কত ভাবে যে ভাষা- বৈচিত্র্যে ব্যক্ত করেন তার সীমা নেই। এছাড়া, সবচেয়ে কঠিন কঠিন শব্দ এবং অলংকার তিনি ব্যবহার করেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের এই কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা শুনে চৈতন্যদেবের শিষ্যগণও বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান। কিন্তু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের এই কবিত্বের বর্ণনা শুনে চৈতন্যদেব তাঁকে বলেন—

''তোমার যে শব্দের গ্রস্থন-অভিপ্রায়।
তুমি বিনে বুঝাইলে বুঝন না যায়।। ৯১
এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।
যে শব্দে যে বোল তুমি সে-ই সুপ্রমাণ।। ৯২''[১৬২]

চৈতন্যদেবের এই কথা শ্রবণ করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাঁর কাব্যের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যেই ব্যাখ্যা শুরু করেন, তখনই চৈতন্যদেব তাঁর ব্যাখ্যার সর্বত্রই ব্যাকরণগত দোষ দেখান। চৈতন্যদেব দিগ্বিজয়ীকে বললেন— 'তুমি যে সকল শব্দ ও অলঙ্কার তোমার শ্লোকে ব্যবহার করেছো, শাস্ত্রানুসারে তা অশুদ্ধ।' দিগ্বিজয়ী চৈতন্যদেবের একথার পরিপ্রেক্ষিতে কি বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না। কিছু ব্যাখ্যা সহ যুক্তি দেবার চেষ্টা তিনি করলেও, তাতে বিশুদ্ধতা প্রদর্শিত হয় না। এভাবে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চৈতন্যদেবের কাছে পরাজিত হলে এবং শিষ্যগণ সকলেই উপহাসের হাসিতে নিমগ্ন হন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁর শিষ্যদের বলেন—

''সভারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র প্রতি বলিলেন মধুর বচন।। ১১০''[১৬৩]

চৈতন্যদেবের এরূপ স্নিগ্ধ ব্যবহারে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দুঃখ দূরীভূত হয়। কিন্তু তিনি মনে মনে লজ্জিত হয়ে ভাবতে থাকেন, সরস্বতীর আশীর্বাদ ধন্য হয়েও কেন তিনি হেরে গেলেন? লজ্জিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যখন সরস্বতীর ধ্যান মন্ত্র জপ করে দুঃখে শয়ন করেন, তখন দেবী সরস্বতী তাঁকে স্বপ্নাদেশে দেখা দেন এবং চৈতন্যদেবের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেবই যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, স্বয়ং ভগবান — এই তত্ত্বকথা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জানিয়ে দেবী সরস্বতী তাঁকে বলেন —

''যাহ শীঘ্র বিপ্র! তুমি উহান চরণে।

দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে।। ১৪৭”[১৬৪]

দেবী সরস্বতীর কাছে এই স্বরূপ-তত্ত্ব কথা শ্রবণ করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরদিন ঊষাকালে চৈতন্যদেবের কাছে এসে বলেন—

“প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা।
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা।। ১৫১”[১৬৫]

চৈতন্যদেব এরপর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পণ্ডিত তখন চৈতন্যদেবকে তাঁর স্বরূপ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন যে, তিনিই নারায়ণ। কলিযুগে স্বয়ং ভগবানই চৈতন্যদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন — একথা তিনি দেবী সরস্বতীর কাছে নিজে শুনেছেন। দিগ্বিজয়ীর মুখে একথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব বিদ্যাশিক্ষার আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন তাঁর কাছে। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য অহংকার প্রকাশ করা নয়, কিংবা দিগ্বিজয়ী হওয়া নয়, বিদ্যাশিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হল — ঈশ্বর-চিন্তায় নিজেকে নিয়োজিত করা। কারণ — অর্থ-কীর্তি-যশ-ধন-সম্পত্তি-মান-সম্মান সবই ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার মাত্র। একমাত্র ঈশ্বর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করাই হল জীবের পক্ষে একমাত্র কাম্য। তাই চৈতন্যদেব দিগ্বিজয়ীকে পরামর্শ দেন—

“এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র! সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল।। ১৭৬” [১৬৬]

চৈতন্যদেবের কাছে এরূপ আজ্ঞা পেয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তখন তাঁর সমস্ত অহংকার, দম্ভ , খ্যাতি-যশ-ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ঈশ্বর চিন্তায় নিয়োজিত হন। আসলে, শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা যাঁদের একমাত্র কাম্য তাঁদের কাছে ইহলৌকিক সুখের কোনো মূল্য নেই। আর তাই বৃন্দাবন দাস পাঠক বর্গকে জানাতে বাধ্য হয়েছেন যে —

“কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ি দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র।। ১৮৮”[১৬৭]

এদিকে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করায় চৈতন্যদেবের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমগ্র নবদ্বীপ-সমাজে আরও বিস্তার লাভ করে। চৈতন্যের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কীর্তি সকল নবদ্বীপ সমাজে প্রচারিত হয়। তবে, এই অধ্যায়ে লক্ষণীয় বিষয় যে চৈতন্যদেবের নিজেরও ভাবে পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিদ্যাবিলাসের কারণে যে চৈতন্যদেব অনেকটাই ছিলেন গর্বী, অহংকারী, তিনিই আবার এই দিগ্বিজয়ীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করবার সময় শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজেকে সমর্পণের কথা বলেন। শুধু তাই নয়, বিদ্যাশিক্ষার আসল উদ্দেশ্য কি? তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চৈতন্যদেব দিগ্বিজয়ীকে যে তত্ত্বের কথা বলেন, তাতে মনে হয় চৈতন্যদেবের নিজেরও যেন ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ অর্জিত বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা তিনি নিজেও যে জ্ঞানমার্গ থেকে ভক্তিমার্গে নিয়োজিত হয়ে পড়েছেন তা যেন এই সময় থেকেই

পরিস্ফুট হয় পাঠকবর্গের কাছে। আবার, পাশাপাশি চৈতন্যদেবের যে বিনয়ী মনোভাবের পরিচয় আমরা এই অধ্যায়ে পেয়ে থাকি, তা তাঁর দার্শনিক ঋদ্ধতার পরিচায়ক বলেই মনে হয়।

আদি খণ্ডের দশম অধ্যায়েও চৈতন্যদেবের চারিত্রিক কিছু গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য পাঠক-বর্গের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই অধ্যায়ে লক্ষণীয় বিষয় চৈতন্যদেবের অতিথি-পরায়ণতা। চৈতন্যদেব এই সময়েও তৎকালীন নবদ্বীপ সমাজে পণ্ডিত অধ্যাপক হিসাবেই পরিচিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন কবি বৃন্দাবন দাস। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এতই প্রসারিত হয়েছিল যে সকলেই তাঁকে 'অধ্যাপক-শিরোমণি' বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আবার, পাশাপাশি চৈতন্যদেব ছিলেন 'পরমব্যয়ী'। অর্থাৎ মুক্ত হস্তে তিনি গরীব-দুঃখীদের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস দান করতেন। বৃন্দাবন দাস তাই বলেছেন —

''দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন-বস্ত্র-কপর্দ্দক দেন গৌর-হরি।। ১২''[১৬৮]

প্রতিদিনই তাই চৈতন্যদেবের বাড়িতে অতিথির সমাগম হত। এই রকমই দশ-বিশজন সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের বাড়িতে প্রতিদিন সেবা গ্রহণ করতেন। লক্ষণীয়, ঘরে কিছু নেই — শচীদেবী এই চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে যেন রন্ধনের সমস্ত উপকরণ যোগার হয়ে যেত। এরপর লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী অতিথিদেব জন্যে রন্ধন করলে চৈতন্যদেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যত্ন সহকারে অতিথিদের যথোচিত সমাদরে খাওয়াতেন। আসলে, চৈতন্যদেবের এই অতিথি সেবার মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের উদারতা এবং মহানুভবতার দিকটি আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়। একজন সত্যিকারের মহামানব যিনি, তিনি ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। আর তাই চৈতন্যদেব প্রতিদিন কার কি অভাব আছে, কার কি প্রয়োজন, কে কেমন আছেন — এসব অতিথিদের কাছ থেকে জেনে নিতেন। চৈতন্যদেব এই অতিথিসেবার মধ্য দিয়ে আসলে কবি আমাদের জানিয়েছেন যে —

''গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম।। ২১
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশু পক্ষী হইতেও অধম বলি তারে।। ২২''[১৬৯]

এরপর, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পরিচয় দান করেছেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী প্রতিদিন অন্য কারো সহায়তা ছাড়াই, একাকিনী রন্ধন করলেও তাঁর চিত্তে ছিল অত্যন্ত আনন্দ। অর্থাৎ প্রতিদিনই প্রীতির সঙ্গেই অতিথিদের জন্য রান্না করতেন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। শুধু তাই নয়, সকাল থেকেই সমস্ত গৃহকর্ম্ম তিনি নিজের হাতেই করতেন। আবার এরই মাঝে তিনি 'দেবগৃহে'-র পূজা-অর্চনার কাজও করতেন। সেই সঙ্গে তুলসীদেবীর সেবাকার্য করতেন এবং শচীমাতারও সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। আসলে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর এই চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালীন পল্লীবাংলার গৃহবধূর

রূপটিকেই দেখতে পাই।

এরপর, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের পূর্ববঙ্গ দেশ ভ্রমণের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেন—

''তবে কথোদিনে ইচ্ছাময় ভগবান।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান।। ৪৮''[১৭০]

আর এই কারণে চৈতন্যদেব শচীদেবীর কাছ থেকে আজ্ঞা গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গ দেশের উদ্দেশ্যে শিষ্যগণ সহ বেরিয়ে পড়েন। পথে যাবার সময় চৈতন্যদেবের ভুবনমোহন রূপে অনেকেই মুগ্ধ হয়ে পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন। এভাবে, কিছুদিন পূর্ব বঙ্গদেশের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে অবশেষে চৈতন্যদেব পদ্মানদীর তীরে এসে উপনীত হন। পদ্মানদীর তরঙ্গশোভা দেখে মোহিত হন চৈতন্যদেব। আবার, পদ্মানদীর শোভা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বৃন্দাবন দাসও বলেছেন —

''পদ্মাবতী-নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর।। ৬১''[১৭১]

আর এই কারণেই চৈতন্যদেব পদ্মানদীর তীরে কিছুদিন শিষ্যগণ সহ থাকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব পদ্মাতীরে অর্থাৎ পূর্বঙ্গদেশে এসেছেন শুনে সকলেই তাঁকে দেখতে আসেন—

'' 'নিমাঞি-পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।
আসিয়া আছেন' সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি।। ৬৭''[১৭২]

অর্থাৎ চৈতন্যদেবের পণ্ডিত-অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি যে শুধুমাত্র নবদ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সকল বঙ্গদেশেই যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কীর্তি ছড়িয়ে পড়েছিল তা বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনা থেকে অনুভব করা যায়। তাই চৈতন্যদেবের কাছে বিদ্যারসের আস্বাদন পেতে পূর্ববঙ্গের পণ্ডিতগণ এসে মিলিত হলেন। সকলেই নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে করেন, কারণ চৈতন্যদেবের মত যশস্বী পণ্ডিত অধ্যাপক আজ তাঁদের সামনে উপনীত। আর তাই সকলেই চৈতন্যদেবকে বিদ্যাদানের জন্য অনুরোধ করে বলেন—

''উদ্দেশে আমরা সভে তোমার টিপ্পনী।
লই পঢ়ি পঢ়াই শুনহ দ্বিজমণি! ৭৭''[১৭৩]

অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গের সকল পণ্ডিতেরাই চৈতন্যদেবকে বলেন, 'আমরা তোমারদেওয়া ব্যাকরণের টীকা-টিপ্পনী সকলেই নিজেরা গ্রহণ করি, পড়ি এবং আমাদের ছাত্রদেরও পড়িয়ে থাকি।' সুতরাং, সহজেই বোঝা যায় যে, চৈতন্যদেব ব্যাকরণের টীকা-টিপ্পনী রচনা করেছিলেন। বৃন্দাবন দাস ইতিপূর্বেও আদি খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলেছেন যে— 'আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।' কিন্তু, চৈতন্যদেবের এরূপ কোন ব্যাকরণের টীকা গ্রন্থ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। যাই হোক, পূর্ববঙ্গের সকল পণ্ডিতগণই চৈতন্যদেবের কাছে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আর এই কারণেই চৈতন্যদেব বেশ কিছুদিন পূর্ববঙ্গে অবস্থান করেন।

এরপর, বৃন্দাবন দাস এই অধ্যায়ের কয়েকটি পয়ার জুড়ে 'নকল অবতারের' কথা বলেন। পরমার্থবিমুখ, স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়সুখ-সর্বস্ব, কিছু পাপিষ্ঠগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নকল অবতার সেজে সরল বুদ্ধি লোকদের প্রতারিত করত। এছাড়া এই নকল অবতারেরা নিজেদের স্বয়ং ভগবান বলেও প্রচার করতেন। এরকম এক পাপিষ্ঠ নকল অবতার ছিলেন রাঢ়বঙ্গেও। বৃন্দাবন দাস এই পাপিষ্ঠ নকল-অবতারদের পরিচয় দান করে একথাই বলতে চান যে —

''দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ — শ্রীচৈতন্যহরি।। (৮৮)''[১৭৪]

বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনা দেখে মনে হয় যে, তৎকালীন বঙ্গদেশে অনেকেই নিজেদেরকে নকল অবতারকল্প বলে প্রচার করেন। কিন্তু কবি পাঠকবর্গকে সজাগ করে দিয়ে বলেছেন যে, এইসব পাপিষ্ঠ কখনোই ভগবানের অবতার নয়। তাদের আসল উদ্দেশ্য হল নকল অবতারকল্প সেজে নিজ স্বার্থসিদ্ধিকে চরিতার্থ করা। আসল অবতারকল্প হলেন চৈতন্যদেব। তাই বিপথে না গিয়ে চৈতন্যদেবের ভজনা করবারই উপদেশ দেন বৃন্দাবন দাস পাঠকবর্গকে।

এরকম ভাবে চৈতন্যদেব যখন শিষ্যগণ সহ পূর্ববঙ্গে বিদ্যারসের আস্বাদনে বিভোর হয়ে দিনযাপন করছিলেন, তখন নবদ্বীপে চৈতন্যপত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী স্বামী বিরহে দুঃখিতা হয়ে অন্তরে বেদনা বহন করছিলেন। চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গে যাবার পর থেকেই তাঁর বিরহ-যন্ত্রণার শুরু। বাইরে কাউকে কিছু প্রকাশ না করলেও অন্তরে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী চৈতন্য চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তাই চৈতন্যদেবের বিরহে একপ্রকার স্নানাহার বন্ধই করে দিয়েছিলেন তিনি। প্রতিদিনই বেদনার অশ্রুজলে বিনিদ্র অবস্থায় লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী রাত্রিযাপন করতেন। যেহেতু তিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীদেবী তাই এভাবে চৈতন্যদেবের বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অতি সংগোপনে 'প্রতিকৃতি দেহ' রেখে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনায় হয়তো বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের স্পর্শ রয়েছে, কিন্তু আমাদের মনে হয় এই তত্ত্বকথা ছাড়াও হয়তো বাহ্যিক কোনো অসুস্থতার কারণে হঠাৎই লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী চৈতন্যদেবের বিরহে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হন। এরূপে আকস্মিকভাবে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধানের কারণে শচীমাতার যে দুঃখকথা তা বর্ণনা করতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

''সে সকল দুঃখরস না পারি বর্ণিতে।
অতএব কিছু কহিলাঙ সূত্রমতে।। ১০৬''[১৭৫]

সত্যিই, এই আকস্মিক লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর প্রয়াণের ঘটনাকে আমরা পাঠকবর্গও সহজে মেনে নিতে পারি না। কিন্তু মৃত্যু যে প্রত্যেক জীবনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তা যেন আরো একবার আমাদের চেতনাকে নাড়িয়ে দেয় লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর এই অন্তর্ধানের ঘটনার মধ্য দিয়ে।

এদিকে চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গদেশে বিদ্যারসের আস্বাদনে কিছুদিন বিভোর থেকে শিষ্যগণ সহ

পরম সন্তোষে নবদ্বীপে ফিরে আসেন। চৈতন্যদেব নিজ গৃহে ফিরে আসার সময় পূর্ববঙ্গের সকলেই তাঁকে নিজসাধ্য মত উপঢৌকন দেন। চৈতন্যদেবও সেগুলি সাদরে গ্রহণ করেন। আবার তাঁর কিছু পূর্ববঙ্গের শিষ্য নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের সঙ্গে চলে আসেন। এরপর কবি বৃন্দাবন দাস বলেন —

''হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সারগ্রাহী, নাম — মিশ্র তপন।। ১১৫''[১৭৬]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপে চলে আসার উদ্যোগ করছিলেন, সেই সময় তপন মিশ্র নামে এক তাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সাধ্য বস্তু কি এবং তার সাধনাই বা কি অর্থাৎ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাই তপন মিশ্র দিনরাত্রি কেবল নিজের ইষ্টমন্ত্রই জপ করতেন। আর এই সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব না জানার জন্য তার মনে বেদনাও ছিল। কিন্তু এরূপ চিন্তা-ভাবনা করতে করতে তপন মিশ্র একদিন রাত্রিশেষে 'এক দেব মূর্ত্তিবান' স্বপ্নে দেখতে পেলেন। মনে হয়, এখানে এক মূর্ত্তিমান দেবতা বলতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবকেই বোঝাতে চেয়েছেন। আর চৈতন্যদেব যেহেতু তখনও কৃষ্ণের অবতার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন নি, তাই ব্রাহ্মণকে 'গুপ্ত চরিত্র' বর্ণনা করেন। এই মূর্ত দেবতাই তপন মিশ্রকে বলেন —

''নিমাঞি পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিহোঁ কহিবেন তোমা' সাধ্য-সাধন।। ১২১
মনুষ্য নহেন তিহোঁ — নর-নারায়ণ।
নর রূপে লীলা তাঁর জগত কারণ।। ১২২''[১৭৭]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের স্বরূপ তত্ত্ব প্রকাশিত হয় তপন মিশ্রের কাছে। চৈতন্যদেব যে আসলে জীব-তত্ত্ব নয়, তিনি যে পরম-তত্ত্ব, নর-নারায়ণ, জগতে জীবের কল্যাণের জন্যই যে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, এই তত্ত্বই প্রকাশ করেন সেই মূর্তিমান দেবতা তপন মিশ্রের কাছে। তপন মিশ্র স্বপ্নের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের এই স্বরূপ তত্ত্ব দর্শন করে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে থাকেন। এরপর তপন মিশ্র নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েই সময় নষ্ট না করে, চৈতন্যদেবের কাছে আসেন এবং চৈতন্যদেবকে সকল শিষ্যগণের সামনেই প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর তপন মিশ্র চৈতন্যদেবের কাছে এই বিষয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাধ্য বস্তু ও তার সাধনা কি জানতে চান। চৈতন্যদেব তপন মিশ্রকে বলেন —

''কলি-যুগ-ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ।। ১৩৪''[১৭৮]

অর্থাৎ, কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্তনের দ্বারাই সাধ্যতত্ত্ব ও সাধন তত্ত্ব পাওয়া যায়। এছাড়া তপন মিশ্রকে চৈতন্যদেব আরও বলেন যে, ষোলনাম-বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতেই যখন চিত্তের

মলিনতা দূরীভূত হয়ে প্রেমাঙ্কুর জন্মাবে, তখনই সাধ্য বস্তু ও সাধন তত্ত্ব জানতে পারবে। তপন মিশ্র চৈতন্যদেবের এই মুখনিঃসৃত তত্ত্বকথা শুনে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে নবদ্বীপে আসবার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁকে বারাণসী যাবার আদেশ দিয়ে বলেন, সেখানেই তিনি মিলিত হবেন তপন মিশ্রের সঙ্গে। এখানে লক্ষণীয় বিষয়, চৈতন্যদেব যে নাম-সংকীর্তন প্রচারের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার প্রথম সূচনা কিন্তু হয় পূর্ববঙ্গেই। কারণ ইতিপূর্বে নবদ্বীপে চৈতন্যদেব কিন্তু কখনোই নাম-সংকীর্ত্তনের উপদেশ দেন নি। আবার, তপন মিশ্রকে চৈতন্যদেব যে বারাণসী যাবার উপদেশ দিলেন এবং সেখানে মিলিত হবার আশ্বাস দিলেন — এ থেকে বোঝা যায় চৈতন্যদেব যে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তা যেন তাঁর পূর্বপরিকল্পিতই ছিল।

এরকম ভাবে, চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করে শিষ্যগণ সহ নবদ্বীপে ফিরে এলেন। নবদ্বীপে ফিরে এসে চৈতন্যদেব প্রথমেই মাতা শচীদেবীকে প্রণাম করেন এবং তারপর শিষ্যগণ সহকারে গঙ্গায় স্নান করতে যান। এদিকে পুত্রবধূর বিয়োগে দুঃখিতা শচীদেবী রান্না করলেন। গঙ্গায় স্নান সেরে চৈতন্যদেব নিত্য কর্মের পর ভোজনে বসেন। আবার, ভোজন সারা সমাপ্ত হলে চৈতন্যদেব আত্মীয় পরিজনদের সামনে হাস্য-পরিহাসময় কৌতুকে পূর্ববঙ্গে অতিবাহিত সময়ের গল্প করেন। এমনকি, পূর্ববঙ্গের উচ্চারিত বাক্য নকল করে ব্যঙ্গও করেন। এরূপে কিছু সময় অতিবাহিত হলে আত্মীয়বর্গ সকলেই নিজ গৃহে ফিরে যান। কেউ দুঃখের কারণে চৈতন্যদেবের কাছে পত্নী বিয়োগের খবর দিতে পারেন না। আবার, শচীদেবীও নিজ ঘরে পুত্রবধূর বিরহে বেদনাশ্রু নির্গত করে থাকেন; কিন্তু চৈতন্যদেবের সামনে আসতে পারেন না। চৈতন্যদেব তখন নিজেই মার কাছে গিয়ে তাঁর বিষাদের কি কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শচীমাতা কিন্তু নিজমুখে কিছুই চৈতন্যদেবের কাছে প্রকাশ করতে পারেন না। তখন চৈতন্যদেব লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অমঙ্গলের আশঙ্কা করলে, উপস্থিত আত্মীয়বর্গরা বলেন—

"তবে সভে কহিলেন, 'শুনহ পণ্ডিত।
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত।।' ১৭২"[১৮৯]

লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর এ অন্তর্ধানের খবর পেয়ে চৈতন্যদেব কিছুক্ষণ মাথা হেট করে চুপ করে বসে থাকেন। কিন্তু তারপর লৌকিক জগতের লোকের ন্যায় দুঃখ প্রকাশ করেন। আমাদের মনে হয়, চৈতন্যদেব সচ্চিদানন্দ ভগবান হলেও, তিনি যেহেতু নরলীলার জন্য প্রকটিত হয়েছেন, অর্থাৎ একজন মানুষ, তাই তাঁর প্রিয়া বিয়োগ বেদনাশ্রু প্রকটিত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু চৈতন্যদেব যেহেতু একজন প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ, তাত্ত্বিক, অধ্যাপক ছিলেন, তাই পরক্ষণেই নিজের চিত্তে ধৈর্য্য ধারণ করে শচীদেবীকে বলেছেন —

"প্রভু বোলে, 'মাতা! দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে, সে ঘুচিব কেমনে।। ১৭৬

এইমত কাল গতি — কেহো কারো নহে।

অতএব সংসার 'অনিত্য' বেদে কহে।। ১৭৭"[১৮০]

অর্থাৎ, যা ঘটবার, তা অবশ্যম্ভাবী ঘটবেই। কর্মফল অনুসারে প্রত্যেককেই একদিন এই মায়াময় জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আসলে, এই মায়াময় জগতে সকলই অনিত্য বস্তু। তাই সংসারী জীব মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্রিয় সুখের কারণে পতি-পত্নী-পুত্রের সম্বন্ধকে সত্য বলে মনে করলেও আসলে কেউই কারো নয়। আর তাই দুঃখ করা অনুচিত বলে শচীদেবীকে জানান চৈতন্যদেব। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের যে দার্শনিকতার পরিচয় আমরা পাই, তা তাঁর মানসিক ঋদ্ধতার পরিচায়ক বলেই মনে করি। অর্জিত বিদ্যার দ্বারা জ্ঞানের দার্শনিকতায় উন্নীত হয়েছিলেন বলেই চৈতন্যদেব এরূপ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দান করতে পেরেছিলেন।

এভাবে, লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর বিরহে কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর চৈতন্যদেব পুনরায় বিদ্যারসে মত্ত হন। তিনি প্রতিদিন জননী শচীদেবীকে প্রণাম করে মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহের চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপনা করতে যেতেন। প্রতিদিন সর্বপ্রথমে অধ্যাপক চৈতন্যদেব চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হতেন এবং তারপর ক্রমে ক্রমে সকল শিষ্যগণ সেখানে এসে মিলিত হত। একদিন কোন এক শিষ্য কপালে তিলক না পরেই চৈতন্যদেবের শিক্ষানিকেতনে প্রবেশ করে। তখন চৈতন্যদেব সেই শিষ্যকে বলেন —

"প্রভু বোলে, কেনে ভাই? কপালে তোমার।

তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার।। ১৯১

তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।

তবে তারে 'শ্মশান-সদৃশ' বেদে বলে।। ১৯১"[১৮১]

অর্থাৎ, শাস্ত্রে পারঙ্গম চৈতন্যদেব বেদানুগত শাস্ত্রের বিধান উল্লেখ করে বলেন যে, প্রত্যেক বিপ্রের কপালেই তিলক থাকা অবশ্য কর্তব্য। আর যিনি এই তিলক ধারণ করেন তিনি পরমতত্ত্ব ভগবানের প্রিয় হন এবং তিনি পুণ্যবান। কিন্তু শিষ্যটি যেহেতু কপালে তিলক ধারণ করে নি, তাই চৈতন্যদেব তাকে বলেন, 'তার মানে তুমি সন্ধ্যা-আহ্নিকও করো নি।' অর্থাৎ তুমি নিত্য কৃত কর্ম থেকে বিরত থেকেছ। তাই পুনর্বার সেই শিষ্যকে চৈতন্যদেব গৃহে ফিরে যাবার উপদেশ দেন এবং তিলক ধারণ করে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে তারপর পড়তে আসতে বলেন। বৃন্দাবন দাসের উল্লিখিত চৈতন্যদেবের এই শিষ্যকে শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি আসলে এক্ষেত্রে স্বধর্মাচরণকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির তার স্বধর্ম পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এই নীতিগত শিক্ষাই হয়তো দার্শনিকতায় ঋদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ চৈতন্যদেব জীবকে বোঝাতে চেয়েছেন।

এরপর কবি চৈতন্যদেবের কৌতুকতার পরিচয় দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গে পরিভ্রমনের সময় চৈতন্যদেব শ্রীহট্টবাসীদের শব্দ ও শব্দের উচ্চারণের যে বিশেষ ভঙ্গি ছিল, তা নকল করে শিষ্যদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপে

মত্ত হতেন। আসলে চৈতন্যদেব শিষ্যদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এভাবে শ্রীহট্টবাসীদের ভাষার অনুকরণ করে এবং তাদের বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করলেও তাঁর পিতা-পিতামহদের আদি জন্মস্থান কিন্তু শ্রীহট্টেই ছিল। আবার লক্ষণীয়, বৃন্দাবন দাস চৈত্যদেবের এই কৌতুক বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর অপর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেন এভাবে—

এইমত চাপল্য করেন সভা'সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র নাহি দেখেন দৃষ্টি-কোণে।। ২০৮
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা-বিদিত সংসারে।। ২০৯"[১৮২]

অর্থাৎ, স্ত্রীলোকের প্রতি যে চৈতন্যদেব গভীর সম্মান প্রদর্শন করতেন বৃন্দাবন দাসের এই উক্তি থেকে তার প্রমাণ মেলে। এমনকি, স্ত্রীলোকের কোন প্রসঙ্গও চৈতন্যদেব শুনতেন না। কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কেউ স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে চৈতন্যদেব অন্য প্রসঙ্গের মাধ্যমে তা ঢেকে দিতেন। আসলে মানব চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব গঠনে এই বিশেষ চরিত্রগত গুণটিও যে বিশেষভাবে সহায়ক ছিল, কবি যেন পাঠকবর্গকে তাই জানিয়েছেন।

এরপর বৃন্দাবন দাস পুনরায় বলেন, এভাবে চৈতন্যদেব মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিদিন আমোদের সঙ্গে অধ্যাপনা করতেন। চৈতন্যদেব পাণ্ডিত্যের এবং অধ্যাপনায় এতই ঋদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁর কাছে একবছর কোন শিষ্য শিক্ষালাভ করলেই পণ্ডিত বলে গণ্য হত। কিন্তু, এদিকে শচীদেবী পুনরায় চৈতন্যদেবের বিয়ের কথা ভাবতে থাকেন। নবদ্বীপের যার সঙ্গে শচীদেবীর দেখা হয় তাকেই তিনি চৈতন্যদেবের বিয়ের কথা বলেন। নবদ্বীপের এক মহা-ভাগ্যবান দয়াশীল ব্যক্তি শ্রীসনাতনের সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস বললেন —

"অকৈতব, পরম-উদার, বিষ্ণুভক্ত।
অতিথিসেবন পর-উপকারে রত।। ২২১
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহা-বংশ-জাত।
পদবী 'রাজপণ্ডিত' সর্ব্বত্র বিখ্যাত।। ২২২"[১৮৩]

এই ব্যক্তিত্ববান 'রাজপণ্ডিত'-এর কন্যা বিষ্ণু-প্রিয়া দেবীকেই শচীদেবীর পছন্দ পুত্রবধূ হিসাবে। শচীদেবী এই কন্যাকে গঙ্গা ঘাটে দেখেছেন মাত্র দু-একবার। সেই সময় বিষ্ণু-প্রিয়া দেবী শচীদেবীকে বিনীতভাবে নমস্কার করলে পুত্রবধূ হিসাবে মনে মনে মনোনীত করেন তখনই তিনি। আর তাই ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিতকে ডেকে আনেন শচীদেবী। কাশীনাথ পণ্ডিতকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলার পর শচীদেবী তাকে চৈতন্যদেবের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে রাজপণ্ডিতের বাড়িতে পাঠান। এরপর রাজপণ্ডিত সনাতন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রস্তাবে রাজি হলে উভয় পরিবারের সম্মতিক্রমে চৈতন্যদেবের বিয়ে স্থির হয় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর

সঙ্গে। লক্ষণীয়, এই ক্ষেত্রেও বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের বিয়ের যে পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন, তা তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। চৈতন্যদেবের বিয়ের কথা শুনে সমগ্র নবদ্বীপবাসী আনন্দে লিপ্ত হন। নবদ্বীপবাসী এক অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি পরম উদার বুদ্ধিমন্ত খান চৈতন্যদেবের বিয়ের ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চান। আবার, মুকুন্দ-সঞ্জয়ও চৈতন্যদেবের বিয়ের ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। আর এভাবে সকলেই আনন্দে লিপ্ত হলে —

"তবে সভে মিলি শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস লগ্ন করিলেন হর্ষ মনে।। ২৫৩"[১৮৪]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, চৈতন্যদেবের অধিবাসের যে বর্ণনা বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন তা কবির সামাজিক অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। মনে হয়, কবি যেন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই সূত্র সন্ধান করেছেন চৈতন্যদেবের এই বিবাহের বর্ণনা দানে। আর তাই কবি বলেন —

"পূর্ণ ঘট, দীপ, ধান্য, দধি, আম্রসার।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য আছয়ে প্রচার।। ২৫৫
সকল একত্রে আনি করি সমুচ্চয়।
সর্ব্ব-ভূমি করিলেন আলিপনাময়।। ২৫৬"[১৮৫]

অর্থাৎ, কবি বৃন্দাবন দাস যে সামাজিক লোকাচার ও লৌকিক রীতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন নিপুণভাবে, তার প্রমাণ মেলে এ বর্ণনা থেকে। চৈতন্যদেবের বিয়ের এই অধিবাস উপলক্ষে সকল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সমাজকেই নিমন্ত্রণ করা হয়। প্রত্যেককেই গন্ধ, চন্দন, দিব্য মালা এবং তাম্বুল দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। বৃন্দাবন দাস এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন —

"বিপ্রকুল নদীয়া-বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায়, কত আইসে, অবধি না পাই।। ২৬৬"[১৮৬]

বোঝা যায়, নবদ্বীপের প্রত্যেক ব্রাহ্মণই চৈতন্যদেবের অধিবাস উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে উপঢৌকন সংগ্রহ করেছিলেন। আবার, এমন কিছু লোভী ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাদের চরিত্র চিত্রণের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেন —

"তথি-মধ্যে লোভিষ্ট অনেক জন আছে।
একবার লইয়া পুন আর কাচ কাচে।। ২৬৭
আরবার আসি মহা-লোকের গহলে।
চন্দন, গুবাক মালা, নিঞা নিঞা চলে।। ২৬৮"[১৮৭]

অর্থাৎ, কবি বৃন্দাবন দাস এখানে সমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেণির লোলুপতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এমন কিছু কিছু ব্রাহ্মণ ছিলেন যারা ছদ্মবেশের মাধ্যমে কপটতার আশ্রয়ে বহু লোকের ভীড়ের মধ্যে এসে বার বার

গন্ধ, চন্দন, মালা, তাম্বুল সংগ্রহ করছিলেন। এই সমস্ত লোলুপ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদের চরিত্র সম্পর্কে চৈতন্যদেব অবহিত ছিলেন বলেই তিনি আদেশ করেন প্রত্যেককে তিনবার করে পানের বাটা, মালা, গন্ধ, চন্দন প্রভৃতি দেওয়ার জন্য। আসলে, চৈতন্যদেব জানতেন, বেশি পরিমাণে দ্রব্য পেলে লোভী ব্রাহ্মণদের মনোবাসনা সম্যকরূপে পূর্ণ হবে। লোভী ব্রাহ্মণেরা তাহলে শঠতার আশ্রয় থেকে বিরত থাকবেন এবং তাদের অবৈধ উপায়ে দ্রব্য গ্রহণ করবার প্রবৃত্তি জন্মাবে না। আবার তাছাড়া এই লোলুপ ব্রাহ্মণেরা ছদ্মবেশের মাধ্যমে কপটতার আশ্রয় নিতে গিয়ে ধরা পড়ে লাঞ্ছিত হবে না। ছদ্মবেশী লোলুপ এই ব্রাহ্মণদের কথা চিন্তা করেই চৈতন্যদেব আদেশ দেন —

''সভারে তাম্বূল মালা দেহ' তিনবার।
চিন্তা নাহি, ব্যয় কর' যে ইচ্ছা যাহার।। ২৭০''[১৮৮]

সুতরাং, কবি বৃন্দাবন দাসের বর্ণিত চৈতন্যদেবের অধিবাসের এই ঘটনা থেকে আমরা সহজেই এই শিক্ষা পাই যে, চুরি, ডাকাতি, জুয়াচুরি প্রভৃতি অসামাজিক কাজের প্রকোপ বাড়ার একটি প্রধান কারণই হল মানুষের অভাব। আর ব্যক্তি মানব চৈতন্যদেব তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন বলেই এই ঘটনার দ্বারা এই শিক্ষাই দান করেছেন যে, ব্যক্তিমানুষের অভাব দূরীভূত হলেই সমাজে অসামাজিক কাজের প্রকোপ কমবে। আর তাই তিনবার করে প্রত্যেক ব্রাহ্মণই মালা-চন্দন-তাম্বূল প্রভৃতি দ্রব্যাদি পেয়ে কেউ আর শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। প্রত্যেকেই চিত্তে আনন্দ অনুভব করে ধন্য ধন্য করতে থাকে। এরপর, রাজপণ্ডিত সনাতন নিজে এসে বাদ্য-নৃত্য-গীত সহযোগে চৈতন্যদেবের অধিবাস করে যান। চৈতন্যদেবের অধিবাস সম্পূর্ণ হলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অধিবাস করা হয়।

এভাবে, সমস্ত লৌকিক আচারের মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের অধিবাস সম্পূর্ণ হলে কবি বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও কবি যে লৌকিক ক্রিয়া-কলাপের বর্ণনা দান করেছেন তা তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রসূত বলেই মনে হয়। বিবাহের বর্ণনা দেখে মনে হয় কবি যেন নিজে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু আমরা জানি সে সুযোগ কবি বৃন্দাবন দাসের ছিল না। কারণ, চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের অনেক পরে কবি নিজগুরু নিত্যানন্দের আদেশে এই 'চৈতন্যভাগবত' নামক চৈতন্যজীবন চরিত গ্রন্থটি রচনা করতে বসেছিলেন। আর তাই এক্ষেত্রে কবির প্রধান সম্বল ছিল লোকশ্রুতি ও সামাজিক অভিজ্ঞতা। সামাজিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ কবি যে কতটা দক্ষ পারঙ্গম ছিলেন তার প্রমাণ মেলে চৈতন্যদেবের এই বিবাহ বর্ণনায়। প্রথমেই কবি বলেন, সকালবেলায় বিষ্ণুপূজা করে চৈতন্যদেব নান্দিমুখ করতে বসেন। নান্দিমুখ হল — বিবাহের শুভকর্মের মধ্যে এক মঙ্গল কর্ম বিশেষ। নান্দিমুখ কর্মকে কেউ কেউ আবার 'বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ' বলেও থাকে। এই রকম নানা লৌকিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বেজে ওঠে মঙ্গলধ্বনি। কবি বৃন্দাবন দাস তাই বলেন —

''বাদ্য-নৃত্য-গীতে হৈল মহা-কোলাহল।

চতুর্দ্দিগে জয় জয় উঠিল মঙ্গল।। ২৯১

পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দধি, দীপ, আম্রসার।

স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার।। ২৯২"[১৮৯]

সুতরাং, বোঝা যায় কবি গ্রন্থখানি লিখতে বসে শুধু ভক্তির আবেশেই নিবিষ্ট থাকেন নি। পাশাপাশি তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি যে কতটা তীব্র ছিল এ বর্ণনা থেকে তার প্রমাণ মেলে। এরপর, কবি জানান— সকল পতিব্রতাগণ মিলে গঙ্গায় যান গঙ্গাপূজা করতে এবং জল আনতে। গঙ্গাপূজা সম্পন্ন হলে সকলে মিলে বাদ্য সহযোগে ষষ্ঠী পূজা করেন এবং তারপর মন্দিরে মন্দিরে পূজো দিয়ে ঘরে ফিরে আসেন। অর্থাৎ লক্ষণীয়, বিবাহ একটি শুভকর্ম হওয়ায় লোকাচার যেমন করা হয়, ঠিক তেমনি লৌকিক দেব-দেবীদেরও এক্ষেত্রে কিন্তু আরাধনা করা হয়। এভাবে সকল পতিব্রতাগণের লৌকিক আচার সম্পন্ন হলে চৈতন্যদেবের বিবাহকালীন রূপের অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন কবি বৃন্দাবন দাস —

"অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।

তথি-মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন।। ৩০৮

অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর।

সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর।। ৩০৯

দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র ত্রিকচ্ছ-বিধানে।

পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়ানে।। ৩১০"[১৯০]

এভাবে চৈতন্যদেবের পরিপূর্ণ বিবাহের সাজ সম্পন্ন হলে শুভ সময়ে তিনি মঙ্গলধ্বনি সহযোগে বিবাহের জন্য শুভ যাত্রা করেন। বিবাহ করতে যাবার সময় পথে সহস্র দীপ, বাজি, আলো, বাদ্য, নৃত্য, কৌতুক, কোলাহলের যে বর্ণনা কবি দান করেছেন তা দেখে মনে হয় বিশাল আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনেক বরযাত্রী সহযোগে চৈতন্যদেব বিবাহ করতে গিয়েছিলেন। সমগ্র নবদ্বীপপুরী এভাবে আনন্দে পরিভ্রমণ করে গোধূলি বেলায় সকলে মিলে রাজপণ্ডিতের বাড়িতে আসেন। রাজপণ্ডিত জামাতা চৈতন্যদেবের রূপ পরিদর্শন করে নিজেই হর্ষাধিক্যে আত্মহারা হয়ে পড়েন। এরপর তিনি জামাই চৈতন্যদেবকে বরণ করেন বরণের সজ্জা সামগ্রী দিয়ে। তারপর রাজপণ্ডিতের পত্নী এসে —

"ধান্য-দূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।

আরতি করিয়া সপ্ত-ঘৃতের প্রদীপে।। ৩৪৮"[১৯১]

এভাবে সমস্ত লোকাচার সম্পন্ন হলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ বাসরে নিয়ে আসা হয়। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী চৈতন্যদেবকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে জোড়হাতে তাঁর সামনের আসনে বসেন। এরপর পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে উভয়ের মালাবদল সম্পন্ন হয় এবং এক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষ লঘু কৌতুকে পরস্পর লিপ্ত হন। এভাবে মালাবদল পর্ব সম্পন্ন হলে, চৈতন্যদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়ার শুভদৃষ্টি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এরপর,

কন্যাদান করেন রাজপণ্ডিত। তিনি যেহেতু ধনাঢ্য ব্যক্তি তাই যৌতুক হিসাবে প্রদান করেন —

''তবে দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা, দাসী, দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস।। ৩৬৯''[১৯২]

এরপর, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে চৈতন্যদেবের বাম পাশে বসিয়ে হোম-যজ্ঞের মধ্য দিয়ে উভয়ের পরিণয় সম্পন্ন হয়। এরূপে বিবাহ সম্পন্ন হলে চৈতন্যদেব সকল বরযত্রী সহকারে, সেদিন রাজপণ্ডিতের গৃহেই রাত্রিবাস করেন। পরদিন দুপুরবেলায় সকল মান্যবরকে নমস্কার জানিয়ে বাদ্য-নৃত্য-গীত সহযোগে চৈতন্যদেব পত্নী সহকারে স্ব-গৃহে ফিরে আসেন। বৃন্দাবন দাস জানান —

''তবে, আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্রবধূ গৃহে আনিলেন হর্ষ হৈয়া।। ৩৯৩''[১৯৩]

আবার, চৈতন্যদেব বিবাহ উপলক্ষে দান-ধ্যানও কম করেন নি। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের দান-ধ্যানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন —

''তবে যত নট, ভাট, ভিক্ষুক-গণেরে।
তুষিলেন বস্ত্র-ধন-বচনে সভেরে।। ৩৯৮''[১৯৪]

দীন-দরিদ্র্যের প্রতি এই বস্ত্রদানের মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের মহানুভবতার পরিচয় পাই। তিনি যে প্রকৃতই দরিদ্র্য মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তার পরিচয় আমরা এই অংশে পেয়ে থাকি। চৈতন্যদেবের এই বিবাহ বর্ণনায় অবশ্য সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় কবি বৃন্দাবন দাসের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির। নিজে চাক্ষুস প্রত্যক্ষ না করেও কবি যেভাবে চৈতন্যদেবের বিবাহের বর্ণনা দান করেছেন অণুপুঙ্ক্ষভাবে, তা কবির সামাজিক অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এভাবে, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের বিবাহের বর্ণনার মধ্য দিয়ে আদিখণ্ডের দশম অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন।

'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায়ের শুরুতেও কবি জানান, জগতে জীবের মধ্যে প্রেমভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হলেও তখনও পর্যন্ত তিনি গৃহস্থরূপে অধ্যাপনা কার্যের মধ্যেই নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে স্বরূপ প্রকাশের কিংবা প্রেম-ভক্তি প্রচারের কোনো লক্ষণই তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। আর এদিকে সকল জগৎ সংসার পারমার্থিক বিষয়ে অত্যন্ত বিমুখ। সকলেই বিষয়ভোগের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত। কবি তাই আক্ষেপের সুরে বলেছেন—

''গীতা ভাগবত বা পঢ়ায় যে যে জন।
তারাও না বোলে না বোলায়ে সঙ্কীৰ্ত্তন।। ৮''[১৯৫]

অর্থাৎ, তৎকালীন নবদ্বীপ নগরে হরিনাম সঙ্কীর্তন কারো মুখেই আর সেভাবে শোনা যেত না। অবশ্য কিছু কিছু বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনে লিপ্ত হলেও তাঁদের উপহাস-উপদ্রব সহ্য করতে হত। ইহলৌকিক সুখে মত্ত মানুষেরা নিজেদেরই 'ব্রহ্ম' বলে মনে করতেন। এই সব বেদবিরোধী

তান্ত্রিক লোকেরা ভক্ত আর ভগবানের ভেদকে মানতেন না। তাদের কাছে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের কোনো প্রভেদ নেই। আর তাই এই সব বেদ বিরোধী লোকেরা বলতেন —

"আমি ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস প্রভু ভেদ বা করেন কি কারণ? ১১"[১৯৬]

শুধু তাই নয়, এই সব বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয় সুখ-সর্বস্ব সংসারী মানুষেরা মনে করতেন, বৈষ্ণবেরা শুধুমাত্র চাল-ডাল-পয়সাকড়ি ভিক্ষা করবার জন্যই হরিনাম সঙ্কীর্তন করে থাকেন। এই কারণে মানুষের কাছে তাদের আগমন বার্তা পৌঁছানোর জন্যই উচ্চস্বরে কীর্তন করে থাকেন বৈষ্ণবেরা। তাই এই বিষয়ভোগী মানুষেরা বৈষ্ণবদের উপর উপহাস, উপদ্রবের পাশাপাশি উৎপীড়নও করতেন। কবি বলেছেন, বিষয়ভোগী মানুষেরা ভাবতেন—

" 'এ-গুলার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।'
এই যুক্তি করে সব-নদীয়া মিলিয়া।। ১৩"[১৯৭]

আর এই কারণে বৈষ্ণব সম্প্রদায়দের দুঃখের অন্ত ছিল না। বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনা থেকে আমরা তৎকালীন নবদ্বীপের সামাজিক চিত্রের পরিচয় পাই। লক্ষণীয়, কবি কিন্তু বার বার তৎকালীন সমাজে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনার চিত্র তুলে ধরেছেন আদি খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে।

এরপর কবি হরিদাস ঠাকুরের বর্ণনা দান করতে গিয়ে বলেছেন —

"এবে শুন হরিদাসঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা।। ১৭"[১৯৮]

এই হরিদাস ঠাকুর যশোহর জেলার অন্তর্গত বূঢ়ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বূঢ়ন গ্রামে কিছুকাল বাস করে তিনি গঙ্গাতীরে ফুলিয়া ও শান্তিপুরে চলে আসেন। এই শান্তিপুরেই বাস করতেন অদ্বৈতাচার্য। হরিদাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর মুখে ছিল সর্বদা কৃষ্ণনাম। বিষয় থেকে বিরাগী এই কৃষ্ণভক্ত মানুষটি সম্পর্কে কবি বলেছেন —

"বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য।। ২৩"[১৯৯]

অর্থাৎ, এই কৃষ্ণপ্রেমী মানুষটি যেমন ছিলেন বিষয় ভোগের সুখে আসক্তিশূন্য, তেমনি ছিলেন সর্বদাই গোবিন্দ নামে মুখর। আর কৃষ্ণনামে এতই বিভোর ছিলেন যে হরিদাস নানারূপ অদ্ভুত আচরণ করতেন বলে জানিয়েছেন কবি বৃন্দাবন দাস। তিনি কখনো যেমন কৃষ্ণনামে নৃত্য করতেন, তেমনি কখনো সিংহের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনিও দিতেন। আবার, কখনো যেমন উচ্চস্বরে কাঁদতেন, তেমনি কখনো অট্ট হাসিতেও লিপ্ত হতেন। ঠিক তেমনি কখনো আবার ভক্তিরসে মূর্ছিত হয়েও পড়তেন। আসলে, এই সমস্ত আচরণ ছিল হরিদাসের কৃষ্ণভক্তির প্রকটিত বিকারের লক্ষণ। তাই, বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

"অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম।

কৃষ্ণভক্তিবিকারের যত আছে মর্ম্ম।। ২৯"[২০০]

এভাবে, হরিদাস কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হলে সকল ফুলিয়ার ব্রাহ্মণেরাও তার সঙ্গে আনন্দে বিভোর হন। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর জাতিতে যেহেতু ছিলেন 'যবন' অর্থাৎ মুসলমান, তাই তাঁর বিরুদ্ধে কাজি নালিশ করেন মুলুক-অধিপতির কাছে —

"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।

ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার।। ৩৭"[২০১]

যবন হরিদাসের এই ভগবৎ কৃষ্ণ প্রেমকে মুসলমান মুলুক-অধিপতি ভালো চোখে দেখলেন না। তাঁকে শীঘ্রই মুলুক-অধিপতির সামনে ধরে আনা হয়। হরিদাসের মুলুকপতির কাছে আগমনের বার্তা শুনে বন্দী সজ্জন ব্যক্তিরা মোহিত হন। হরিদাসের ভক্তিরূপ ও ভক্তিভাব দেখে সকল বন্দী ব্যক্তি তাঁকে প্রণাম করেন। হরিদাস সকল বন্দী ব্যক্তিকে আশির্বাদ করে আদেশ দেন, সংসার বদ্ধ জীবের কাছে কৃষ্ণই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু বিষয় ভোগের সুখে মত্ত মানুষের কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় না। হরিনাম যেহেতু জীবের একমাত্র আশ্রয় তাই সকল বন্দীকেই নিরন্তর 'কৃষ্ণ' নাম করবার উপদেশ দেন হরিদাস ঠাকুর। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে সকল বন্দী ব্যক্তিবর্গই যে কৃষ্ণনাম করবার কারণেই কারারুদ্ধ হয়েছিলেন মুলুক-অধিপতির দ্বারা তা সহজেই বোঝা যায় কবির বর্ণনা থেকে। এরপর মুলুক-অধিপতি হরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন —

"কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।

তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ' মন।। ৬৮"[২০২]

শুধু তাই নয়, মুসলমান শাসক স্পষ্টই হরিদাসকে বলেন —

"আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।

তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত।। ৬৯"[২০৩]

কবি বৃন্দাবন দাসের এই বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজের জাতিগত বৈষম্যের চিত্রই ফুটে ওঠে। সেকালের হিন্দুদের প্রতি এক শ্রেণির মুসলমানদের এই ধরনের বিদ্বেষ সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেয়। কিন্তু যবন হয়েও হরিদাস ছিলেন এই সব জাত-পাতের বিচারের উর্দ্ধে। তাই মুলুকপতিকে নির্ভয়ে হরিদাস বলেন—

"বলিতে লাগিলা তাঁরে মধুর উত্তর।

শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর।। ৭৩

নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।

পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে।। ৭৪"[২০৪]

সুতরাং, হরিদাস বলেন যে— ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। সেই একই ঈশ্বরকে হিন্দুরা এক নামে ডাকে এবং যবনেরা আর এক নামে ডাকে। হিন্দু ও মুসলমানের ঈশ্বরের নামগত প্রভেদ থাকলেও তত্ত্বগত কোন প্রভেদ নেই। আবার পরমার্থ বিচারেও হিন্দুর পুরাণ শাস্ত্র ও যবনের কোরাণ শাস্ত্র এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের কথাই বলে থাকেন। একই ঈশ্বর আবার পরমাত্মা রূপে সকল জীবের হৃদয়ে বাস করেন। মধ্যযুগের জাতিগত বিভেদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হরিদাসের এই উদার মনোভাব হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল প্রকাশ বলেই মনে হয়। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় হওয়ায় হিংসা দূরীভূত করবার কথা বলেন হরিদাস। তিনি ভারতীয় কর্মফল বাদের দর্শন উত্থাপন করে বলেন— যদি কোনো ব্রাহ্মণ বংশজাত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যবন হয় তাহলে হিন্দুরা তাকে শাস্তি দেয় না। কারণ— নিজ ধর্ম যে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয় সে মৃতপ্রায়। তাই তাকে পুনরায় শাস্তি দেবার কোন সার্থকতা নেই। হরিদাসের এই যুক্তিপূর্ণ ‘সুসত্য বচন’ শুনে উপস্থিত সকল যবনেরা সন্তুষ্ট হলেও একজন কাজী মুলুকপতিকে বলেন— এই হরিদাস অত্যন্ত দুষ্ট। এ নিজে তো কুলধর্ম পরিত্যাগ করেছে, আরও অনেক মুসলমানকে কুলধর্ম ত্যাগ করতে পরামর্শ দেবে। তাই হরিদাসকে শাস্তি প্রদান করা হোক। কাজীর এই কথায় মুলুকপতি পুনরায় হরিদাসকে স্বীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও যবনের আচরণ গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত হরিদাস জানান —

> ‘‘খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
> তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।। ৯১’’[২০৫]

হরিদাসের এই অভ্রান্ত নির্ভীক ঈশ্বর নির্ভরতার কথা শুনে কাজীর পরামর্শ মতো মুলুকপতিও ‘বাইশ বাজারে’ বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। এমন ভাবে পাইকদের মারতে আদেশ করলেন, যাতে হরিদাসের প্রাণহানি ঘটে। মুলুকপতির আদেশ মত পাইকেরা বাজারে বাজারে নিয়ে গিয়ে হরিদাসকে প্রচণ্ড প্রহার করেন। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে হরিদাসের প্রতি মুলুকপতির নির্দেশে যে পাশবিক অত্যাচারের চিত্র কবি বৃন্দাবন দাস এক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, যবন অধিপতির দ্বারা তৎকালীন হিন্দুরা যে নির্যাতিত হয়েছিল তারই ইঙ্গিত বহন করে যেন হরিদাসের এই কাহিনিটিতে। কিন্তু পাইকদের এত বেত্রাঘাতেও যখন হরিদাসের প্রাণহানি ঘটে না, তখন তারা হরিদাসকে মরবার জন্য অনুরোধ করে। কারণ হরিদাসের না প্রাণহানি ঘটলে পাইকদের নিজেদেরও প্রাণহানি ঘটবে। তাই যবন পাইকদের রক্ষা করবার জন্য হরিদাস বলেন —

> ‘‘হাসিয়া বোলেন হরিদাস মহাশয়।
> ‘আমি জীলে যদি তোমা’ সভার মন্দ হয়।। ১১৮
> তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান।
> এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান।।’ ১১৯’’[২০৬]

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধ্যান করতে করতে হরিদাস তন্ময় ভাবে প্রেমে সমাধিপ্রাপ্ত হন। মৃতবৎ তাঁর

দেহে সকল লক্ষণ পরিস্ফুট হলে, পাইকেরা সকলে মিলে তখন হরিদাসের দেহ নিয়ে গিয়ে মুলুকপতির কাছে উপস্থিত করেন। মুলুকপতি হরিদাসকে কবর দিতে বললে, এক কাজী বলেন —

"মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল।

গাঙ্গে ফেল, যেন দুঃখ পায় চিরকাল।। ১২৪"[২০৭]

যেহেতু গঙ্গা হিন্দুদের পবিত্র নদী, তাই গঙ্গায় ফেলে দিলে হরিদাসের জাতিনাশের শাস্তি ঘটবে। অর্থাৎ, তাঁর আত্মার সদ্‌গতি না ঘটে পরলোকে অনন্ত দুঃখে অতিবাহিত হবে। লক্ষণীয়, কাজীর এই পরামর্শদানের মধ্য দিয়ে তৎকালীন যবনদের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তাই বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটি তৎকালীন সমাজের দলিল হিসাবে সাক্ষ্য বহন করে।

কাজীর কাছে এরূপ আদেশ পেয়ে পাইকেরা হরিদাসকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে হরিদাস কিছুক্ষণ পর বাহ্যজ্ঞান ফিরে পান। তিনি পরমানন্দে উচ্চস্বরে হরিনাম করতে করতে ফুলিয়ায় ফিরে আসেন। হরিদাসের এই অদ্ভুত শক্তি দেখে সকল যবন পাইকেরাই তাঁকে 'পীর' মনে করে প্রণাম করেন। মুলুকপতির কাছেও এই খবর গেলে মুলুকপতি হরিদাসের সামনে জোড় হস্তে দাঁড়িয়ে বলেন —

"সত্য সত্য জানিলাঙ তুমি মহা-পীর।

একজ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির।। ১৪৭

যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বোলে।

তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে।। ১৪৮"[২০৮]

সুতরাং হরিদাসের কাছে মুলুকপতি ক্ষমা প্রার্থনা চান। হরিদাস অতঃপর ফুলিয়ায় আসেন এবং হরিনাম করে দিন অতিবাহিত করেন। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণেরা হরিদাসের জন্য দুঃখ করলেও, তিনি তাদের প্রবোধ দিয়ে বলেন, হয়তো কৃষ্ণনিন্দা শ্রবণ করবার জন্যই তাঁর এইরূপ শাস্তি হয়েছে। তাই দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। হরিদাস গঙ্গাতীরে গিয়ে নিজ গোফা গঠন করে অহর্নিশ কৃষ্ণনাম করতে থাকেন। কবি প্রসঙ্গতই বলেন —

"তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।

গোফাই হইল তান বৈকুণ্ঠভবন।। ১৭০"[২০৯]

কিন্তু এরপর হরিদাসের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লৌকিকতা থেকে অলৌকিকতায় পৌঁছেছেন। হরিদাস যে গোফায় থাকতেন সেই গোফার নীচে এক মহাবিষধর সাপ ছিল। সেই সাপের বিষের জ্বালায় কেউ হরিদাসের সঙ্গে বেশিক্ষণ সাক্ষাৎ করতে পারতেন না। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের এতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি দিব্যি সেই গোফায় কৃষ্ণনামে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু পরে, ফুলিয়ার বৈদ্যগণ সেই মহাবিষধর সাপের গোফার নীচে বাসের কথা জানালে সকল বিপ্রগণ হরিদাসকে গোফা ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। হরিদাস গোফা ত্যাগ করবেন, একথা শুনতে পেয়ে সেই মহাবিষধর সাপ গোফা

ত্যাগ করে চলে যায়। হরিদাস ঠাকুরের এই অলৌকিক মহাশক্তি দেখে সকল বিপ্রগণ আনন্দে তাঁর প্রতি ভক্তি নিবেদন করেন।

এরপর কবি বৃন্দাবন দাস এরকম আরেকটি কাহিনির সূচনা করতে গিয়ে বলেন —

> ‘‘আর এক শুন তান অদ্ভুত আখ্যান।
> নাগরাজে যে কহিলা মহিমা তাহান।। ১৯৫’’[২১০]

লক্ষণীয়, বৃন্দাবন দাস নিজেই বলেন কাহিনিটি অদ্ভূত। অর্থাৎ, অনেকের কাছে কাহিনিটি অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। একদিন বড়লোকের বাড়িতে এক সাপুড়ে সাপের খেলা দেখাতে আসে। মন্ত্রের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে সেই সাপুড়ে যখন মৃদঙ্গ-মদিরা প্রভৃতি বাদ্যের সঙ্গে নাচ করছিল তখন তার সাপের খেলা দেখতে অনেক লোক ভীড় করে এবং করুণ সুরে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়া দমন লীলাকথা গান করে। দৈবক্রমে হরিদাস এই লীলাকথা শ্রবণ করে ভাবের আবেশে মূর্ছিত হন। কিছুক্ষণ পর চৈতন্য ফিরে পেয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে নৃত্য করতে থাকেন।

হরিদাসের এরূপ কৃষ্ণপ্রেমাবেশ দেখে এক ভণ্ড বিপ্র তাঁর অনুকরণ করে সাপুড়ের নৃত্যের মাঝখানে অজ্ঞানের ভান করে পড়ে যান। কিন্তু সাপুড়ে এই ভণ্ড বিপ্রের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাকে বেত দিয়ে প্রহার করেন। বেত্রের আঘাতে ব্যথিত ভণ্ড বিপ্র তখন সেই স্থান থেকে পালিয়ে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। সাপের খেলা দেখতে উপস্থিত সকলে তখন সাপুড়েকে প্রশ্ন করে কেন এই বিপ্রকে মারা হল? আর কেনই বা হরিদাসের প্রেমাবেশ দেখে জোড় হাতে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন? সাপুড়ে তখন সকলের কাছে বিপ্রের ভণ্ডামি এবং হরিদাসের কৃষ্ণপ্রেমাবেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। আসলে, বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস এই কাহিনির মধ্য দিয়ে হরিদাসের কৃষ্ণপ্রেমাবেশের মাহাত্ম্যকথাই বর্ণনা করেছেন। পাশাপাশি হরিদাসের কাহিনি বর্ণনা করে কবি যেন বিভিন্ন শাস্ত্রে ভগবানের উক্তির প্রামাণিকতা বিচার করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে ভগবান নিজেই বলেছেন, বিষ্ণুভক্তি বিহীন কুলীনও চণ্ডাল বলে গণ্য; আর হরিভক্তি পরায়ণ হলে চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ। এই কারণেই কবি বললেন —

> ‘‘উত্তমকুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
> কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে।। ২৩৬
> এ সকল বেদ-বাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
> জন্মিলে হরিদাস অধম-কুলেতে।। ২৩৭’’[২১১]

এভাবে কবি বৃন্দাবন দাস হরিদাসের মহিমাকথা বর্ণনা করবার পর পুনরায় চৈতন্যদেবের আত্মপ্রকাশ না করবার কথা ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কোনরূপ ভগবৎসত্ত্বার প্রকাশ ঘটে নি। পাশাপাশি কবি যেমন তৎকালীন সামাজিক অবস্থার চিত্র বর্ণনা করেছেন, তেমনি বিষয়ভোগী ইন্দ্রিয় সুখ-সর্বস্ব সংসারী মানুষদের দ্বারা বৈষ্ণবদের লাঞ্ছিত হবার কাহিনিও পুনরায় বর্ণনা করেছেন।

বার বার কবির বৈষ্ণবোচিত মনোভাব যেমন প্রকাশ পেয়েছে, ঠিক তেমনি একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তৎকালীন সমাজ জীবনে বৈষ্ণবেরা নানাভাবে উৎপীড়িত হয়েছিল। কবি বলেছেন, হরিদাস ঠাকুরও এই বৈষ্ণবদের লাঞ্ছনা এবং ভক্তিশূন্য তৎকালীন সমাজ দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন। আর এই দুঃখ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার জন্য উচ্চস্বরে হরিনাম করতেন। কিন্তু হরিদাসের এই উচ্চস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্তন বিষয়ভোগী সংসারী মানুষদের কাছে সহ্যাতীত হয়ে উঠেছিল। তাই হরিনদী গ্রামের এক ব্রাহ্মণ ক্রোধবশতঃ হরিদাসকে প্রশ্ন করেন— কেন তিনি মনে মনে হরিনাম জপ না করে উচ্চস্বরে কীর্তন করে থাকেন? উত্তরে হরিদাস বলেন —

"উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুন্য হয়।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়।। ২৭০"[২১২]

অর্থাৎ, হরিদাস শাস্ত্র থেকে উহাহরণ দিয়ে এ কথাই বলতে চান, যেহেতু পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ হরিনাম উচ্চারণ করতে পারে না, তাই উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন করলে তারা হরিনাম শ্রবণের মাধ্যমেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়ে থাকে। কিন্তু মনে মনে হরিনাম জপ করলে অপরে শুনতে পায় না, তাই মনে মনে জপ করার চাইতে উচ্চস্বরে হরিনাম করলে শতগুণ পুন্য হয়। কিন্তু হরিদাসের এই যুক্তিপূর্ণ উক্তি শুনে সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। বৃন্দাবন দাস বলেছেন হরিদাস অবশ্য সেই ব্রাহ্মণের কথায় কোনো প্রত্যুত্তর না করে উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন করতে থাকেন।

কিন্তু লক্ষণীয়, ভক্ত বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস হরিদাসের প্রতি সেই ব্রাহ্মণের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি বলেছেন —

"ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও যায় পুণ্য ক্ষয়।।২৯৬"[২১৩]

শুধু তাই নয়, এসব ব্রাহ্মণরূপী অবৈষ্ণবেরা আসলে 'কলিযুগের রাক্ষস' বলে অভিহিত করেছেন বৃন্দাবন দাস। সেইসঙ্গে তিনি আরো জানান, ঐ হরিনদী গ্রামের ব্রাহ্মণের কিছুদিন পর বসন্তরোগ হয় এবং নাকটি খসে পড়ে যায়। এরপর কবি বৃন্দাবন দাস হরিদাস ঠাকুরের নবদ্বীপ আগমনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন এবং তদ্‌জনিত কারণে বৈষ্ণবদের পরমানন্দের কথা উত্থাপন করেন।

আদিখণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়েও কবি বৃন্দাবন দাস প্রথমে চৈতন্যদেবের অধ্যাপক-শিরোমণি হিসাবে নবদ্বীপে খ্যাতির কথাই বর্ণনা করেছেন। আবার পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ যে ভক্তিশূন্য হয়ে পড়েছিল তার প্রসঙ্গও তিনি উত্থাপন করেছেন। আর এই কারণে ভক্ত বৈষ্ণবদের দুঃখ দেখে এবং বিষয়ভোগী মানুষদের দ্বারা বৈষ্ণবদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ দেখে চৈতন্যদেব আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সত্ত্বেও গয়া গমনের উদ্দেশ্যে সেই ইচ্ছা থেকে বিরত হন। কবি তাই বলেছেন —

"চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে।

ভাবিলেন 'আগে আসি গিয়া গয়া হৈতে।।' ৯''[২১৪]

সুতরাং, চৈতন্যদেব শিষ্যদের সহকারে পিতৃপুরুষের তর্পণের উদ্দেশ্যে গয়া যাত্রা করলেন। অবশ্য গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ করবার পূর্বে চৈতন্যদেব পিতৃপুরুষের আশির্বাদ লাভের জন্য নিজ বাড়িতে শাস্ত্রবিধিসম্মত ভাবে শ্রাদ্ধকর্মাদি সম্পন্ন করেন। এরপর মাতা শচীদেবীকে প্রণাম করে চৈতন্যদেব গয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। শিষ্যদের সঙ্গে নানারূপ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেব ভাগলপুর জেলার মন্দার পর্বতের কাছে উপস্থিত হলেন। সেখানে মন্দার পর্বতস্থিত শ্রীমধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করে কিছুদুর পথ অতিক্রম করবার পর চৈতন্যদেবের দেহে জ্বরের উপসর্গ প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গত পুনরায় বলতে হয় যে, চৈতন্যদেব যেহেতু একজন রক্ত-মাংসে গঠিত মানব ছিলেন, তাই তাঁর দেহে জ্বর হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের এই জ্বর উপসর্গটির মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবোচিত তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেন —

''প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুন্ঠ-ঈশ্বর।

লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর।। ১৭''[২১৫]

অর্থাৎ, জ্বর উপসর্গটি আসলে চৈতন্যদেব প্রকাশ করেন লোকশিক্ষার কারণে। কিন্তু চৈতন্যদেবের জ্বর দেখে শিষ্যরা প্রত্যেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। নানারকম প্রতিকারের চেষ্টা করলেও চৈতন্যদেবের জ্বর যখন কিছুতেই কমানো যায় না তখন চৈতন্যদেব নিজেই কৃষ্ণভক্ত বিপ্রের পদযুগল সেবা করে চরণজল পান করেন। আর এভাবেই চৈতন্যদেবের জ্বর নামক উপসর্গটির সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্তি ঘটে। আসলে, চৈতন্যদেবের এই কৃষ্ণভক্ত বিপ্রের চরণজল সেবনের দ্বারা কবি এই কথাই বলতে চান যে, এতে স্বয়ং ভগবান অত্যন্ত প্রীত হন এবং ভক্তের প্রতি নিজ কৃপা বর্ষণ করেন। যেহেতু কৃষ্ণভক্ত বিপ্র সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলের সেবা করেন এবং চরণজল পান করেন, তাই স্বয়ং ভগবানের অবতার চৈতন্যদেবও কৃষ্ণভক্তের চরণজল পান করলেন। কারণ 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন — যাঁরা যেভাবে আমার ভজনা করেন, তাঁদেরকে আমি সেভাবেই ভজণা করি। কবি বৃন্দাবন দাসও তাই 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এর অনুসরণে বলেন —

''যে তাহান দাস্য পদ ভাবে নিরন্তর।

তাহারা অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর।। ২৪''[২১৬]

অবশ্য লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে কবি চৈতন্যদেবকে পুনরায় ভগবানের অবতার রূপেই প্রতিষ্ঠিত করে নিজ বৈষ্ণবোচিত তত্ত্বকে প্রমাণিত করেছেন।

এরপর চৈতন্যদেব জ্বর থেকে নিবৃত্তি পাওয়ার পর 'পুনঃপুনা' তীর্থে এসে উপনীত হন। পুনঃপুনা পাটনার কাছে প্রবাহিত একটি নদী। এখানে স্নান করে চৈতন্যদেব পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন। তারপর সেখান থেকে গয়া তীর্থে এসে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সেরে তিনি পুনরায় প্রয়াত পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে

যথোচিত সম্মান জ্ঞাপন করেন। এরপর চৈতন্যদেব গয়াধামে অবস্থিত চক্রবেড় নামক তীর্থ স্থানে এসে উপস্থিত হন। এই চক্রবেড়ে বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শন করে এবং তার মহিমা কথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব প্রেমানন্দসুখে মোহিত হন। কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের ভাবাবেগের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

''অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে।

লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণদর্শনে।। ৪২

সর্ব্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।

প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ।। ৪৩''[২১৭]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের মধ্যে প্রেমভক্তির প্রকাশ ঘটে বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শনের মধ্য দিয়েই। বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শনে চৈতন্যদেব প্রেমভক্তির আবেশে অবিরাম ভাবে অশ্রুধারা বর্ষণ করেন। এমন সময় আকস্মাৎই ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনের পর চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর বন্দনা করেন বিনম্রভাবে। ঈশ্বর পুরীও চৈতন্যদেবকে কাছে পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এরপর ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে আজ্ঞা নিয়ে চৈতন্যদেব পিতৃ-পুরুষের তীর্থ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন —

''ফল্গুতীর্থে করি বালুকার পিণ্ড দান।

তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া-স্থান।। ৬৪''[২১৮]

অর্থাৎ, প্রথমে ফল্গুতীর্থে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে বালুকায় পিণ্ডদান করে চৈতন্যদেব গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত প্রেতগয়ায় পিণ্ড দান করেন। এভাবে, যথাবিধি মত চৈতন্যদেব পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করে 'দক্ষিণ মানস' নামক গয়ার তীর্থস্থানে আসেন। এরপর ক্রমান্বয়ে চৈতন্যদেব শ্রীরামগয়া, যুধিষ্ঠির গয়া, উত্তরমানস, ভীমগয়া, শিবগয়া, ব্রহ্মগয়া, ষোড়শগয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করেন। সবশেষে চৈতন্যদেব ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে 'গয়াশিরে' এসে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করেন এবং বিষ্ণু পাদপদ্ম চিহ্নে নিজ হস্তে পূজা করেন। লক্ষণীয়, চৈতন্যদেবের এই গয়াতীর্থগুলিতে ভ্রমণ এবং সর্বতীর্থে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান অর্পনের মধ্য দিয়ে সহজেই বোঝা যায় যে, পিতৃপুরুষের প্রতি চৈতন্যদেবের কত গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছিল। পাশাপাশি বৃন্দাবন দাস গয়ার সর্বতীর্থের যে অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে কবির ভৌগোলিক জ্ঞান ও ইতিহাস বোধ সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করে, তাই 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটি শুধুমাত্র চৈতন্যজীবনী সাহিত্য হিসাবে পরিগৃহীত না হয়ে তৎকালীন সামাজিক ঐতিহাসিক দলিল হিসাবেও সাক্ষ্য বহন করে।

এভাবে, চৈতন্যদেব পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধক্রিয়াটি সম্পন্ন করে বাসায় ফিরে নিজ আহার্যের জন্য রন্ধন কার্যে প্রবৃত্ত হন। যেই মুহূর্তে চৈতন্যদেবের রন্ধনকার্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে এমন সময় আতিথ্য গ্রহণ করেন কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ঈশ্বরপুরী। চৈতন্যদেব তখন প্রসন্নচিত্তে সেই রন্ধনকৃত আহার্য ঈশ্বরপুরীকে পরিবেশন করে নিজে পুনরায় রন্ধন করে আহার্য গ্রহণ করেন। এরপর, চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর

কাছে মন্ত্রদীক্ষা চাইলে—

> ‘‘তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
> করিলেন দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ।। ১০৬’’[২১৯]

ঈশ্বরপুরীর কাছে দশাক্ষর শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা মন্ত্র গ্রহণ করে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে মত্ত হন এবং অবিরাম কৃষ্ণপ্রেমে অশ্রুধারা বর্ষণ করেন। লক্ষণীয়, ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে এই মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করবার পর থেকেই চৈতন্যদেবের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশ প্রকাশিত হতে শুরু করে।

এরকম একদিন নিভৃতে ইষ্টমন্ত্র ধ্যানের সময় চৈতন্যদেব কৃষ্ণবিরহে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়ে প্রেমভক্তিরসে রোদন করতে থাকেন। চৈতন্যদেবের চরিত্রের এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখে বৃন্দাবন দাস নিজেই বলেন —

> ‘‘যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
> সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির।। ১১৯
> গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে।
> ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ সাগরে।। ১২০’’[২২০]

এভাবে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রাপ্তির ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হবার কিছুক্ষণ পর শিষ্যগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তিনি সুস্থ হন। সুস্থ হয়ে চৈতন্যদেব সকল শিষ্যকে ঘরে ফিরে যেতে আদেশ করে নিজে কৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য মথুরা যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কোনক্রমে সকল শিষ্য মিলে চৈতন্যদেবকে প্রবোধ দিয়ে রাখা হলেও শেষরাত্রে তিনি মথুরায় গমন করেন কৃষ্ণকে প্রাপ্তির আশায়। কিন্তু হঠাৎ পথে দৈববাণী শুনতে পেয়ে চৈতন্যদেব বাসায় ফিরে আসেন এবং তারপর সকল শিষ্যগণ সহ নবদ্বীপে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। কবি বৃন্দাবন দাস অবশ্য জানিয়েছেন —

> ‘‘নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।
> দিনে দিনে বাঢ়ে প্রেমভক্তির উদয়।। ১৩৯’’[২২১]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের মধ্যে এই গয়া থেকে গমনের পরই কৃষ্ণপ্রেম ভক্তির আবেশ প্রকাশিত হতে শুরু করে। এরপর কবি বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

> ‘‘আদিখণ্ড-কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে।
> মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভালমতে।। ১৪০’’[২২২]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের এই গয়া গমন ও সেখান থেকে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি বৃন্দাবন দাস আদিখণ্ডের কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। অবশ্য কবি বৃন্দাবন দাস এরপর কয়েকটি পয়ার জুড়ে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের বন্দনা গান করেছেন। কবি পুনরায় এখানে আবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নিজ গুরু নিত্যানন্দের আদেশেই এই চৈতন্যজীবনী চরিত গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ

করেছেন। এক্ষেত্রে তাই তাঁর নিজের স্বাতন্ত্র্য নেই। তিনি চৈতন্যদেব সম্পর্কিত যে সমস্ত বৃত্তান্ত নিত্যানন্দের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন, তাই এই কাব্যে বর্ণনা করেছেন মাত্র। তাই কবি বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

> ''কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।
> এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়।। ১৪৫''[২২৩]

অর্থাৎ, কবির নিজের কোন শক্তি বা সামর্থ নেই। কৃপা করে গৌরচন্দ্র তাঁকে দিয়ে যা বলিয়েছেন তাই তিনি ব্যক্ত করেছেন মাত্র। আমাদের মনে হয়, এই সমস্ত উক্তি কাব্যের অধ্যায় শেষে কবি বৃন্দাবন দাস ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং গ্রন্থঋণ স্বীকার করবার জন্যে। এভাবে, কবি চৈতন্যদেব ও নিজগুরু নিত্যানন্দের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে আদিখণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

কবি বৃন্দাবন দাস 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের মধ্য খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শুভসূচনা করেছেন— চৈতন্যদেবের প্রতি মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে। কবি নিজে যেহেতু বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁর ভক্তিমিশ্রিত বিনয় প্রকাশিত হয়েছে চৈতন্যদেবের প্রতি এই মঙ্গলাচরণ অংশে। এরপর কবি মধ্যখণ্ডে বর্ণিত চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন প্রচার ধর্মই যে মুখ্য, সে বিষয়ে সূত্র নির্দেশ করে প্রথমেই বলেছেন —

> ''মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
> যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড।। ৬
> মধ্যখণ্ড কথা ভাই! শুন একচিত্তে।
> সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল যেনমতে।। ৭''[২২৪]

অর্থাৎ, বোঝা যাচ্ছে চৈতন্যদেবের দ্বারা হরিনাম সঙ্কীর্তন প্রচারই হল মধ্যখণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু 'প্রথম খণ্ড'-এর পরিসমাপ্তি যেহেতু বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের গয়া গমনের মধ্য দিয়ে করেছেন, তাই এই 'মধ্যখণ্ড'-এর প্রথম অধ্যায়ের প্রথমাংশেই কবি জানান —

> ''গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
> পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়ানগর।। ৮''[২২৫]

যেহেতু চৈতন্যদেব গয়াতীর্থ পরিভ্রমণ করে আসেন, তাই তাঁকে দেখবার জন্য সকল আত্মীয়বর্গ তথা সকল নবদ্বীপবাসী ছুটে আসেন। সকলেই চৈতন্যদেবকে দেখে যেমন আনন্দিত হন, তেমনি পাশাপাশি তাঁকে 'চিরজীবী' হবার জন্য আর্শিবাদ প্রদানও করেন। চৈতন্যদেবও আত্মীয়বর্গের কাছে তাঁর গয়া তীর্থ পরিভ্রমণের কাহিনি যেমন অণুপুঙ্ক্ষভাবে বর্ণনা করেন, তেমনি নিজ দৈন্যোক্তি প্রকাশ করে বলেন—

> ''প্রভু বোলে 'তোমা' সভাকার আশীর্ব্বাদে।
> গয়াভূমি দেখি আইলাঙ নির্ব্বিরোধে।। ১২''[২২৬]

চৈতন্যদেবের আত্মীয়বর্গের প্রতি এই বিনয় প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর মানসিকতার পরিচয় পেয়ে থাকি। মানবিক গুণে সমৃদ্ধ এই চৈতন্যদেবকে দেখে তাই তাঁর মাতা শচীদেবী যেমন প্রসন্ন হন তেমনি স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠেন। লক্ষণীয়, গয়াতীর্থ পরিভ্রমণ করে আসার পর চৈতন্যদেব তাঁর বাড়িতে আগত বৈষ্ণবদের সঙ্গে যে বিনয় প্রকাশ করেছেন তার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেন—

"সভারে করিলা প্রভু বিনয়-সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন সভে গেলা নিজ বাস।। ১৯"[২২৭]

এখানে, সকল বৈষ্ণবের প্রতি চৈতন্যদেবের বিনীতভাবে সম্ভাষণ অর্থাৎ কথাবার্তা বলার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়ে থাকি। তবে, প্রাথমিক ভাবে প্রায় সকলেই চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ লাভ করবার পর ফিরে গেলে, মাত্র দুই-চারজন বিষ্ণুভক্তের কাছে চৈতন্যদেব গয়া তীর্থ ভ্রমণ কালে দর্শন-করা বিষ্ণুর পাদপদ্মের তত্ত্বকথা বর্ণনা করেন। কেন সেই স্থানটি 'পাদোদক তীর্থ' নামে পরিচিত তা বিষ্ণু ভক্তদের কাছে তিনি অণুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেন। তবে, শুধু বিষ্ণুর পাদপদ্মের মাহাত্ম্যকথাই তিনি বর্ণনাই করেন না, সেইসঙ্গে নিজে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে থাকেন। কবি বৃন্দাবন দাস তাই বলেন —

"শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর।। ২৮"[২২৮]

অর্থাৎ, কৃষ্ণের প্রতি চৈতন্যদেবের প্রেমাবেশের প্রথম প্রকাশ আমরা লক্ষ করলাম নবদ্বীপে। আর এই কারণে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণের প্রতি নিগূঢ় বিরহার্তি দেখে শ্রীমান পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তরা সকলেই বিস্মিত হয়ে যান। এসব বৈষ্ণবেরা প্রত্যেকেই ভাবতে থাকেন, যে চৈতন্যদেব গয়াতীর্থ পরিভ্রমণের পূর্বে অধ্যাপনা কার্যে সর্বদা নিয়ত থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্রমাণ করেছিলেন, সেই চৈতন্যদেব গয়ায় তীর্থ পরিভ্রমণকালে কৃষ্ণের কি এমন বৈভব তথা ঐশ্বর্য দর্শন করলেন, যার জন্য তাঁর এরূপ মানসিক পরিবর্তন সাধিত হল। সুতরাং, সকলেই কিন্তু চৈতন্যদেবের এরূপ অদ্ভুত কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি ভাবাবেশ ও প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে দেখে তার কারণ অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হন। কিছুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মোহিত থাকার পর বাহ্যদৃষ্টি ফিরে এলে চৈতন্যদেব শ্রীমান পণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবদের অনুরোধ করেন, পরের দিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে উপস্থিত থাকার জন্য। কিন্তু সকল বৈষ্ণবেরা ফিরে গেলেও চৈতন্যদেব নিরবধি কৃষ্ণ প্রেমের মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। অর্থাৎ এই বাহ্য সংসারের প্রতি এক অমনোযোগী ঔদাসীন্য মনোভাব চৈতন্যদেবের মধ্যে এই সময় থেকে প্রকাশ পায়। কবি বৃন্দাবন দাস এই কারণেই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে —

"আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস।। ৪৫"[২২৯]

অর্থাৎ, কবি আমাদের জানান, যে ভাগবৎ প্রেমভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে চৈতনদেব জন্মগ্রহণ করেছেন তা যেন এই পর্ব থেকেই প্রকাশ হতে শুরু করে। এদিকে, সকল বৈষ্ণবদের মধে চৈতন্যদেবের এই ভক্তিমার্গের প্রতি মানসিক পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। সকলের কাছেই এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে ওঠে চৈতন্যদেবের এই কৃষ্ণপ্রেম ভক্তির প্রতি আশ্রয় গ্রহণ। এই কারণে শ্রীমান পণ্ডিত বৈষ্ণবদের কাছে বলতে বাধ্য হন —

"পরম-অদ্ভুত কথা, মহা-অসম্ভব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব।। ৫৮"[২৩০]

শুধু তাই নয়, সেইসঙ্গে শ্রীমান পণ্ডিত চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদের কাছে আরো জানান যে —

"পরম-বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক ঔদ্ধত্যের নাহিক প্রকাশ।। ৬০"[২৩১]

অর্থাৎ, গয়াতীর্থ পরিভ্রমণের পূর্বের মত পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ গর্ব যেমন চৈতন্যদেবের মধ্যে আর নেই, তেমনি পাশাপাশি তিনি কৃষ্ণপ্রেমাবেশের কারণে সংসারের প্রতি অনাসক্তি প্রকাশ করে অনেক বেশি বিনয়ী হয়ে উঠেছেন। চৈতন্যদেবের এই জ্ঞানমার্গ থেকে ভক্তিমার্গে নিয়োজিত হবার মানসিক পরিবর্তনের কথা শ্রবণ করে সকল বৈষ্ণবেরাই প্রফুল্ল হন।

এরপর, সকলেই অর্থাৎ সদাশিব, মুরারি গুপ্ত, শ্রীমান পণ্ডিত ও গদাধর পণ্ডিত প্রমুখ বৈষ্ণব ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেকেই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে এসে উপনীত হন। চৈতন্যদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে ভগবৎ কৃষ্ণ প্রেমে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ করতে শুরু করেন। কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য আর্তি প্রকাশ করে চৈতন্যদেব বলেন —

"পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা?
এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা।। ৮২"[২৩২]

অর্থাৎ, কৃষ্ণবিরহে গাঢ়ভাবে আবিষ্ট চৈতন্যদেব এতই ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়েন যে, শুক্লাম্বরের বাড়ির খুঁটিটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মাটিতে পড়ে যান। চৈতন্যদেবের মত একজন পণ্ডিত অধ্যাপক মানুষের এরূপ কৃষ্ণবিরহে ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আর্তি প্রকাশ করতে দেখে উপস্থিত সকল বৈষ্ণবেরাই পরমানন্দ লাভ করেন। তবে, প্রত্যেকেই চৈতন্যদেবের এই মানসিক পরিবর্তনে বিস্ময় প্রকাশও করেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, চৈতন্যদেবের গদাধর পণ্ডিতের প্রতি খেদোক্তি—

"প্রভু বোলে 'গদাধর! তোমার সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়-মতি।। ৯৫
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে।
পাইলুঁ অমূল্য নিধি গেল দিন-দোষে।।' ৯৬"[২৩৩]

কৃষ্ণপ্রেমাবেশে এভাবে নিরন্তর প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে থাকেন চৈতন্যদেব। আর বৈষ্ণবেরা তাঁর এরূপ অপূর্ব প্রেমবিকারের কারণ অনুসন্ধান করতে না পেরে প্রত্যেকেই চৈতন্যদেবকে আশীর্বাদ করেন।

এভাবে সকল বৈষ্ণবদের পরমানন্দ দান করে চৈতন্যদেব গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু। তিনি শিষ্য চৈতন্যদেবকে দেখে পরমানন্দ প্রকাশ করে বলেন —

> ''তোমার পঢ়ুয়া সব তোমার অবধি।
> পুঁথি কেহো নাহি মিলে ব্রহ্মা বোলে যদি।। ১২০''[২৩৪]

অর্থাৎ, অধ্যাপক চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর শিষ্যদের এতই আনুগত্য ছিল যে, তারা অন্য কোনো পণ্ডিত-অধ্যাপকের কাছে শিক্ষালাভ করতে রাজি ছিল না। পাশাপাশি, গঙ্গাদাসের চৈতন্যদেব-এর প্রতি এই উপরিউক্ত উদ্ধৃতি প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় চৈতন্যদেবের পাণ্ডিত্য এবং অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি তৎকালীন নবদ্বীপ সমাজে কত ব্যাপক ছিল। এরপর, চৈতন্যদেব মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উপনীত হন। এই চণ্ডীমণ্ডপেই চৈতন্যদেব গয়া তীর্থ পরিভ্রমণের পূর্বে অধ্যাপনা কার্য করতেন। চৈতন্যদেবকে দেখে মুকুন্দ ভবনের সকলেই আনন্দিত ও বিস্মিত হন। কারণ পূর্বের ন্যায় বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের কারণে ঔদ্ধত্য ভাবের কোনো লক্ষণ আর প্রকাশিত হয় না চৈতন্যদেবের মধ্যে। কবি বৃন্দাবন দাস প্রসঙ্গত নিজেই বলেছেন —

> ''পুর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
> পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ।। ১৩০''[২৩৫]

অর্থাৎ, বাস্তব সংসারের প্রতি চরম অনাসক্তি প্রকাশ পায় চৈতন্যদেবের চরিত্রে। চৈতন্যদেবের সাংসারিক ব্যাপারে এরূপ ঔদাসীন্য মনোভাব দেখে শচীমাতাও চিন্তিত হন। তিনি মনে মনে ভাবেন, হয়তো দাদা বিশ্বরূপের মত নিমাইও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। আর তাই পুত্রের সংসারের প্রতি মনকে নিবিষ্ট করবার জন্য শচীমাতা 'গঙ্গাপূজা' যেমন করেন, তেমনি পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও চৈতন্যদেবের সামনে নিয়ে এসে উপস্থিত করান। কিন্তু চৈতন্যদেব কৃষ্ণ প্রেমাবেশে এতই মোহিত যে, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না। অর্থাৎ, ভগবৎ কৃষ্ণ প্রেমে চৈতন্যদেব এতই বিভোর যে, অন্য কোনও বিষয়ের প্রতি তাঁর মনে কোনো স্থান নেই। আর তাই, কৃষ্ণপ্রেমাবেশের কারণে চৈতন্যদেব রাত্রে ঘুমের ঘোরেও কৃষ্ণবিরহে কখনো উঠে বসেন, কখনো উঠে দাঁড়ান, আবার কখনো বা মাটিতে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে যান।

এভাবে, চৈতন্যদেব কৃষ্ণবিরহে কোনো প্রকারে রাত্রিবাস করলেও, পরদিন সকালে একটু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়ে গঙ্গাস্নানে গমন করেন। গঙ্গাস্নান করে চৈতন্যদেব শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের আদেশে এবং শিষ্যদের অনুরোধে অধ্যাপনা কার্যে পুনরায় নিয়োজিত হন। কিন্তু তাঁর পক্ষে শিষ্যদের

কাছে ব্যাকরণের সূত্রাদি পূর্বের মতো ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। কারণ চৈতন্যদেব এই সময় ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মোহিত। তিনি তাই শিষ্যদের শিক্ষাদানের ছলনায় আসলে কৃষ্ণ ভজনের আবশ্যিকতা প্রকাশ করেন। আর তাই কবি বৃন্দাবন দাস বলেন —

''আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান।

সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম।। ১৪৪''[২৩৬]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের মতে সর্ব শাস্ত্রেরই মূল কথা হল কৃষ্ণ। আর নাম ও নামী অভিন্ন বলে কৃষ্ণের মতই 'কৃষ্ণনাম'ও সর্বকালের সত্য। এছাড়া আগম, বেদান্ত প্রভৃতি যত দর্শনশাস্ত্র রয়েছে, প্রত্যেক ভারতীয় দর্শনেই কৃষ্ণভক্তিতে নিজেকে সমর্পণের কথাই বলা হয়েছে। আর এই কারণে চৈতন্যদেবও শিষ্যদের কাছে সর্ব-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বলতে বাধ্য হন —

''শুন ভাই সব! সত্য আমার বচন।

ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম ধন।। ১৬২''[২৩৭]

লক্ষণীয়, এখানে চৈতন্যদেবের দার্শনিক ঋদ্ধতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। চৈতন্যদেবের যে কৃষ্ণপ্রেমাবেশ বা ভগবৎ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তা দার্শনিকতায় উন্নীত হয়েছে বলেই মনে হয়। আর এই কারণেই চৈতন্যদেব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে এত দৃঢ়ভাবে বলতে পেরেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সত্য ও পরমব্রহ্ম। চৈতন্যদেবের এই অভিনব দার্শনিক ভগবৎ প্রেমবিহ্বল ব্যাখ্যা শুনে শিষ্যরাও মোহিত হন ঠিকই, কিন্তু তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। এরপর, চৈতন্যদেব বাহ্য-দৃষ্টি ফিরে পেয়ে শিষ্যদের কাছে স্বীয় ভাবাবেশ প্রকাশ পাওয়ায় লজ্জিত হন এবং শিষ্যদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান। সকল শিষ্যগণও চৈতন্যদেবের সঙ্গে পরমানন্দে গঙ্গাস্নান করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যান। চৈতন্যদেব নিজেও গঙ্গাস্নান করে ঘরে ফিরে আসেন এবং তুলসীমঞ্চে জলদান করে শাস্ত্রমতে গোবিন্দ পূজা করেন। এরপর, মাতা শচীদেবী চৈতন্যদেবকে ভোজন করাতে বসান এবং তিনি আজ শিষ্যদের কাছে কি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন তা জানতে চান। মাতা শচীদেবীর এরূপ প্রশ্নের উত্তরে চৈতন্যদেব বলেন —

''প্রভু বোলে, 'আজি পঢ়িলাঙ কৃষ্ণনাম।

সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণ-ধাম।। ১৯০

সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।

সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন।।' ১৯১''[২৩৮]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব মাতা শচীদেবীর কাছে পুনরায় কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন। অবশ্য চৈতন্যদেবের এই ভগবৎ জ্ঞান এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নিজেকে সমর্পণ দার্শনিকতা বোধে উন্নীত বলেই মনে হয়। শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেব মাতা শচীদেবীর কাছে আরও বলেন —

''চণ্ডাল চণ্ডাল নহে — যদি কৃষ্ণ বোলে।

বিপ্র নহে বিপ্র — যদি অসৎপথে চলে।। ১৯৩”[২৩৯]

লক্ষণীয়, মাতা শচীদেবীর কাছে চৈতন্যদেবের এই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা চৈতন্যদর্শনেরই পরিচয় পেয়ে থাকি। চৈতন্যদর্শনেরই মূল কথা হল এটাই যে, কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও একজন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক উচ্চে। আর একজন ব্রাহ্মণ যদি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ না হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ হয়েও চণ্ডালের চেয়ে অনেক নীচে। মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে চৈতন্যদেবের এই দার্শনিক বোধ সত্যিই ‘চৈতন্য রেনেসাঁ’-র সৃষ্টি করতে পেরেছিল সেদিন। আর তাই চৈতন্যদেব আমাদের কাছে শুধু অবতারকল্প হয়ে রইলেন না, হয়ে উঠলেন সমাজ সংস্কারক। যিনি এই ‘হরিনাম’ প্রচারের মধ্য দিয়ে সমাজের জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন ঘটালেন এবং ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু সকল বর্ণের ও ধর্মের মানুষকে একাসনে বসালেন। চৈতন্যদেব তাই মাতা শচীদেবীকে বলেন —

“শুন শুন মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ।। ১৯৫”[২৪০]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জগতের জীবমাত্রেরই সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। আর তাই, যে লোক শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে না, তিনি পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর কবলে পতিত হন এবং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেন। জীবের এই জন্ম এবং মৃত্যুর কষ্ট বর্ণনার মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেব মাতা শচীদেবীর কাছে ‘জীবতত্ত্ব’-এর ব্যাখ্যা করেন। মার্তৃগর্ভাবস্থায় জীব কীভাবে নিদারুণ যন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করে এবং ভূমিষ্ঠ হলেই এই বাহ্যিক সংসারের মিথ্যা মায়ায় তা বেমালুম ভুলে যায়,— তা বর্ণনা করে চৈতন্যদেব মাতা শচীদেবীকে বলেন —

“এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত ‘কৃষ্ণ’ মাতা! মুখে বোল ‘হরি’।। ২৩২”[২৪১]

এভাবে, চৈতন্যদেব মাতা শচীদেবীর কাছে ‘জীবতত্ত্ব’ বর্ণনা করে কৃষ্ণভক্তির যে মহিমা কীর্তন প্রকাশ করেন তাতে তাঁর দার্শনিক ঋদ্ধতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। চৈতন্যদেবের এই ‘জীবতত্ত্ব’ সম্পর্কিত অভিনব ব্যাখ্যা শুনে মাতা শচীদেবীও পরমানন্দ লাভ করেন। চৈতন্যদেব এরূপ ভাবে সবসময় কৃষ্ণনামে মোহিত দেখে আবার তৎকালীন বৈষ্ণবেরা পরমানন্দ প্রকাশ করেন এবং মনে মনে ভাবেন—

“খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরী হইলা প্রকাশ।। ২৩৯”[২৪২]

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, সকল বৈষ্ণবদের মত কবি বৃন্দাবন দাসও চৈতন্যদেবের এই মানসিক ভক্তিপথে পরিবর্তিত হতে দেখে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন —

“যে প্রভু আছিলা ভোলা মহা বিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ বিনু আর কিছু নাহি বাসে।। ২৪২” [২৪৩]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের এই যে জ্ঞানমার্গ থেকে ভক্তিমার্গে উন্নীত হওয়া এটা সকলের কাছেই ছিল বিস্ময়ের ব্যাপার। চৈতন্যদেবের শিষ্যগণও অধ্যাপকের এই মানসিক পরিবর্তনকে সহজে বুঝে উঠতে পারেন নি। তারা পণ্ডিত অধ্যাপককে শাস্ত্র এবং ব্যাকরণের টীকা ব্যাখ্যার ব্যাপারে যাই জিজ্ঞাসা করুক না কেন, চৈতন্যদেব সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণে শরণ গ্রহণ করতে বলেন। প্রত্যেকটি শব্দ এবং প্রতিশব্দের অভিপ্রায় তাঁর কাছে কৃষ্ণে সর্মপণ দেখতে পেয়ে বিশষ্যগণ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে অভিযোগ জানান। শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত তখন শিষ্য চৈতন্যদেবকে ডেকে বলেন —

''উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার
তুমিহ পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার।। ২৬৭
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্ত হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয়? ২৬৮
ইহা জানি ভালমতে কর' অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।। ২৬৯''[২৪৪]

অর্থাৎ, গঙ্গাদাস পণ্ডিত চৈতন্যদেবকে বলেন, শাস্ত্র এবং সঠিক বিচারের দ্বারা অধ্যয়নের ফলে উপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, বৈষ্ণব হওয়া যায় এবং বৈষ্ণব ব্রাহ্মণও হওয়া যায়। তাই শাস্ত্রাধ্যয়নের উদ্দেশ্যই হল, বিচার বুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করা। এই কারণে গঙ্গাদাস পণ্ডিত চৈতন্যদেবকে আদেশ করেন —

''ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পঢ়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর, মোর মাথা খাও।। ২৭১''[২৪৫]

নিজ শিক্ষাগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের এরূপ আদেশ পেয়ে চৈতন্যদেব বলেন —

''নগরে বসিয়া এই পঢ়াইব গিয়া।
দেখি কার শক্তি আছে দূষুক্ আসিয়া? ২৭৪''[২৪৬]

এবার চৈতন্যদেব নিজ শিষ্যগণ সহকারে নবদ্বীপ-নগরবাসীর দ্বারের সম্মুখে উপবেশন করে ব্যাকরণ-সূত্রের প্রথমে একরকম অর্থ করেন, পরে আবার সেই অর্থ খণ্ডন করে পুনরায় নতুন অর্থের স্থাপন করেন। চৈতন্যদেবের এই পাণ্ডিত্যের পুনরায় যে বহিঃপ্রকাশ তা খণ্ডন করতে পারে এমন কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি তৎকালীন নবদ্বীপ সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এরপর কবি বৃন্দাবন দাস 'মধ্যখণ্ড'-এর এই প্রথম অধ্যায়েই 'রত্নগর্ভ-আচার্য্য' নামে এক পণ্ডিত কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' গ্রন্থ যে অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে পাঠ করতেন তার পরিচয় দিয়ে কবি বলেন —

''ভক্তিযোগ শ্লোক পঢ়ে পরম সন্তোষে।

প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশে।। ২৯২”[২৪৭]

অর্থাৎ, রত্নগর্ভ আচার্য যে ‘পরম সন্তোষে’ ‘শ্রীমদ্‌ভাগবত’ গ্রন্থের ভক্তিযোগ ব্যঞ্জক শ্লোকগুলি উচ্চারণ করতেন একথা চৈতন্যদেব শুনতে পান। আর তাই চৈতন্যদেব রত্নগর্ভ আচার্যের কাছে গিয়ে ভক্তির প্রভাব জ্ঞাপক ‘ভাগবত’-এর শ্লোকগুলি শোনা মাত্রই কৃষ্ণপ্রেমাবেশে লিপ্ত হন এবং অবিরাম প্রেমাশ্রু বর্ষণ করতে থাকেন। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণবিরহে এরূপ প্রেমাশ্রু দেখে রত্নগর্ভ আচার্য কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি পরম ভক্তিভরে আবৃত্তি করেন এবং পরমানন্দ লাভ করেন। এরপর কবি বৃন্দাবন দাস আমাদের জানান —

“প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে।

বন্দী হৈলা বিপ্র চৈতন্যের প্রেমফান্দে।। ৩০১”[২৪৮]

এভাবে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মোহিত থাকার পর বাহ্যজ্ঞান ফিরে পান এবং পঢ়ুয়াদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে গিয়ে উপনীত হন। লক্ষণীয় এই সময় কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে সহজেই পুনরায় বোধগম্য হয় যে, তিনি কৃষ্ণের অবতারকল্প হিসাবেই চৈতন্যদেবকে চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন। আর তাই চৈতন্যদেবের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বৃন্দাবন দাস বলেন —

“যমুনার তীরে যেন বেঢ়ি গোপগণ।

নানা রস করিলেন নন্দের নন্দন।। ৩১০

সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।

ভকত সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিহরে।। ৩১১” [২৪৯]

সুতরাং, সহজেই বোঝা যায়, দ্বাপরের কৃষ্ণই যে কলিযুগে চৈতন্য অবতারকল্প হিসাবে আর্বিভূত হয়েছেন, এরূপ ভক্তির বিশ্বাস নিয়েই বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ ‘চৈতন্যভাগবত’ প্রণয়ন করেছিলেন।

এরপর কবি পুনরায় চৈতন্যদেবের শিষ্যদের কাছে অধ্যাপনার পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাপক রূপে চৈতন্যদেব বার বার শাস্ত্র এবং ব্যাকরণের ব্যাখ্যায় কৃষ্ণ ভক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন কৃষ্ণপ্রেমাবেশের কারণে। শিষ্যরা চৈতন্যদেবের কাছে ধাতু কাকে বলে? কিংবা ধাতুর স্বরূপ কি? প্রভৃতি ব্যাকরণ বিষয়ক প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন — ‘শ্রীকৃষ্ণের শক্তি’-ই হল ধাতু। কারণ —

“সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।

তাহা সনে করে স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি। ৩২২”[২৫০]

অর্থাৎ চৈতন্যদেবের মতে, সমস্ত জীবের শরীরেই ধাতুরূপে বা জীবনী শক্তিরূপে কৃষ্ণশক্তি বিরাজিত। জীবের দেহ থেকে এই ধাতু রূপ কৃষ্ণশক্তি চলে গেলে, জীবদেহকে তখন আর কেউ সমাদর করে না। যতদিন জীবের দেহে জীবাত্মা থাকে, ততদিনই জীব জীবিত থাকতে পারে। সুতরাং ধাতুরূপে কৃষ্ণশক্তিই

হল চৈতন্যদেবের মতে জীবাত্মার প্রকাশ। চৈতন্যদেবের জীবাত্মা সম্পর্কিত এই অভিনব দার্শনিক ব্যাখ্যা কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিই খণ্ডন করতে পারেন না। চৈতন্যদেব যে শুধুমাত্র পণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন না, পাশাপাশি তিনি যে কত বড় মাপের দার্শনিক ছিলেন তা এই জীবদেহে অবস্থিত ধাতুরূপ জীবনীশক্তি সম্পর্কিত অভিনব ব্যাখ্যা থেকেই অনুভব করা যায়। আসলে এই 'জীবাত্মা' হল শ্রীকৃষ্ণেরই চেতনাময়ী শক্তি। একারণে চৈতন্যদেব পড়ুয়াদের বলেন —

> ''এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
> হেন কৃষ্ণ ভাইসব! কর দৃঢ় ভক্তি।। ৩২৭
> বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
> অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর' ধ্যান।। ৩২৮''[২৫১]

এভাবে চৈতন্যদেব সকল শিষ্যগণকে কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি নিবেদিত করে কৃষ্ণে সমর্পিত হতে বলেন। শিষ্যগণের প্রতি এরূপ আদেশ করে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ থেকে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন এবং নিজেই লজ্জিত হন। পরে সকল বৃত্তান্ত অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ব্যাকুলতার কথা শিষ্যগণের মুখে শুনে চৈতন্যদেব স্থির করলেন —

> ''তোমা' সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
> আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার।। ৩৬৯''[২৫২]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব শিষ্যগণকে বলেন, তিনি আর অধ্যাপনা করতে পারবেন না। সুতরাং পড়ুয়ারা যাঁর কাছে খুশি নির্ভয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে। কারণ — কৃষ্ণময় চিন্তা চৈতন্যদেবের ভাবরাজ্যে এতই বিরাজিত যে, অন্য কিছু চিন্তন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু শিষ্যগণও চৈতন্যদেবকে জানিয়ে দেন, তারা তাঁর কাছ থেকে এতদিন যে শিক্ষালাভ করেছেন তারপর আর তাদের শিক্ষা লাভের প্রয়োজন নেই। এভাবে, কৃষ্ণপ্রেমাবেশের কারণে চৈতন্যদেবের অধ্যাপনার পরিসমাপ্তি হওয়ায় কবি বৃন্দাবন দাসও বলতে বাধ্য হন —

> ''এই হৈতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
> সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ।। ৩৯৫''[২৫৩]

অর্থাৎ, এরপর থেকে চৈতন্যদেবের বিদ্যাবিলাসের অবসান ঘটে এবং সংকীর্তনের সূচনা হয়। সকল শিষ্যগণ সহকারে চৈতন্যদেব হাতে তালি দিয়ে সংকীর্তন করতে থাকেন —

> ''হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
> গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।। ৩৯৯''[২৫৪]

সুতরাং, সত্যিই লক্ষণীয় বিষয়, যে অধ্যাপক চৈতন্যদেব নিজের পাণ্ডিত্যের গর্বে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমাবেশে এতই মোহিত হন যে, সমগ্র নদীয়া নগরে কৃষ্ণবিরহে অধ্যাপনা ত্যাগ করে

সংকীর্তন করতে আরম্ভ করেন। চৈতন্যদেবের এই মানসিক পরিবর্তন সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। আর তাই চৈতন্যদেবকে দর্শন করতে সকল নদীয়া-নবদ্বীপবাসী ছুটে আসেন। প্রত্যেকেই চৈতন্যদেবের প্রেমবিহ্বল অশ্রুসিক্ত কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ভক্তি নিবেদিত হতে দেখে আনন্দিত হন। কবি বৃন্দাবন দাসও চৈতন্যদেবের এরূপ ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল হতে দেখে বলতে বাধ্য হন—

''যত উদ্ধতের সীমা এই বিশ্বম্ভর।

প্রেম দেখিলাঙ নারদাদির দুষ্কর।। ৪০৯

হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।

না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এবা কিবা হয়।। ৪১০''[২৫৫]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব এরূপ বিস্ময়ের পথ ধরেই জ্ঞানমার্গ থেকে ভক্তিমার্গে নিজেকে নিয়োজিত করে প্রকাশ করতে শুরু করেন।

'মধ্যখণ্ড'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি বৃন্দাবন দাস সূচনাতেই আমাদের জানান যে, চৈতন্যদেবের এই ভক্তিপথে মানসিক পরিবর্তন এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মোহিত হয়ে ব্যাকুলতার কথা বৈষ্ণব ভক্তগণ অদ্বৈত প্রভুর কাছে গিয়ে ব্যক্ত করেন। কিন্তু মহাশক্তিবলে অদ্বৈতপ্রভু আগেই চৈতন্যের অবতারণের কথা জেনেছিলেন। তাই বৈষ্ণবদের মুখে চৈতন্যের কৃষ্ণবিরহে প্রেম-বিকারের কথা শ্রবণ করে পরমানন্দ লাভ করেন তিনি। এরপর অদ্বৈত আচার্য বৈষ্ণবদের কাছে নিজের স্বপ্নযোগে গীতাপাঠের অর্থপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন —

''মোর আজুকার কথা শুন ভাইসব!

নিশিতে দেখিলুঁ আজি কিছু অনুভব।। ৮''[২৫৬]

অর্থাৎ, স্বপ্নে অদ্বৈতাচার্য প্রভু যা দেখেছেন এবং যা অনুভব করেছেন তাই বৈষ্ণবদের কাছে প্রকাশ করে তিনি বলেন— চৈতন্যদেবই আসলে শ্রীকৃষ্ণ। আর এটাই সত্য অর্থাৎ বাস্তব। কারণ তিনি স্বপ্নে দেখেছেন—

''চক্ষু মেলি চাহি দেখি— এই বিশ্বম্ভর।

দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর।। ১৯''[২৫৭]

লক্ষণীয়, অদ্বৈতাচার্য প্রভু কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে তাঁর এই স্বপ্নের কথা পূর্বে প্রকাশ করেন নি। যখন বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁর কাছে চৈতন্যের প্রেমবিকারের কথা উত্থাপন করেন, তখনই তিনি স্বপ্নে দৃষ্ট কথা ভক্তদের কাছে প্রকাশ করেন। সুতরাং, বোঝা যায়, অদ্বৈতাচার্যের এরূপ অনুভূতি হয়েছিল যে, চৈতন্যদেবের এই কৃষ্ণবিরহে প্রেম-বিকার আসলে 'হরিনাম' প্রচারের উদ্দেশ্যেই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই যে চৈতন্যদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, এরূপ সন্দেহ ভক্তদের মনে জাগতে পারে জেনে, অদ্বৈত প্রভু বলেন —

''যদি সত্য বস্তু হয় তবে এইখানে।

সভে আসিবেন এই বাসনার স্থানে।। ২৮''[২৫৮]

আসলে, অদ্বৈতাচার্য প্রভু নিজ স্বপ্ন কথন সম্পর্কে বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে যা বললেন, সেই সম্পর্কে সকলের সন্দেহ যাতে সম্যকরূপে দূরীভূত হয়, একারণে তিনি উপরে উদ্ধৃত উক্তিটি করতে বাধ্য হন। অদ্বৈত আচার্যের কাছে এরূপ অভিনব তথ্য শুনে সকল বৈষ্ণবেরা তাঁকে প্রণতি করে পরমানন্দে বাড়ি ফিরে যান।

এদিকে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশের কারণে বৈষ্ণবোচিত আচরণ প্রকাশ করতে শুরু করেন। 'আপনি আচরি ভক্তি' ধর্মের দ্বারা চৈতন্যদেব জীবকে শিক্ষা দিলেন যে কৃষ্ণগত প্রাণ বৈষ্ণবের কিরূপ বিনয় প্রকাশ করা উচিত। যে চৈতন্যদেব এতদিন পাণ্ডিত্যের গর্বে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলেন, তিনি ভক্তিভাবে আবেশে বৈষ্ণব ভক্তগণকে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চরণে নমস্কার করেন। কারণ চৈতন্যদেব মনে করতেন, কৃষ্ণভক্ত মানুষের সেবা করলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। তাই তিনি বৈষ্ণবদের বলেন —

''তোমরা সে পার' কৃষ্ণভজন দিবারে।

দাসে সেবিলে সে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে।। ৪১''[২৫৯]

চৈতন্যদেবের এরূপ প্রেমবিহ্বল ভক্তির আবেশ দেখে সকল বৈষ্ণবই তাঁকে কৃষ্ণভজন সম্বন্ধীয় আশীর্বাদ দান করেন। অনুরূপে, চৈতন্যদেবও বৈষ্ণবদের সেবাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এই কারণে কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের বিনয়ী ভাবের প্রকাশ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

''সাজি বহে, ধূতি বহে, লজ্জা নাহি করে।

সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হস্তে আসি ধরে।। ৫৭''[২৬০]

তবে, চৈতন্যদেবের এরূপ প্রেমবিহ্বল কৃষ্ণপ্রেমাবেশ দেখে তৎকালীন বৈষ্ণবেরা আবার আনন্দিতও হয়েছিলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন চৈতন্যদেবের কারণে সকল নবদ্বীপ-নদীয়া জুড়েই কৃষ্ণরসের প্লাবন প্রবাহিত হবে অতি সত্ত্বর। আর তাই এতদিন বৈষ্ণবদের দেখে যারা নিন্দে করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত, তাঁরাও এবার কৃষ্ণপ্রেমে লিপ্ত হবেন। আর এই কারণেই হয়তো বৈষ্ণবদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের মত পণ্ডিত অধ্যাপককে মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ভক্তিপথে নিয়োজিত করেছেন। এই কারণেই বৈষ্ণবেরা চৈতন্যদেবের কাছে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—

''কেহো না বাখানে বাপ! কৃষ্ণের কীর্ত্তন।

না করুক ব্যাখ্যা আরো নিন্দে সর্বক্ষণ।। ৬৮''[২৬১]

কিন্তু এই বৈষ্ণবদের মনে এটাই বিশ্বাস ছিল যে, চৈতন্যদেবের দ্বারাই এই অবৈষ্ণব পাষণ্ডীদের ক্ষয় হবে। এই কারণে চৈতন্যদেবকে আশীর্বাদ করে তাঁরা বলেন —

''তোমা হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।

মনেতে আমরা ইহা বুঝিল নিশ্চয়।। ৭২" [২৬২]

তবে লক্ষণীয়, বৈষ্ণবদের চৈতন্যদেবকে এই আশীর্বাদ দানের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সামাজিক চিত্রেরও পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। এক্ষেত্রে কবি বৃন্দাবন দাস বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা বৈষ্ণবদের অত্যাচারের তথা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের যে পরিচয় দান করেছেন, তা আমাদের তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় দেয়। আর তাই বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' শুধু জীবনীগ্রন্থ থাকে না, হয়ে ওঠে সামাজিক ইতিহাসের দলিল।

এদিকে বৈষ্ণবদের মুখে তাদের নিদারুন দুঃখ কথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে লিপ্ত হন বলে জানিয়েছেন কবি বৃন্দাবন দাস। তবে এই সময় চৈতন্যদেবের আচরণ উন্মাদের ন্যায়। তাই কবি চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমে ভাবাবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

"ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়।। ৮৭" [২৬৩]

শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ভাব-বিহ্বল হয়ে প্রেমাবিকার প্রকাশ করেন—

"আপনে আপনে কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বোলে 'ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা'।। ৯২
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চঢ়ে।
না মেলে লোচন, ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে।। ৯৩" [২৬৪]

সত্যিই লক্ষণীয় বিষয় যে, যতই চৈতন্যদেবের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ঘটেছে বলে আমরা মনে করি না কেন, কিন্তু প্রেমবিহ্বল হয়ে স্ত্রীকে মারতে যাওয়া, কিংবা গাছের ডালে চড়া— এসবই বায়ুরোগের লক্ষণ বলেই মনে হয়। কারণ বাস্তবিক এসব অস্বাভাবিক আচরণকে আমরা কৃষ্ণবিরহের প্রেমবিকার বলে মেনে নিতে পারি না।

চৈতন্যদেবের এরূপ কৃষ্ণপ্রেমাবেশ দেখে শচীমাতা কিছু বুঝে উঠতে না পেরে অত্যন্ত দুঃখিত হন। তাঁর দুঃখের করুণ চিত্রের যে বর্ণনা কবি বৃন্দাবন দাস দিয়েছেন, তা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সত্যিই একমাত্র অবশিষ্ট পুত্রের এরূপ অস্বাভাবিক আচরণে একজন স্বামীহারা মাতা যে কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হতে পারেন, তা শচী মাতার চরিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি বৃন্দাবন দাস। আর তাই শচীমাতা কিছু বুঝে উঠতে না পেরে যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই চৈতন্যদেবের অস্বাভাবিক আচরণের কথা ব্যক্ত করেন। বাহ্য ইন্দ্রিয় সুখে মোহিত লোকেরা যেই চৈতন্যদেবকে দেখে সেই রোগের লক্ষণ বলে মনে করে। শচীমাতাকে 'অবোধ ঠাকুরাণী' বলে সম্ভাষিত করে চৈতন্যদেবকে দেখতে আসা লোকেরা বলেন —

“পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।

দুই পা’য়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে।। ১০০”[২৬৫]

অর্থাৎ, গয়া গমনের পূর্বে অধ্যাপকরূপে বিদ্যাবিলাসের সময় যেমন চৈতন্যদেবের একবার কৃষ্ণবিরহে প্রেমবিকার দেখে সকলে বায়ুরোগ মনে করেছিল, তেমনি এখনকার কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মোহিত অবস্থাকেও বাহ্যিক ইন্দ্রয় সুখে নিয়োজিত লোকেরা বায়ুরোগের লক্ষণ বলেই মনে করেন। তাই শচীদেবীকে তাঁরা যেমন কেউ উপদেশ দেন ডাব কিংবা নারকেলের জল খাওয়াতে, তেমনি কেউ উপদেশ দেন ‘শিবাঘৃত’ বা ‘পাকতৈল’ মাথায় মাখতে।

চৈতন্যদেবের এরূপ অস্বাভাবিক প্রেমবিকার দেখে শচীমাতার যখন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা, তখন লোকমুখে চৈতন্যের আবেশের কথা শ্রবণ করে অন্যতম বৈষ্ণব শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁকে দেখতে আসেন। শ্রীবাস পণ্ডিতকে দর্শন করে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণবিরহে প্রেমবিকার আরও বর্ধিত হয়। কবি বৃন্দাবন দাস বলেন—

“ভক্ত দেখি প্রভুর বাঢ়িল ভক্তি-ভাব।

লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প, অনুরাগ।। ১০৮”[২৬৬]

অর্থাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতকে দেখতে পেয়ে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির ভাব আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু চৈতন্যদেবের এই প্রেমবিকার দেখে শ্রীবাস পণ্ডিত বুঝতে পারেন —

“অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে।

‘মহাভক্তিযোগ; বায়ু বোলে কোন্ জনে?’ ১১১”[২৬৭]

অর্থাৎ, শ্রীবাস পণ্ডিত বুঝতে পারেন, চৈতন্যদেবের এই অস্বাভাবিক আচরণ আসলে মহাভক্তিযোগের প্রকাশ। আর এই প্রেমের প্রভাবেই চৈতন্যদেব অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার করে চলেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের মুখে একথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব নিজেও আশ্বস্ত হন। কারণ — উন্মাদ বলে তাঁকে অনেক ব্যঙ্গ ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে। পুত্র কারণে শচীমাতাকে দুঃখের অতল সাগরে নিমজ্জিত হতে দেখে শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁকে প্রবোধ দান করে বলেন —

“ ‘বায়ু নহে — কৃষ্ণভক্তি’ বলিল তোমারে।

ইহা কভু অন্যজন বুঝিবারে নারে।। ১২২”[২৬৮]

এভাবে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মোহিত থেকে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। একদিন গদাধরকে সঙ্গে করে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে অদ্বৈত প্রভুর ভবনে আগমন করেন। তাঁরা গিয়ে দেখতে পেলেন অদ্বৈতাচার্য গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজো করছেন। অদ্বৈত প্রভুর এরূপ কৃষ্ণার্চন ও কৃষ্ণপ্রেম দেখে চৈতন্যদেবও কৃষ্ণবিরহে প্রেমাবিষ্টের কারণে ভাব-বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং মূর্ছা যান। তখন মহাভক্তিযোগের প্রভাবে অদ্বৈত আচার্য বুঝতে পারেন যে, এই চৈতন্যদেবই তাঁর প্রাণনাথ

শ্রীকৃষ্ণ। চৈতন্যদেবের এই স্বরূপতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে অদ্বৈত আচার্য তখন চৈতন্যদেবের চরণ পূজা করেন। কবি বৃন্দাবন দাস তাই প্রসঙ্গত বলেন —

> ''পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী লই সেই ঠাঞি।
> চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য্যগোসাঞি।। ১৩৫'' [২৬৯]

শুধু তাই নয়, নয়নের জলে অশ্রুসিক্ত অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর চোখের জলে চৈতন্য চরণযুগল ধৌত হয়ে যায়। কিন্তু গদাধর অদ্বৈত আচার্যের এরূপ বয়সে ছোট চৈতন্যদেবের চরণ-বন্দনা অসঙ্গত মনে করে বিস্ময় প্রকাশ করেন। অবশ্য চৈতন্যদেব নিজে অচৈতন্য অবস্থা থেকে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে অদ্বৈত আচার্যের কাছে কৃষ্ণভক্তির জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। এক্ষেত্রে চৈতন্যদেব অদ্বৈত প্রভুর প্রতি যে বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ করেছেন তা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণেও সহায়তা করে। অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যদেবের স্বরূপতত্ত্ব আত্মগোপনের চেষ্টাকে বুঝতে পেরে মনে মনে কৌতুকের হাসি হাসেন এবং তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য নবদ্বীপ গৃহ থেকে শান্তিপুরের গৃহে গমন করেন। কারণ তিনি বলেন—

> ''সত্য যদি প্রভু হয়ে, মুঞি হঙ দাস।
> তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ-পাশ।। ১৫৫'' [২৭০]

সুতরাং, বোঝা যায় চৈতন্যদেব তাঁর স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করছিলেন না বলে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরের গৃহের উদ্দেশ্যে গমন করেন। আসলে তিনি চান চৈতন্যদেবের স্বরূপতত্ত্ব সকল মানুষের কাছে প্রকাশ হোক। আর তাই অদ্বৈত প্রভুর এই কৌশল গ্রহণ।

এদিকে সকল বৈষ্ণবদের সঙ্গে চৈতন্যদেব কৃষ্ণসপ্রমাবেশে আবেগ বিহ্বল হয়ে অনুক্ষণ কীর্তন করতে থাকেন। সর্বক্ষণেই তাঁর মধ্যে কৃষ্ণবিরহের প্রেমাবেশ দেখে বৈষ্ণবদের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ হয়। কৃষ্ণপ্রেম বিরহে চৈতন্যদেব সর্বসময়েই প্রেমাশ্রু বর্ষণ করছেন দেখে এবং সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশ করছেন দেখে বৈষ্ণবেরা সন্দেহ করেন যে, চৈতন্যদেব নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ নন। কারণ — কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষেই এরূপ উন্মাদের ন্যায় কৃষ্ণপ্রেম বিরহে আবেশ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর তাই চৈতন্যদেবের এই কৃষ্ণপ্রেমবিকার প্রকাশ করতে দেখে তৎকালীন বৈষ্ণবেরা যা বলেছিলেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বৃন্দাবন দাস বলেন —

> ''কেহো বোলে, 'এ পুরুষ অংশ-অবতার।'
> কেহো বোলে, 'এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার।।' ১৬৮
> কেহো বোলে, 'শুক কিংবা প্রহ্লাদ নারদ।'
> কেহো বোলে, 'হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ।।' ১৬৯''[২৭১]

শুধু তাই নয়, কেউ কেউ চৈতন্যদেবের প্রেমবিকারের প্রকাশ দেখে যেমন ভাবলেন স্বয়ং কৃষ্ণই জন্মগ্রহণ

করেছেন, তেমনি আবার অনেকে অনুমান করেন, তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার। কিন্তু বৈষ্ণবদের কারো কোনো কথাতেই কর্ণপাত না করে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেম বিরহে কৃষ্ণদর্শনের জন্য আর্তি ও উৎকন্ঠা প্রকাশ করে চলেন সর্বসময়েই।

এরপর চৈতন্যদেব গয়াতীর্থ থেকে ফেরার পথে 'কানাঞ্রির নাটশালা' নামক এক গ্রামে বালক শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব সুন্দর শ্যামকান্তি রূপ পরিদর্শন করেছিলেন, তা বৈষ্ণবদের কাছে বর্ণনা করেন। লক্ষণীয়, চৈতন্যদেবের এই কাহিনি বর্ণনায় কবি বৃন্দাবন দাস বালক কৃষ্ণের যে অনুপম সুন্দর শ্যামকান্তি মূর্তি অঙ্কন করেছেন তা কবির কাব্যগুণের পরিচয় বহন করে। পাশাপাশি কবি যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তারও সাক্ষ্য বহন করে এই কাহিনি বর্ণনা। তবে, চৈতন্যদেব বৈষ্ণবদের কাছে এই বালক কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা ও তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গনের কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে পুনরায় কৃষ্ণপ্রেমাবেশে লিপ্ত হন এবং কৃষ্ণবিরহ যন্ত্রণায় 'হা কৃষ্ণ !' বলে কাঁদতে থাকেন। চৈতন্যদেবের মুখনিঃসৃত এই ভক্তিমূলক কৃষ্ণদর্শনের কাহিনি শ্রবণ করে সকল বৈষ্ণবেরাই নিজেকে ধন্য বলে মনে করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব কৃষ্ণবিরহে এতই ভাব-বিহ্বল হয়ে পড়েন যে, যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই 'কোথা কৃষ্ণ' বলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। একই রকম ভাবে চৈতন্যদেব একদিন গদাধরের কাছেও আর্তি প্রকাশ করেন কৃষ্ণ কোথায় বলে ? কোনও প্রকারে গদাধর তখন চৈতন্যদেবকে প্রবোধ দিয়ে বলেন—

> ''সম্ভ্রমে বোলেন গদাধর মহাশয়।
> 'নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়।।' ২০৩''[২৭২]

অর্থাৎ, কোনও প্রকারে গদাধর চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণবিরহের অস্থির অবস্থা থেকে সান্ত্বনা দান করেন। দূর থেকে শচীমাতা তা প্রত্যক্ষ করে গদাধরের প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হন। লক্ষণীয়, কবির দেওয়া এই বর্ণনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, চৈতন্যদেব গদাধরকে বড়ই স্নেহ করতেন। আর তাই বয়সে ছোট গদাধরই একমাত্র চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণবিরহের অস্থিরতা থেকে শান্ত করতে পারতেন।

এরপর কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের কীর্তনারম্ভের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন —

> ''আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-প্রকাশ।
> সকল-ভক্তের দুঃখ হয় দেখ নাশ।। ২২১''[২৭৩]

তবে, চৈতন্যদেবের এই কৃষ্ণকে প্রাপ্তির জন্য সমবেত কীর্তনারম্ভের প্রকাশ করতে দেখে বাহ্য ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত মানুষেরা নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন। এই অবৈষ্ণব মানুষদের নিজেদের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম বিরোধী বাক্যালাপে আমরা তৎকালীন সামাজিক চিত্রের পরিচয় পুনরায় পেয়ে থাকি। সুতরাং বোঝা যায়, বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সুখে নিয়োজিত এই মানুষেরা কৃষ্ণকীর্তনকে ঠিক মেনে নিতে পারে নি। চৈতন্যদেবের এই উচ্চকণ্ঠে কীর্তনারম্ভের মূলে তারা শ্রীবাস পণ্ডিতকেই দোষারোপ করে। আর তাই এই বাহ্যসুখে নিয়োজিত মানুষেরা কৃষ্ণকীর্তন বন্ধ করবার জন্য নদীয়া নগরে গুজব ছড়ায় যে,

কীর্তনকারীদের ধরে নিয়ে যেতে রাজার আজ্ঞায় দুইটি রাজ-নৌকা আসছে। একথা শ্রবণ করে শ্রীবাস পণ্ডিত ভয় পান। কারণ তখন বাংলার আধিপত্য দখল করেছিল যবন রাজারা। কবির দেওয়া এই বর্ণনা থেকেও আমরা যবন রাজাদের হিন্দু প্রজাদের প্রতি অত্যাচারের ইঙ্গিত পেয়ে থাকি।

কিন্তু চৈতন্যদেব শ্রীবাস পণ্ডিতের অন্তরের ভয়কে দুরীভূত করবার জন্য তাঁর গৃহে গিয়ে নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। শ্রীবাস পণ্ডিত যেখানে কৃষ্ণের নৃসিংহ মূর্তি পূজা করেন, সেখানে দেখতে পান—

''দেখে বীরাসনে বসি আছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ-শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধর।। ২৫৮''[২৭৪]

চৈতন্যদেবের এরূপ চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য দর্শন করে শ্রীবাস পণ্ডিত স্তব্ধ হয়ে যান। তিনি কোন কথাই স্ফুরিত করতে না পেরে শাস্ত্র থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে করজোড়ে স্তুতি করতে থাকেন চৈতন্যদেবের। চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রীবাস পণ্ডিতের যে স্তুতিপূর্ণ কতিপয় পয়ারের বর্ণনা দিয়েছেন কবি, তা পাঠ করে মনে হয় এই স্তুতি যেন বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যদেবের প্রতি। কবি এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের প্রতি যে বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ করেছেন তা বর্ণনার গুণে সত্যিই অনুপম হয়ে উঠেছে। তবে, চৈতন্যদেবকে স্তুতিমূলক বন্দনা করবার পাশাপাশি শ্রীবাস পণ্ডিত আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন —

''নানা মায়া করি তুমি আমারে বঞ্চিলা।
সাজি-ধুতি আদি করি আমরা বহিলা।। ২৮৩''[২৭৫]

অর্থাৎ, শ্রীবাস পণ্ডিত এতদিন ধরে চৈতন্যদেবকে কাছ থেকে পেয়েও ভজন করতে না পাওয়ার কারণে আক্ষেপ প্রকাশ করলে চৈতন্যদেবের কৃপা হয়। তিনি তখন স্বরূপ বেশেই শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলেন —

''স্ত্রী-পুত্র আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ, করহ বাহির।। ২৯৩''[২৭৬]

শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেব শ্রীবাস পণ্ডিতকে আশির্বাদ দান করে যেমন বর চাইতে বলেন, তেমনি যবন রাজার ভয় দুরীভূত করতে আশ্বস্ত করেন। কারণ হিসাবে চৈতন্যদেব বলেন, তিনি নিজে গিয়ে প্রয়োজনবোধে যবন রাজার কাছে স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করবেন। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে চৈতন্যদেব যবন রাজার কাছে গিয়ে নিজের স্বরূপগত প্রভাব সম্পর্কে যা বলবেন বলে জানিয়েছেন কবি বৃন্দাবন দাসের তাতে বৈষ্ণবোচিত অতিশয়োক্তি প্রকাশ পেয়েছে বলেই মনে হয়।

এভাবে চৈতন্যদেব যখন নিজ স্বরূপগত প্রভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য— প্রেমদাতৃত্ব রাজাকে প্রদানের বিষয়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়িতে আলোচনা করছেন তখন দেখতে পান সম্মুখে একটি বালিকা বসে। সেই বালিকার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বৃন্দাবন দাস বলেন —

''সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা — নাম 'নারায়ণী'।। ৩১৮

অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।

'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'।। ৩১৯"[২৭৭]

অর্থাৎ, শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুস্পুত্রী ছিলেন এই 'নারায়ণী'। আমরা জানি, কবি বৃন্দাবন দাসের মাতা ছিলেন ইনি। তবে, কবি পয়ারে 'অদ্যাপিহ' শব্দটি যখন প্রয়োগ করেছেন, তখন বুঝতে পারি 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি লেখার সময় তিনি প্রকট ছিলেন না। আবার, 'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী'— এই উক্তিটি কবির প্রয়োগ থেকে বুঝতে পারি, তিনি নারায়ণী দেবীর পরম সৌভাগ্যের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। তবে, নারায়ণী দেবীর সেই সৌভাগ্যটি কি তা কবি এক্ষেত্রে প্রকাশ করেন নি।

যাই হোক, এই নারায়ণী দেবীই চার বছর বয়সের সময়ে চৈতন্যদেবের আদেশে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হয়ে 'হা কৃষ্ণ!' বলে কেঁদে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণ প্রেমের কারণে অতি শৈশবেই নারায়ণী প্রেমাশ্রু ধারাও নির্গত করেছিলেন অবিরত ভাবে।

এরপর কবি শ্রীবাস পণ্ডিতের উদার চরিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন —

"কৃষ্ণ-অবতার যেন বাসুদেবঘরে।

যতেক বিহার সব-নন্দের মন্দিরে।। ৩৩০

জগন্নাথঘরে হৈল এই অবতার।

শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহে সকল বিহার।। ৩৩১"[২৭৮]

অর্থাৎ, কৃষ্ণের বাসুদেব ঘরে জন্ম হলেও যেমন নন্দ রাজার গৃহেই তাঁর সমস্ত লীলা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি চৈতন্যদেবের জগন্নাথ ঘরে জন্ম হলেও শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই তাঁর সকল স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, কবি বৃন্দাবন দাস আমাদের বলতে চান চৈতন্যদেবের এই ঐশ্বর্য প্রকাশ আসলে স্বরূপতত্ত্ব সম্পর্কে পরিচয় জ্ঞাপনের কারণেই। তবে, স্বরূপতত্ত্ব সম্পর্কে চৈতন্যদেব কারো কাছে কিছু প্রকাশ করতে না করলেন শ্রীবাস পণ্ডিতকে। কবি বৃন্দাবন দাস এভাবে চৈতন্যদেবের স্বরূপতত্ত্বের প্রকাশ ও সঙ্কীর্তনারম্ভের পরিচয় দান করে 'মধ্যখণ্ড'-এর 'দ্বিতীয় অধ্যায়'-এর পরিসমাপ্তিতে বলেন—

"মধ্যখণ্ড কথা ভাই! শুন একচিত্তে।

বৎসরেক কীর্ত্তন করিলা যেনমতে।। ৩৪৩"[২৭৯]

কবি, বৃন্দাবন দাসের এই পয়ারটির উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, চৈতন্যদেব গয়া তীর্থ পরিভ্রমণ করে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এক বছর প্রতিদিন রাত্রিবেলায় শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এই সঙ্কীর্তন করেছিলেন।

'মধ্যখণ্ড'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে সূচনাতেই কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমে বিমোহিত নানাবিধ আবেশের বর্ণনা দান করেছেন। কৃষ্ণ বিরহে চৈতন্যদেব সকল সেবক বৈষ্ণবের কাছে নিরন্তর অশ্রু বর্ষণ করতেন। একারণে কবি চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমাবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

"এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই সর্ব্ব-অনুচর।। ৩
প্রাণ হেন সকল সেবক আপনার।
কৃষ্ণ বলি কান্দে গলা ধরিয়া সভার।। ৪"[২৮০]

কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মোহিত চৈতন্যদেব এমনিভাবে একদিন ভগবান কৃষ্ণের বরাহ রূপের মহিমাপূর্ণ শ্লোক শুনে নিজে বরাহের ভাবে আবিষ্ট হয়ে গর্জন করতে করতে মুরারি গুপ্তের গৃহের দিকে যান। মুরারি গুপ্ত তখন চৈতন্যদেবের চরণ বন্দনা করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব স্বীয় বরাহ-স্বরূপের ভাবে আবিষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে মুরারি গুপ্ত কোন কথা বলতে না পেরে তাঁর স্তব করতে শুরু করেন। আর চৈতন্যদেব বেদকথিত নিজ স্বরূপ-তত্ত্বাদি ব্যাখ্যা করেন মুরারি গুপ্তের কাছে —

"আমি যজ্ঞবরাহ-সকল বেদ সার।
আমি সে করিলুঁ পূর্ব পৃথিবী-উদ্ধার।। ৪২
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোর অবতার।
ভক্ত-জন রাখি দুষ্ট করিমু সংহার।। ৪৩"[২৮১]

লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে কবি বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের স্বরূপ-তত্ত্ব ব্যাখ্যায় 'পুরাণ'-প্রসঙ্গের যে উল্লেখ করেছেন, তা থেকে কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে থাকি।

চৈতন্যদেব এভাবে সকল বৈষ্ণব ভক্ত সঙ্গে মহানন্দে অহর্নিশি কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে থাকেন। চৈতন্যদেবের মহিমা নবদ্বীপ-নদীয়ায় প্রচারিত হয়ে যাওয়ায় বাহ্য ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভয়ে বৈষ্ণব ভক্তরা আর ভীত হয়ে থাকলেন না। তারা উচ্চস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্তন করতে থাকেন। এরূপ বর্ণনার পর কবি প্রসঙ্গক্রমে নিজ গুরু নিত্যানন্দের কথা উত্থাপন করে বলেন —

"প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দ আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম-কর্ম্ম কিছু কহি তান।। ৬০"[২৮২]

উল্লেখ্য যে, কবি পূর্বে 'আদিখণ্ড'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিত্যানন্দের জন্ম-বংশ পরিচয়ের যেরূপ বর্ণনা করেছিলেন এখানেও তার পুনরুক্তি লক্ষ করা যায়। কবি পুনরায় আমাদের জানান, রাঢ়বঙ্গের একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হাড়াই-পণ্ডিত ও মাতা পদ্মাবতীদেবীর পুত্রদের মধ্যে নিত্যানন্দ ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। অবশ্য কবি নিজেই স্বীকার করেছেন যে —

"তান বাল্যলীলা আদিখণ্ডে সে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর।। ৬৭"[২৮৩]

তাই কবি নিত্যানন্দের বাল্যলীলার বর্ণনা এখানে না করে তাঁর সন্ন্যাসযাত্রার বর্ণনা করেন। একদিন এক সুদর্শন সন্ন্যাসী হাড়াই-পণ্ডিতের ঘরে আসেন ভিক্ষা লাভের জন্য। সারারাত্রি তাঁর সঙ্গে হাড়াই-পণ্ডিত

পরম আনন্দে কৃষ্ণকথা বলবার পর, পরদিন সকালে সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ-পিতাকে বলেন— ‘‘এক ভিক্ষা আছয়ে আমার।’’ উত্তরে হাড়াই পণ্ডিত বলেন — ‘‘যে ইচ্ছা তোমার।।’’ এরপর সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে তাঁর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ করবার জন্য নিয়ে যেতে চান বলে কবি জানান। মহাবিপদের সম্মুখীন হলেও হাড়াই পণ্ডিত স্ববাক্যলঙ্ঘন জনিত পাপের আশঙ্কায় নিত্যানন্দকে তাঁর হাতে তুলে দেন। কবি প্রসঙ্গক্রমেই এরপর বলেন —

> ‘‘নিত্যানন্দ লই চলিলেন ন্যাসিবর।
> হেনমতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর।। ৯৫’’[২৮৪]

কিন্তু নিত্যানন্দ সন্ন্যাস যাত্রা করবার পর পিতা হাড়াই পণ্ডিত ও মাতা পদ্মাবতীদেবীর যে বেদনাদীর্ণ করুণ বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা পাঠকবর্গকেও অশ্রুসিক্ত করে তোলে। তবে, কবি নিজেই বলেছেন, পরমার্থভূত বস্তুর জন্য স্বজনবর্গের থেকে ত্যাগ আসলে ত্যাগ নয়। আর তাই নিত্যানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর তীর্থ ভ্রমণ করতে থাকেন পরমানন্দে। কবি নিত্যানন্দের তীর্থস্থান ভ্রমণের বর্ণনা দান করেছেন বেশ কয়েকটি পয়ার জুড়ে—

> ‘‘গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, দ্বারাবতী।
> নরনারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি।। ১০৮
> বৌদ্ধাশ্রম দিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
> রঙ্গনাথ, সেতুবন্ধ, গেলেন মলয়।। ১০৯
> তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয়।
> ভ্রমেন নির্জ্জন-বনে পরম-নির্ভয়।। ১১০
> গোমতী, গণ্ডকী, গেলা সরযূ কাবেরী।
> অযোধ্যা, দণ্ডকবন বুলেন বিহরি।। ১১১
> ত্রমল্ল, বেঙ্কটনাথ, সপ্তগোদাবরী।
> মহেশ্বর স্থান গেলা কন্যকানগরী।। ১১২
> রেবা মাহিষ্মতী, মনু তীর্থ, হরিদ্বার।
> যহিঁ পূর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গার।। ১১৩’’[২৮৫]

লক্ষণীয়, নিত্যানন্দের এই তীর্থযাত্রার অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা থেকে আমরা কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে থাকি। এভাবে নিত্যানন্দ বিভিন্ন তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে পুনরায় মথুরা তথা বৃন্দাবনে আসেন। কবি এখানে নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার হিসাবেই চিত্রায়িত করেছেন। নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে আবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণবিরহে যখন বৃন্দাবনে অবস্থান করছিলেন, তখনই তিনি জানতে পারেন নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আত্মপ্রকাশের কথা। আর তাই নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের সঙ্গে

সাক্ষাতের জন্য নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের গৃহে আশ্রয় নেন। এখানে কবি বৃন্দাবন দাস নন্দনাচার্যের দৃষ্টিতে নিত্যানন্দের যে রূপ বর্ণনা করেছেন, তা সত্যিই অনুপম হয়ে উঠেছে। বিশেষভাবে কবির উপমা-অলংকার প্রয়োগ এখানে লক্ষণীয়। নিজ গুরুদেবের প্রতি কবি এখানে যে স্তুতিপূর্ণ পয়ার ব্যবহার করেছেন তা ভক্তিসমন্বিত হলেও কাব্যগুণান্বিত হয়ে উঠেছে।

এদিকে চৈতন্যদেবও নিত্যানন্দের আগমন বার্তা শ্রবণ করেন। তিনি অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন নিত্যানন্দ আগমনের। তার এই স্বপ্ন দর্শনের কথা বৈষ্ণবভক্তদের কাছে বর্ণনা করে চৈতন্যদেব হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে পাঠান নিত্যানন্দের সন্ধানে নবদ্বীপে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে কবি বৃন্দাবন দাস এখানেও নিজ গুরু নিত্যানন্দের প্রতি বৈষ্ণব বিনয় সূচক প্রশস্তিতে বলেছেন —

''এই অবতারে কেহো গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ নাম শুনি উঠিয়া পলায়।। ১৬৯
পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে' শঙ্কর।
এই পাকে অনেক যাইব যম-ঘর।। ১৭০''[২৮৬]

অর্থাৎ কবি এখানে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ আসলে যে অভেদ — এই তত্ত্বই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। উভয়ের কৃপা ব্যতীত যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভব নয় — একথাই বলেছেন কবি। পাশাপাশি নিজ গুরুদেবের প্রতি কবির এই বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ দেখে মনে হয়, বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে হয়তো নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের মত সমানভাবে সমাদৃত ছিলেন না। আর তাই কবির বৈষ্ণব ভক্তদের প্রতি নিজ গুরুদেব সম্পর্কিত এরূপ উক্তি। হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিত নিত্যানন্দকে নবদ্বীপের কোথাও খুঁজে না পেয়ে ফিরে এলে চৈতন্যদেব নিজে সকল বৈষ্ণব ভক্ত সঙ্গে নন্দন আচার্যের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানেই নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এরপর কবি 'মধ্যখণ্ড' এর তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ অংশে চৈতন্যদেবের যে অপূর্ব রূপ ও দেহ লাবণ্যকান্তির বর্ণনা দান করেছেন তা কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্যবোধের পরিচায়ক।

'মধ্যখণ্ড'-এর চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনাতে কবি বৃন্দাবন দাস জানান, নিত্যানন্দের সম্মুখে দণ্ডায়মান চৈতন্যদেবকে দেখেই তিনি চিনতে পারেন, এই তাঁর প্রাণের ঈশ্বর। আর তাই —

''হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চায়।। ২''[২৮৭]

শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবের রূপে বিমোহিত নিত্যানন্দ প্রেমোন্মত্ততায় অবিরত আবেগাশ্রু বর্ষণ করেন। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের এরূপ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে উন্মত্ত অবস্থা দেখে তাকে নিজ কোলে স্থান দেন। কবি উভয়ের এই কৃষ্ণপ্রেমাবেশে পরস্পর আলিঙ্গনকে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে উপমায়িত করেন। চৈতন্যদেব নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন নিত্যানন্দের মত প্রেমভক্তিপূর্ণ বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ লাভ করতে

পেরে। চৈতন্যদেব তাই নিত্যানন্দকে বলেন —

"বুঝিলাম - ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ-শক্তি।

তোমা' ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি।। ৩৬"[২৮৮]

চৈতন্যদেবের নিত্যানন্দকে 'কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি-ধন' বলে যে উক্তি তা কবির নিজস্ব অভিব্যক্তি বলেই মনে হয়। তাছাড়া চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যে স্তুতি করেছেন তাঁর প্রতি, তাও কবির নিজ গুরুদেবের প্রতি স্বগত স্তুতিমূলক পয়ারসমূহ বলেই মনে হয়। আবার, লক্ষণীয়, নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবকে বলেন— তিনি নানা স্থানে তীর্থ ভ্রমণ করলেও কোথাও কৃষ্ণদর্শন করতে পারেন নি। কারণ তিনি শুনেছেন— কৃষ্ণই গৌড়দেশে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এভাবে এই অধ্যায়ে কবি বৃন্দাবন দাস যেমন 'চৈতন্যতত্ত্ব' ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি নিত্যানন্দই যে আসলে বলরামের অবতার বা 'অনন্তদেব' — এই 'নিত্যানন্দতত্ত্ব'-ও ব্যাখ্যা করেছেন। তবে, এই অধ্যায়ে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে, চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ পরস্পর পরস্পরের স্তুতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ সমাপন করেছেন। এই অধ্যায়ের শেষে কবি আবার নিজ গুরুদেব নিত্যানন্দের আদেশে যে 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটি প্রণয়ন করতে বসেছিলেন, তা স্বীকার করে বলেছেন —

"চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রাম।

হউ মোর প্রাণনাথ — এই মনস্কাম।। ৬৯

তাহান প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।

তাহান আজ্ঞায়ে লিখি চৈতন্যের স্তুতি।। ৭০"[২৮৯]

'মধ্যখণ্ড'-এর পঞ্চম অধ্যায়ের সূচনাতে কবি জানান— নিত্যানন্দ নবদ্বীপ তথা নদীয়ায় সকল বৈষ্ণব ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ আলাপন করে ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। এমন সময় আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে বৈষ্ণবেরা যে ব্যাসদেবের পূজা করে থাকেন তার সময় উপস্থিত হয়। চৈতন্যদেবের ইঙ্গিতে ও নিত্যানন্দের আদেশে এই ব্যাসদেবের পূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে। ব্যাসপূজার পূর্বদিন অধিবাস উপলক্ষে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আনন্দ উৎসবের সূচনা হয় —

"ব্যাসপূজা-অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।

দুই প্রভু নাচে, বেঢ়ি গায় ভক্তগণ।। ২০

চির দিবসের প্রেমে চৈতন্য-নিতাই।

দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে একঠাঁই।। ২১"[২৯০]

লক্ষণীয়, শ্রীবাস পণ্ডিতের এই গৃহেই চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমাবেশের মধ্য দিয়ে পরস্পরের স্বরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। নিত্যানন্দ যে আসলে বলরামের অবতার এবং চৈতন্যদেবই যে স্বয়ং কৃষ্ণ বা

নারায়ণ — তাই যেন বার বার এই অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন কবি। তাই চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের কাছে বলরামের অস্ত্র 'হল' অর্থাৎ লাঙ্গন ও মুষল চাইলে নিত্যানন্দ তা সহজেই তাঁর হাতে তুলে দেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে হল ও মুষল কোথায় পেলেন নিত্যানন্দ? এই অংশে অলৌকিকতার স্পর্শ থাকলেও নিত্যানন্দই যে আসলে বলরাম — তাই যেন প্রমাণ করতে চেয়েছেন কবি। আর এই কারণেই অলৌকিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন বলে মনে হয়। আবার, এর পাশাপাশি এই অধ্যায়ে চৈতন্যদেব নিজের অবতারের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে সরাসরি বলেছেন —

''সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে মোহর অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার।। ৫০''[২৯১]

সুতরাং বোঝা যায় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করবার জন্যই চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েছেন বলে মনে করতেন কবি বৃন্দাবন দাস। এই অধ্যায়ে কবি আরো জানান, এভাবে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে আবিষ্ট থাকার পর চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ যখন বাহ্য জ্ঞান ফিরে পান, তখন চৈতন্যদেব নিজ গৃহে ফিরে যান বৈষ্ণব ভক্ত সঙ্গে। আর নিত্যানন্দ সেই ব্যাসপূজার অধিবাসের রাত্রে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই রাত্রিযাপন করেন এবং পুনরায় কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ভেঙে ফেলেন। সকালে উঠে শ্রীবাসের ভাই রামাই পণ্ডিত তা দেখতে পান। শ্রীবাস পণ্ডিত চৈতন্যদেবের কাছে নিত্যানন্দের এই বাহ্যজ্ঞান শূন্য প্রেমাবেশের কথা জানালে চৈতন্যদেব নিজে আসেন শ্রীবাসের গৃহে। এরপর নিত্যানন্দ সহকারে চৈতন্যদেব গঙ্গাস্নানে যান এবং সেখান থেকে ফিরে এসে শ্রীবাস পণ্ডিতকে ব্যাসদেবের পূজা করতে বলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত নিত্যানন্দের হাতে মালা দিয়ে ব্যাসদেবকে দিতে বললে, তিনি মালা ব্যাসদেবের গলায় না দিয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান চৈতন্যদেবের গলায় দেন এবং এভাবেই নিত্যানন্দ তাঁর ব্যাসপূজার সমাপ্তি করেন। অবশ্য চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের মালা পরিগ্রহ করে তাঁর সম্মুখে স্বীয় ষড়ভুজ রূপ প্রকটিত করেন —

''চাঁচক-চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল।। ৮৯
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল।। ৯০''[২৯২]

চৈতন্যদেবের এই ষড়ভুজ রূপ দর্শন করে নিত্যানন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং চৈতন্যদেবের প্রবোধ বাক্যে পুনরায় সম্বিৎ ফিরে পান তিনি। কবি পুনরায় এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দের স্বরূ প-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে কবির মতে, নিত্যানন্দ দাস্যভাবে গৌরাঙ্গদেবের সেবা করে চলেছেন যুগে যুগে। ত্রেতা যুগে লক্ষ্মণ রূপে রামচন্দ্রের যেমন সেবা করেছেন তিনি, দ্বাপরে তেমনি বলরাম রূপে কৃষ্ণের সেবা করেছেন। আর এই কলিযুগে নিত্যানন্দ রূপে চৈতন্যদেবের সেবা করে চলেছেন। একারণে নিত্যানন্দের স্বরূপ

তত্ত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বলেন—

> ''যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে।
> স্বভাব তাঁহার দাস্য বুঝহ বিচারে।। ১১১''[২৯৩]

তবে, নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের দাস্যভাবে সেবা করলেও উভয়েই যেন অভিন্ন তত্ত্ব। তাই শুধুমাত্র চৈতন্যদেবের স্তুতি করে নিত্যানন্দের প্রতি অবজ্ঞা করলে চৈতন্যদেবকে লাভ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি নিত্যানন্দের স্তুতি করে চৈতন্যদেবের প্রতি অবজ্ঞা করলেও নিত্যানন্দকে লাভ করা সম্ভব নয়। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়ের এই অভিন্ন তত্ত্বই এই অধ্যায়ে প্রকাশিত করেছেন কবি বৃন্দাবন দাস। কবির উভয়ের এই 'অভিন্ন তত্ত্ব' প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য মনে হয় নিজ গুরুদেব নিত্যানন্দকে বৈষ্ণব সমাজে চৈতন্যদেবের সমমর্যাদা দান করানো। বৈষ্ণব ভক্ত সমাজে নিত্যানন্দ যে চৈতন্যদেবের মত সমমর্যাদায় প্রীত ও সমাদৃত ছিলেন না তা বুঝতে পারি কবির এই উক্তিতেই —

> ''নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব সকল।
> তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল।। ১৩৪
> ইহা না বুঝিয়া কোনোকোনো বুদ্ধি নাশ।
> এক বন্দে', আর নিন্দে', যাইবেক নাশ।। ১৩৫''[২৯৪]

বার বার কবি যেন বৈষ্ণব ভক্তদেব কাছে বলতে চেয়েছেন শুধু চৈতন্যদেবের পূজা নয়, সেইসঙ্গে নিত্যানন্দকেও অভিন্ন ভেবে সমমর্যাদায় পূজা করতে। লক্ষণীয়, বৈষ্ণব ভক্তদের বার বার অনুরোধ করবার পাশাপাশি কবি তাঁদের সতর্ক করেছেন নিত্যানন্দকে হীন জ্ঞান না করতে। আবার, এই কারণে এত অনুরোধের মাঝেও বৈষ্ণব কবির ধৈর্যচ্যুতি লক্ষ করা যায় —

> ''এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।
> কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ ব্যবহার।। ১৪৪
> বলরাম শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
> 'ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে।। ১৪৫''[২৯৫]

এভাবে নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের 'অভেদ-তত্ত্ব' প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ব্যাসদেবের পূজা মহাসমারোহে সকল বৈষ্ণব সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করেন কবি।

'মধ্যখণ্ড'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে কবি অদ্বৈত আচার্যের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সূচনাতেই কবি প্রসঙ্গতই বলেছেন —

> ''এখনে শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
> মধ্যখণ্ডে যেনমতে হৈল দরশন।। ৭''[২৯৬]

অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন। তাঁর বিস্তর আরাধনার কারণেই চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছেন নদীয়া তথা নবদ্বীপে। বয়সে প্রবীন এই অদ্বৈত প্রভুকে চৈতন্যদেব তামাশা করে 'নাঢ়া' বলে যে সম্বোধন করতেন একথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। এই অদ্বৈত প্রভুকে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে আনবার জন্য চৈতন্যদেব শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাই রামাই পণ্ডিতকে প্রেরণ করেন শান্তিপুরে। রামাই পণ্ডিতকে দেখেই অদ্বৈতাচার্য বুঝতে পারেন তার আগমনের কারণ কি? তাই রামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈতাচার্য বলেন —

> ''রামাঞি দেখিয়া হাসি বোলয়ে বচন।
> বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা' নিবার কারণ? ১৯'' [২৯৭]

রামাই পণ্ডিতকে দেখে অদ্বৈতাচার্য আনন্দ বিহ্বলতায় তাঁর সঙ্গে রহস্যময় বাক্যভঙ্গি প্রকাশ করেন। অদ্বৈতাচার্য রামাই পণ্ডিতকে শান্তিপুরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আবার নিত্যানন্দের প্রসঙ্গেও জানতে চান তিনি। উত্তরে রামাই পণ্ডিত বলেন —

> ''যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
> যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন।। ২৯
> যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
> সে প্রভু তোমার লাগি হইলা প্রকাশ।। ৩০''[২৯৮]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব যে আসলে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ এবং তিনি যে অদ্বৈতের আহ্বানের কারণেই আবির্ভূত হয়েছেন পুনরায় এই তথ্য প্রকাশ করলেন কবি। রামাই পণ্ডিতের মুখে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ সম্পর্কিত নদীয়ার কথা শ্রবণ করে অদ্বৈত আচার্য কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হন। শুধু অদ্বৈত প্রভুই নয়, তাঁর স্ত্রী সীতাদেবী এবং পুত্র 'অচ্যুতানন্দ'ও কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ক্রন্দন করতে থাকেন। অদ্বৈত আচার্য তখন বাহ্য জ্ঞান ফিরে পেয়ে রামাই পণ্ডিতের কাছে নবদ্বীপে যাবার দুইটি শর্ত দেন। প্রথমত; চৈতন্যদেবকে 'আপন ঐশ্বর্য্য' দেখাতে হবে; দ্বিতীয়ত; চৈতন্যদেবকে তাঁর শ্রীচরণ অদ্বৈত আচার্যের মাথায় তুলে দিতে হবে।

এরপর অদ্বৈত আচার্য সস্ত্রীক চৈতন্যদেবের পূজার জন্য অর্ঘ্য নিয়ে আসেন ঠিকই, কিন্তু রামাই পণ্ডিতকে শেখান যে, তিনি নবদ্বীপে আসেননি — একথা চৈতন্যদেবের কাছে জানাতে। অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যদেবের পরীক্ষার জন্য নন্দনাচার্যের গৃহে আশ্রয় নেন। কিন্তু অন্তর্যামী চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের এই ছল ধরতে পারেন এবং তাঁকে নন্দনাচার্যের গৃহ থেকে নিয়ে আসবার জন্য রামাই পণ্ডিতকে পুনরায় প্রেরণ করেন। অদ্বৈতাচার্য এরপর চৈতন্যদেবের সম্মুখবর্তী হন ও তাঁর 'অপরূপ বেশ' দর্শন করেন। এক্ষেত্রে কবি চৈতন্যদেবের যে রূপ-মাধুর্যের বর্ণনা করেছেন তা কাব্যগুণে অনুপম হয়ে উঠেছে। অদ্বৈত আচার্যের কাছে চৈতন্যদেব নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেবের এই বিশ্বরূপ দর্শন করে

অদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বিমোহিত হন এবং প্রেমাশ্রুতে চৈতন্যদেবের প্রতি নিবেদন করেন —

"মোর কিছু শক্তি নাহি, তোমার করুণা।
তোমা' বই জীব উদ্ধারিব কোন্ জনা? ১০২"[২৯৯]

এরপর, চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্যকে তাঁকে পূজা করতে বললে, অদ্বৈত আচার্য শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে তাঁর পূজা করেন এভাবে—

"পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম- হরিষে।
চৈতন্য-চরণ পূজে অশেষ-বিশেষে।। ১০৪
চৈতন্য-চরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে।। ১০৫
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসীমঞ্জরী।
অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি।। ১০৬
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ পঞ্চ উপচারে।
পূজা করে, প্রেম জলে বহে মহা ধারে।। ১০৭
পঞ্চশিখ জ্বালি পুন করেন বন্দনা।
শেষে জয়-জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষণা।। ১০৮"[৩০০]

অদ্বৈত আচার্য শুধু চৈতন্যদেবকে ভক্তিভরে পূজাই করেন না, তাঁর প্রতি স্তবস্তুতিও করতে করতে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হন। আর চৈতন্যদেব তখন ভক্ত ইচ্ছা পূরণের জন্য স্বীয় চরণ অদ্বৈতের মাথায় ধারণ করেন। আবার, চৈতন্যদেবের আদেশে অদ্বৈতাচার্য কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনোরম নৃত্য করতে থাকেন। কীর্তনে যে যে ভাব প্রকাশিত হয়, সেই সেই ভাবের অনুরূপেই অদ্বৈত কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করতে থাকেন। লক্ষণীয়, কবি বৃন্দাবন দাস এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যকে 'অভেদ তত্ত্ব' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। উভয়েই যে আসলে বলরামের অংশ তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি বলেছেন —

"নিত্যানন্দ অদ্বৈতে অভেদ প্রেম জান'।
এই অবতারে জানে সেই ভাগ্যবান।। ১৫০"[৩০১]

কবির অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে 'অভেদ তত্ত্ব' বলে প্রতিপন্ন করার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রশ্ন জাগে তাহলে বৈষ্ণব সমাজে কি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের সম্প্রদায় নিয়ে কলহের সৃষ্টি হয়েছিল? আর এই কলহের পরিসমাপ্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই কি কবির এই 'অভেদ তত্ত্ব' ব্যাখ্যা? বৈষ্ণব সমাজে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ পাই কবির দেওয়া এই উক্তি থেকে—

"যে না বুঝি দোঁহার কলহ পক্ষ ধরে।
এক বন্দে, আর নিন্দে, সেই জন মরে।। ১৫৩"[৩০২]

এরপর, কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মোহিত অদ্বৈত আচার্যের নৃত্যে অভিভূত চৈতন্যদেব তাঁকে বর চাইতে বললে তিনি বলেন—

অদ্বৈত বোলেন, " যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা।। ১৬৫
বিদ্যা-ধন-কুল- আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে।। ১৬৬
সে পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা।।" ১৬৭"[৩০৩]

অর্থাৎ অদ্বৈত আচার্য এখানে চৈতন্যদেবকে পরোক্ষে মানবতাবাদেরই প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। হরিনাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে তৎকালীন বঙ্গ সমাজের উচ্চ-নীচ জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন চান অদ্বৈতাচার্য। আমরা জানি মানব প্রেমিক চৈতন্যদেবেরও তাই সংকল্প ছিল। পাশাপাশি কবির দেওয়া এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি তৎকালীন সময়ে বৈষ্ণব ভক্তরা ছিলেন বাহ্যসুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চোখে অবহেলিত ও অপাংক্তেয়। তাই এই বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে কবির ক্রোধ সহকারে উক্তি— 'পাপিষ্ঠ সব দেখি মরুক পুড়িয়া।' এভাবে অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের কাছে বর প্রার্থনা করেন এবং চৈতন্যদেবও তৎকালীন বঙ্গ সমাজের জাতিভেদ প্রথা বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়ে নিজ মানবকিতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার করেন।

'মধ্যখণ্ড'-এর সপ্তম অধ্যায়ে কবি চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হরিনাম সঙ্কীর্তনের কাহিনি দিয়ে সূচনা করলেও এই অধ্যায়ের মূল বর্ণিতব্য বিষয় 'পুণ্ডরীক' বিদ্যানিধির পরিচয় দান। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ছিলেন পূর্ববঙ্গের এক বৈষ্ণব। কবি সূচনাতে এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন—

"ইবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন।
'পুণ্ডরীক' নাম-শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম।। ৯"[৩০৪]

'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের কাহিনি সূত্রে জানতে পারি, চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করতে করতে পুণ্ডরীক নাম স্মরণ করে ও তাঁর দর্শনের জন্য ক্রন্দন করতে থাকেন। চৈতন্যদেবের এই ক্রন্দন দেখে বৈষ্ণব ভক্তেরা ভাবেন 'পুণ্ডরীক' অর্থাৎ কৃষ্ণের দর্শনের জন্যই হয়তো তিনি বিরহাক্রান্ত হয়েছেন। পরে চৈতন্যদেব বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলে বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—

"কোন্ ভক্ত লাগি প্রভু! করহ ক্রন্দন।
সত্য আমা' সভা' প্রতি করহ কথন।। ১৮
আমা' সভাকার ভাগ্য হউ, তানে জানি।

তাঁর জন্ম কর্ম্ম কোথা কহ প্রভু! শুনি।। ১৯”[৩০৫]

এরপর চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন— পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হলেন এক মহাবৈষ্ণব। তাঁকে দেখে সহজে চেনা যায় না যে তিনি মহা বৈষ্ণব; বিষয়ী বলেই মনে হয়। এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রাথমিক পরিচয় দিতে গিয়ে চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ভক্তগণের কাছে বলেন —

‘‘চাটিগ্রামে জন্ম, বিপ্র পরম পণ্ডিত।

পরম সাচার সর্ব্ব লোকে অপেক্ষিত।। ২৩”[৩০৬]

অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলার ‘মেখলা’ গ্রামে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির জন্ম। চট্টগ্রামে তাঁর বাড়ি হলেও নবদ্বীপেও একটি বাড়ি আছে বলে চৈতন্যদেবের উক্তিতে কবি জানিয়েছেন। আবার, তাঁর অত্যন্ত সদাচারনিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় দান করতে গিয়ে চৈতন্যদেব জানিয়েছেন —

‘‘গঙ্গাস্নান না করেন পাদস্পর্শ ভয়ে।

গঙ্গা দরশন করে নিশির সময়ে।। ২৫”[৩০৭]

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির রাত্রিবেলায় গঙ্গা দর্শনের কারণ সম্পর্কে জানতে পারি, দিনের বেলায় গঙ্গায় লোকেরা ‘কুল্লোল’, ‘দন্তধাবন’, ‘কেশসংস্কার’ প্রভৃতি কর্ম করে গঙ্গাকে দূষিত করে বলে তিনি রাত্রিবেলায় গঙ্গা দর্শন করতেন। আবার, গঙ্গার পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁর এতই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দেবার্চনার পূর্বে মনের মালিন্য দূর করে চিত্ত শুদ্ধির জন্য তিনি গঙ্গাজল পান করতেন।

এই পরম বৈষ্ণব ব্যক্তি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে নবদ্বীপে এসে বাস করলেও তাঁকে কেউ চিনতে পারেন নি বলে কবি জানান। সকলেই তাঁকে অত্যন্ত বিষয়-সুখ-ভোগপরায়ণ বলে মনে করত। তাঁর আচরণেও বিষয়ীভাবের প্রকাশ পাওয়ায় কোন বৈষ্ণব ভক্তই তাঁর কাছে যেত না। পুণ্ডরীকের বাস্তবিক প্রেম-ভক্তির পরিচয় একমাত্র জানতেন মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত—

‘‘যত কিছু তাঁর প্রেম ভক্তির মহত্ত্ব।

মুকুন্দ জানেন, আর বাসুদেব দত্ত।। ৪৩”[৩০৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, মুকুন্দ দত্ত, যিনি চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ ছিলেন, তাঁর বাড়িও পূর্ববঙ্গের চট্টোগ্রামে থাকায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় ছিল। তাই মুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীকের কৃষ্ণ প্রেম ভক্তির কথা জানতেন। আর বাসুদেব দত্ত ছিলেন মুকুন্দ দত্তের ভাই। তাই তাঁর সঙ্গেও পুণ্ডরীকের পূর্ব পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নবদ্বীপে আগমনের কথা মুকুন্দ দত্ত গদাধর পণ্ডিতের কাছে গিয়ে ব্যক্ত করেন। গদাধর তখন এই বৈষ্ণবকে দর্শন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মুকুন্দ দত্ত তাঁকে পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির গৃহে নিয়ে যান। পুণ্ডরীক গদাধরকে দেখে মুকুন্দের কাছে জিজ্ঞাসা করেন —

‘‘কিবা নাম ইহাঁর থাকেন কোন গ্রামে? ৫১

বিষ্ণুভক্তি তেজোময় দেখি কলেবর।

আকৃতি প্রকৃতি — দুই পরম সুন্দর।। ৫২”[৩০৯]

মুকুন্দ দত্ত তখন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে গদাধরের পরিচয় দান করেন। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে কবি বেশ কয়েকটি পয়ার জুড়ে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির গৃহের আসবাব-পত্রাদির যে বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে তাঁকে অত্যন্ত বিষয়-সুখ-ভোগপরায়ণ বলেই মনে হয়। বিদ্যানিধি নিজে যে জমিদার ছিলেন এবং তাঁর আসবাব-পত্রাদি ও আচরণে রাজপুত্রোচিত ব্যবহার যে প্রকাশ পেয়েছে, তা জানাতে ভোলেন নি কবি। সুতরাং, বোঝা যায় বৈষ্ণব হলেও তাঁর মধ্যে বিষয়-সুখ-ভোগপরায়ণতার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। যদিও কবি বলেছেন —

“ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান।

যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান।। ৬৫

সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবান।

বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার সংস্থান।। ৬৬”[৩১০]

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির এই বিষয়-সুখ-ভোগপরায়ণতা দেখে এবং বিষয়ীর ন্যায় আসবাব-পত্রাদি দেখে গদাধরের মনেও সন্দেহ জন্মায়। তখন মুকুন্দ দত্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করবার জন্য ‘শ্রীমদ্‌ভাগবত’-এর শ্লোক উচ্চারণে কীর্তন করলে পুণ্ডরিক কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ক্রন্দন করতে থাকেন এবং মূর্ছা যান। শুধু তাই নয়, কৃষ্ণপ্রেমাবেশে স্থির থাকতে না পেরে পুণ্ডরীক যেমন উন্মাদের ন্যায় সকল আসবাব-পত্রাদি ভাঙেন, তেমনি কৃষ্ণবিরহে প্রেমাশ্রু নির্গত করতে করতে বলে ওঠেন —

“কৃষ্ণ রে, ঠাকুর রে কৃষ্ণ রে! মোর প্রাণ!

মোরে সে করিলা কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান।। ৮৪”[৩১১]

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির এহেন কৃষ্ণ প্রেম বিহ্বলতা দেখে গদাধরের মনে তাঁর সম্পর্কে যে মহাবিষয়ী ভাবের সূচনা হয়েছিল তা দূরীভূত হয়। বিদ্যানিধির কৃষ্ণ প্রেম বিরহের আর্তি প্রকাশ করতে দেখে গদাধর নিজেও প্রেমাশ্রুতে লিপ্ত হন। গদাধর তখন মুকুন্দ দত্তের কাছে জানান, তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি অবজ্ঞা জনিত ভাবের কারণে যে পাপ করেছেন তা স্ক্ষালন করতে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নিতে চান। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মুকুন্দের কাছ থেকে গদাধরের এই অভিপ্রায়ের কথা শ্রবণ করে নিজেকে মহাভাগ্যবান বলে মনে করেন এমন শিষ্য পাওয়ার জন্য। সেই সঙ্গে বিদ্যানিধি গদাধরকে বলেন —

“এই যে আইসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী।

সর্ব্ব-শুভ-লগ্ন ইথি মিলিবেক আসি।। ১১৭

ইহাতে সঙ্কল্পসিদ্ধি হইব তোমার।

শুনি গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার।। ১১৮”[৩১২]

গদাধর বিদ্যানিধির কাছ থেকে এই মন্ত্রদীক্ষা দেবার প্রবোধ বাক্য পেয়ে পরম হরষিত মনে ফিরে এসে

চৈতন্যদেবের কাছে সব কথা ব্যক্ত করেন। চৈতন্যদেব গদাধরের কথা শ্রবণ করে আনন্দিত হন। এদিকে, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও একদিন রাত্রিবেলায় 'অলক্ষিত বেশে' চৈতন্যদেবের কাছে এসে উপস্থিত হন। চৈতন্যদেবকে দেখেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমাবেশে লিপ্ত হন এবং কৃষ্ণবিরহে প্রেমাশ্রু সহকারে নিজ আর্তি প্রকাশ করতে করতে মূর্ছিত হন। চৈতন্যদেব তখন পরম সম্ভ্রমে পুণ্ডরীককে কোলে তুলে নিয়ে বলেন—

> " 'পুণ্ডরীক বাপ!' বলি কান্দেন ঈশ্বর।
> 'বাপ দেখিলাঙ আজি নয়নগোচর।' ১২৯"[৩১৩]

এভাবে তখন নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণব ভক্তের কাছে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আগমন বার্তা প্রকাশিত হয়। চৈতন্যদেব পুণ্ডরীককে আলিঙ্গন করে বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হন। পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে চৈতন্যদেব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে 'পুণ্ডরীক প্রেমনিধি'তে ভূষিত করেন। পুণ্ডরীকের পরম বৈষ্ণব মহানুভবতা ও কৃষ্ণপ্রেমাবেশ এভাবে সকল নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে প্রচারিত হয়। এরপর, গদাধর এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মত পরম বৈষ্ণবের কাছ থেকে ইষ্টমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে কবি বৃন্দাবন দাস বলেছেন —

> "কহিলাঙ কিছু বিধ্যানিধির আখ্যান।
> এই মোর কাম্য — যেন দেখা পাই তান।। ১৫২"[৩১৪]

কবির বর্ণিত এই উক্তি থেকে মনে হয়, বৃন্দাবন দাস প্রত্যক্ষভাবে হয়তো পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির দর্শন লাভ করতে পারেন নি। গুরুদেব নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণব ভক্তদের কাছ থেকে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বৈষ্ণবীয় গল্পকথা শ্রবণ করেই তিনি তাঁর কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

মধ্যখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে কবি শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বাল্যভাবের পরিচয় দিয়েই কাহিনীর সূত্রপাত করেছেন। সূচনাতেই কবি জানিয়ে দেন —

> "নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
> নিরন্তর বাল্যভাব, আর নাহি স্ফুরে।। ৬"[৩১৫]

লক্ষণীয়, মাতা যেভাবে পুত্রের সেবা করেন, শ্রীবাস পত্নী মালিনী দেবীও ঠিক সেভাবেই নিত্যানন্দের সেবা করতেন। কিন্তু একদিন চৈতন্যদেব শ্রীবাস পণ্ডিতকে পরীক্ষা করবার জন্য বলেন — কেন তিনি অজ্ঞাত পরিচয় নিত্যানন্দকে তাঁর বাসায় স্থান দিয়েছেন? নিত্যানন্দ কোন্ জাতির কিংবা কোন্ কুলের— এ সম্পর্কিত কোন তথ্য না জেনে তাঁকে বাড়িতে স্থান দেওয়া উচিত হয় নি। চৈতন্যদেব শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলেন —

> "আপনার জাতি-কুল যদি রক্ষা চাও।
> তবে ঝাট এই অবধুতেরে ঘুচাও।। ১২"[৩১৬]

কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত জানেন, চৈতন্যদেব তাঁকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করবার জন্যই এমন মন্তব্য করেছেন।

আমাদেরও তাই মনে হয়। কারণ চৈতন্যদেবের প্রধান কর্মই ছিল মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা ও তৎকালীন সমাজের জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন। চৈতন্যদেবের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে শ্রীবাস পণ্ডিত বলেন — নিত্যানন্দের সেবা করা তাঁর একান্ত কর্তব্য। কারণ তিনি জেনেছেন, তত্ত্ব-বিচারে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের কোন প্রভেদ নেই। উভয়েই আসলে এক দেহ — এক স্বরূপ। আর তাই শ্রীবাস পণ্ডিত চৈতন্যদেবকে বলেছেন —

"মদিরা যবনী নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে।। ১৫
তথাপি আমার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা।। ১৬"[৩১৭]

নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসের এই অটল বিশ্বাস ও প্রীতি দেখে চৈতন্যদেব তাঁকে দুটি বর দান করেন। একটি হল দারিদ্র্যহীনতা বা ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য বিষয়ে, আর অপরটি হল — শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ির পরিজনবর্গ, এমন কি বিড়াল কুকুরেরও চৈতন্যদেবের প্রতি অচল ভক্তি বিষয়ে।

এরপর কবি বৃন্দাবন দাস এই অধ্যায়ে শচীমাতার অপূর্ব স্বপ্নদর্শনের বর্ণনা দান করেছেন। শচীমাতা পুত্র চৈতন্যদেবকে বলেন — তিনি স্বপ্নে দেখেছেন বালক রূপে নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব ঠাকুর ঘরে ঢুকে বলরাম ও কৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে মারামারি করছিলেন। শুধু তাই নয়, বলরাম ও কৃষ্ণের সঙ্গে বালকবেশের চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ রীতিমত দধি, দুগ্ধ ও সন্দেশ নিয়ে কোন্দল করছিলেন। এই দধি, দুগ্ধ ও সন্দেশ নিয়ে মারামারির সময়ে নিত্যানন্দ বলেন —

"নিত্যনন্দ বোলয়ে সে কাল গেল বয়্যা।
যে-কালে খাইলা দধি নবনী লুটিয়া।। ৩৫
ঘুচিল গোয়ালা — হৈল বিপ্র অধিকার।
আপনা চিনিঞা ছাড়' সব-উপহার।। ৩৬"[৩১৮]

অর্থাৎ বালক রূপী নিত্যানন্দ কৃষ্ণ ও বলরামের উদ্দেশ্যে বলেছেন — আজ আর দ্বাপর-কাল নেই। তাই আজ দধি, দুগ্ধ কিংবা নবনীতে গোয়ালার অধিকার নেই, ব্রাহ্মণেরই অধিকার। এভাবে বালক বেশে নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব বালকরূপী কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে শুধু কলহ করে ভোজনই করেন নি—

"কাহারো হাথের কেহো কাড়ি লই যায়।
কাহারো মুখের কেহো মুখ দিয়া খায়।। ৪২"[৩১৯]

তবে, উল্লেখ্য শচীমাতার এই স্বপ্ন দর্শন বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি আসলে বলতে চেয়েছেন যে, নিত্যানন্দ ও বলরাম এবং চৈতন্যদেব ও কৃষ্ণ আসলে অভিন্ন। গত দ্বাপরে যারা গোপ-গৃহে কৃষ্ণ-বলরাম রূপে

আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরাই কলিতে গৌর-নিত্যানন্দ রূপে ব্রাহ্মণ গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু বাৎসল্যময়ী শচীমাতা নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের এই স্বরূপতত্ত্ব বুঝতে না পেরে এক রঙ্গ-কৌতুক সমন্বিত অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শন বলেই মনে করেছিলেন। চৈতন্যদেব কিন্তু শচীমাতার এই স্বপ্ন দর্শনের কারণ উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাই বলেন —

''বিশ্বম্ভর বোলে 'মাতা! শুনহ বচন।
নিত্যানন্দে আনি ঝাট করাহ ভোজন।।' ৫১''[৩২০]

নিজ পুত্র চৈতন্যদেবের এরূপ ইচ্ছার কথা শ্রবণ করে মাতা শচীদেবী বড়ই আনন্দিত হন। মাতা শচীদেবীর অনুমতি নিয়ে চৈতন্যদেব নিজ গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করতে যান এবং নিত্যানন্দকে সঙ্গে করে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর উভয়েই পরমানন্দে ভোজন করতে বসেন। মাতা শচীদেবীর কাছে উভয়ে পাঁচ বছরের শিশুরূপে প্রদর্শিত হন। এরপর নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেব উভয়ের ভোজনকালে মাতা শচীদেবী অপূর্ব ঐশ্বর্য দর্শন করেন। কবি শচীদেবীর এই ঐশ্বর্য দর্শনের বর্ণনা দান করতে গিয়ে বলেছেন—

''কৃষ্ণ-শুক্ল-বর্ণ দেখে দুই মনোহর।
দুইজন চতুর্ভুজ — দুই দিগম্বর।। ৬৪
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল, মুষল।
শ্রীবৎস, কৌস্তুভ দেখে মকরকুণ্ডল।। ৬৫''[৩২১]

অর্থাৎ, শচীমাতা চৈতন্যদেবকে দেখলেন কৃষ্ণরূপে এবং নিত্যনন্দকে দেখলেন বলরামরূপে। তিনি আরও দর্শন করেন, নিজ পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কৃষ্ণরূপধারী চৈতন্যদেবের হৃদয়ে বিরাজিতা। আসলে চৈতন্যদেবই যে স্বয়ং কৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দ যে স্বয়ং বলরাম — এই অভেদ তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করেছেন কবি বৃন্দাবন দাস। শচীমাতা চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের এই অপূর্ব ঐশ্বর্যরূপ দর্শন করে মূর্ছিতা হয়ে পড়েন। শচীমাতা মূর্ছিত অবস্থায় ভূমিতে পতিত দেখে চৈতন্যদেব অতি তাড়াতাড়ি আচমন করে মাতাকে তোলেন। শচীমাতা বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে কৃষ্ণ-বলরামের অপূর্ব ঐশ্বর্য দর্শনের কারণে কেবল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন, কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোন বাক্যই স্ফুরিত করতে পারেন না।

এরূপে চৈতন্যদেব নিজ স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করে সমগ্র নবদ্বীপ তথা নদীয়া নগরে সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ সঙ্গে নিজ হরিনাম-সংকীর্তন প্রচার করতে থাকেন। কোন বৈষ্ণব ভক্তগণের মন্দিরে তিনি যেমন চতুর্ভুজ রূপের ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন তেমনি কোন কোন বৈষ্ণব ভক্তগণের মন্দিরে ষড়ভুজ রূপের ঐশ্বর্যও প্রকাশ করেন। অর্থাৎ সকল নবদ্বীপবাসীর কাছেই চৈতন্যদেবের স্বরূপ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে যায় ইতিমধ্যেই। আর এই কারণেই কবিও বলেছেন —

''সভে জানিলেন — ঈশ্বরের অবতার।

আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সভার।। ৭৯”[৩২২]

চৈতন্যদেবের এরূপ প্রকাশ দেখে সকল বৈষ্ণবগণের হৃদয় পরমানন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব পরিমণ্ডলের আর কোন ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পার্ষদেরাও তৎকালীন বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা চৈতন্যদেবের স্বরূপ-তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হবার পর প্রত্যেকে নবদ্বীপে এসে বাস করতে শুরু করেন এবং চৈতন্যদেব প্রচারিত হরিনাম সঙ্কীর্তনে অংশগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব এই সব বৈষ্ণব পার্ষদগণের কাছে নানা ভাবের আবেশ প্রকাশ করে চলেন। তিনি কখনো যেমন ভগবৎ-স্বরূপের অনুরূপ আবেশ প্রকাশ করেন, তেমনি কখনো গোপীভাবেও কৃষ্ণবিরহে নিরন্তর রোদন করতে থাকেন —

“কোনদিন গোপীভাবে করেন রোদন।

কারে বলি রাত্রিদিন — নাহিক স্মরণ।। ৮৮”[৩২৩]

লক্ষণীয়, এখানে কবি চৈতন্যদেবের গোপী-ভাবাবেশের যে কথা বলেছেন, তা থেকে বুঝতে পারি তিনি ছিলেন রাধা-কৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ। যদিও কবি কোথাও চৈতন্যদেবের এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন নি সরাসরিভাবে, তবু এই পয়ারের মধ্য দিয়ে সেই ইঙ্গিত পরিস্ফুট বলেই মনে করি। চৈতন্যদেবের এরূপ বিবিধ আবেশ প্রকাশ করতে দেখে শচীমাতা আনন্দ সাগরে লিপ্ত হলেও প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র সংসার ছেড়ে চলে যাবেন চিন্তা করে ব্যথিতও হন।

ভগবান বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে নামভেদ থাকলেও উভয়েই যে আসলে সমশ্রদ্ধার — এই তত্ত্ব প্রতিস্থাপন করতে কবি এই অধ্যায়ে একটি নব কাহিনির উপস্থাপন করেছেন। একদিন এক শিবভক্ত গায়েন ডমরু বাজিয়ে নৃত্যের সঙ্গে শিবের মহিমাদি কীর্তন করতে আসে চৈতন্যদেবের বাড়িতে। সেই গায়েনের মুখ থেকে শিবের মহিমাদি কথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব নিজে শঙ্কররূপে প্রকটিত হন এবং হুঙ্কার করে বলেন “মুঞি সে শঙ্কর।” শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেব শিবভাবে ভাবিত হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েন এবং সেই শিব গায়েনের স্কন্ধে আরোহন করেন। পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে অবশ্য চৈতন্যদেব নিজেই লজ্জিত হন এবং সেই শিব গায়েনকে যথোচিত ভিক্ষা দান করেন। কবির বর্ণিত চৈতন্য জীবন সম্পর্কিত এই কাহিনিতে অতিশয়োক্তি থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কবির আসল উদ্দেশ্য ছিল বিষ্ণু ও শিবের স্বরূপগত অভেদ প্রমাণ করা।

মধ্যখণ্ডের এই অষ্টম অধ্যায়েই কবি চৈতন্যদেবের নিশা-কীর্তনের সূচনার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। চৈতন্যদেব নিজ বৈষ্ণব ভক্ত পরিমণ্ডলের উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গতই বলেছেন —

“আজি হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল।

নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন-মঙ্গল।। ১০৭”[৩২৪]

চৈতন্যদেবের এই মঙ্গলময় কীর্তনবিলাসের ইচ্ছা প্রকাশ করতে দেখে সকল বৈষ্ণবভক্তগণও পরমানন্দে

উল্লাসিত হয়ে ওঠেন। বৈষ্ণবভক্তগণ সহ এই নিশা-কীর্তন কোনদিন যেমন হত শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে, কোনদিন তেমনি চন্দ্রশেখর ভবনেও অনুষ্ঠিত হত। চৈতন্যদেবের এই রাত্রিকালে উচ্চস্বরে উচ্চারিত হরিনাম কীর্তন শ্রবণ করে বাহ্যসুখে নিয়োজিত লোকেরা বলতেন —

"নিশায় এ গুলা খায় মদিরা আনিয়া।। ১১৯
এ-গুলা সকল মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র পঢ়ি পঞ্চ-কন্যা আনে।। ১২০"[৩২৫]

কিন্তু, চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে এতই বিভোরিত যে এইসব ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কথায় কর্ণগোচর করতেন না। তিনি আপন মনে হরিনাম সঙ্কীর্তন করে চলতেন পরমানন্দে। চৈতন্যদেবের এই কৃষ্ণপ্রেমাবেশে উন্মাদের ন্যায় আচরণ দেখে শচীদেবী ব্যথিত হতেন ঠিকই কিন্তু পরমানন্দও লাভ করতেন। এভাবে চৈতন্যদেব নিরন্তর রাত্রিদিন বৈষ্ণবভক্তগণ সহ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য সহযোগে হরিনাম সঙ্কীর্তন করতে থাকেন। আবার, চল্লিশ-পদ কীর্তনেও চৈতন্যদেব যে সকল অদ্ভুত প্রেম-বিকার প্রকটিত করে নৃত্য করতেন — তার পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনাও দান করেছেন কবি। কৃষ্ণপ্রেমাবেশে চৈতন্যদেব যখন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাঁদতেন, তখন বন্ধনমুক্ত কেশরাশি ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেও তাঁর কিছুই অনুভূত হত না। অর্থাৎ চৈতন্যদেব তখন সম্পূর্ণভাবে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে অদ্ভুত প্রেমবিকারে লিপ্ত হতেন। ঠিক একই ভাবে তিনি কখনও যেমন অতি উচ্চস্বরে অট্টহাসি হেসে উঠতেন, আবার কখনো বা দাস্যভাবে আবিষ্ট হতেন। লক্ষণীয়, কৃষ্ণপ্রেম বিরহে চৈতন্যদেবের মধ্যে যে আবেশের বা সাত্ত্বিকভাবের বিবিধ প্রসঙ্গের কথা কবি উল্লেখ করেছেন, তা আমরা কৃষ্ণ বিরহ কাতরা রাধার মধ্যেও লক্ষ করে থাকি। সুতরাং, চৈতন্যদেব যে রাধা-কৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ তত্ত্ব তা যেন এখানে সূচিত হয়েছে পরোক্ষভাবে। কৃষ্ণপ্রেম বিরহে চৈতন্যদেবের এরূপ চল্লিশটি প্রেমাবেশের কথা বর্ণনা করেছেন কবি। চৈতন্যদেবের এই প্রেমাবেশের প্রকাশে যেমন রাধাভাব কখনও ফুটে উঠেছে, তেমনি কৃষ্ণভাবের আবেশও পরিস্ফুট হয়েছে। লক্ষণীয়, এরূপ চৈতন্যদেবের বিভিন্ন কৃষ্ণপ্রেমাবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি নিজেই জানিয়েছেন —

"হইল পাপিষ্ঠ, জন্ম তখনে না হৈল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল।। ১৯৮"[৩২৬]

অর্থাৎ কবি বৃন্দাবন দাস যে চৈতন্যদেবের এই লীলা স্বচক্ষে দর্শন করতে পারেন নি, তা তাঁর এই উক্তি প্রয়োগ থেকে সহজেই বুঝতে পারি। কৃষ্ণপ্রেমাবেশে চৈতন্যদেবের যে অপরূপ নৃত্য প্রকাশ তা পরমানন্দে নয়ন ভরে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি বলেই কবির এই আক্ষেপ বলে মনে হয়।

শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে চৈতন্যদেবের এই কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হরিনাম সঙ্কীর্তনে কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ পার্ষদগণই প্রবেশাধিকার পেতেন; অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারতেন না। চৈতন্যদেবের আদেশেই

শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ির প্রবেশের দরজা বন্ধ করা থাকত। চৈতন্যদেবের এই হরিনাম সঙ্কীর্তনে প্রবেশাধিকার না পেয়ে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত মানুষেরা নানারূপ অশালীন মন্তব্য করতেন। বাহ্যিক ইন্দ্রিয়সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এই হরিনাম সঙ্কীর্তনের বিপক্ষে কিরূপ অশালীন মন্তব্য করতেন, কবির দেওয়া সেই অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা থেকে তৎকালীন নবদ্বীপ তথা নদীয়ার সামাজিক চিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তৎকালীন হিন্দু বৈষ্ণব ভক্তেরা যে কিরূপ লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, এমনকি সেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ যে চৈতন্যদেবকেও সহ্য করতে হয়েছিল তা কবির বর্ণনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। শুধু তাই নয়, এই সব বাহ্য ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত লোকেরা বৈষ্ণবদের ভয় প্রদর্শন করতেন রাজদরবারে অভিযোগ করবেন বলে। আবার, যেহেতু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এই হরিনাম সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হত, তাই শ্রীবাসকেই এই পাষণ্ডীরা মূল পাণ্ডা বলে বিবেচিত করে বলেন —

> ‘‘শ্রীবাস-বামন এই নদীয়া হইতে।
> ঘর ভাঙ্গি কালি লৈয়া ফেলাইব সোঁতে।। ২৭২
> ও বামন ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
> অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল।। ২৭৩’’[৩২৭]

বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এভাবে বৈষ্ণব ভক্তগণদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেও চৈতন্যদেব কিন্তু নিরন্তর পার্ষদদের সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্তন করেই চলতেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এরূপ হরিনাম সঙ্কীর্তনের সময়ে চৈতন্যদেব নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করে পার্ষদদের বলেন —

> ‘‘কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ।
> আমি সেই ভগবান দেবকীনন্দন।। ২৮৭
> অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-মাঝে আমি নাথ।
> যত গাও সেই আমি, তোরা মোর দাস।। ২৮৮’’[৩২৮]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব এখানে পার্ষদগণের কাছে নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনিই স্বয়ং নারায়ণ। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন তিনিই। এরপর শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে চৈতন্যদেব আনন্দে ভোজন করেন এবং সকল বৈষ্ণব ভক্তের প্রতি বর দান করতে উদ্যত হন। কিন্তু পরক্ষণেই চৈতন্যদেব বাহ্যদশা ফিরে পেয়ে দাস্যভাবে লিপ্ত হন এবং কৃষ্ণ বিরহে ও কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ক্রন্দন করতে থাকেন। এভাবে, কৃষ্ণবিরহে চৈতন্যদেব মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং পুনরায় বাহ্য দশা ফিরে পেয়ে উচ্চস্বরে হরিধ্বনি করতে থাকেন।

‘মধ্যখণ্ড’-এর নবম অধ্যায়ে কবি চৈতন্যদেবের মহাপ্রকাশ বা সাতপ্রহরিয়া ভাবের বর্ণনা দান করে কাহিনির সূচনা করেছেন। অধ্যায়ের প্রথমে কবি প্রসঙ্গতই বলেছেন —

> ‘‘এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ।

যহিঁ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সিদ্ধ অভিলাষ।। ৮"[৩২৯]

অর্থাৎ, অবিচ্ছিন্ন ভাবে সাত-প্রহর পর্যন্ত চৈতন্যদেবের মধ্যে ঈশ্বর ভাবময় মহাপ্রকাশ বিরাজিত ছিল বলে এই মহাপ্রকাশকে লোকে সাতপ্রহরিয়া ভাব বলে থাকে। চৈতন্যদেবের এই মহাভাব প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে। একদিন চৈতন্যদেব সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ সহ শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে গিয়ে উচ্চস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্তন করবার সময় ঈশ্বর ভাবে আবিষ্ট হয়ে ওঠেন। তখন তিনি নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে বিষ্ণুর ঘাটে গিয়ে উপবেশন করেন। চৈতন্যদেবের মধ্যে সর্বতোভাবে এই ভগবৎ-ঐশ্বর্য সাতপ্রহর কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। চৈতন্যদেব বিষ্ণুর ঘাটে উপবেশন করে তাঁর অভিষেকের জন্য গান গাইতে বলেন বৈষ্ণব ভক্তদের। বৈষ্ণব ভক্তগণ তখন অভিষেকের মন্ত্র উচ্চারণ করে মাঙ্গলিক গঙ্গাজল দিয়ে চৈতন্যদেবের অভিষেক সম্পন্ন করেন। লক্ষণীয়, শাস্ত্রমতে একশো আট ঘটি জল দিয়ে অভিষেক সম্পন্ন করবার বিধান থাকলেও চৈতন্যদেবকে সহস্র ঘটের গঙ্গাজল দিয়ে অভিষেক করানো হয়। কবি এই অংশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —

''নাম মাত্র — অষ্টোত্তর-শত ঘট জল।
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল।। ৩৫"[৩৩০]

আবার, এই অভিষেকের সময়ে চৈতন্যদেব শ্রীবাসের এক ভাগ্যবতী দাসীর 'দুঃখী' নাম পরিত্যাগ করে 'সুখী' নাম রেখেছিলেন। তবে, শুধু এই 'সুখী' দাসীই নয়, শ্রীবাসের আরো অনেক দাস-দাসী সেবা পরায়ণ হয়ে এই সময় চৈতন্যদেবের অভিষেক করেছিলেন। অভিষেকের পর চৈতন্যদেবকে যেমন নতুন বসন পড়ানো হয় তেমনি তাঁর অঙ্গে লেপন করা হয় 'সুগন্ধি চন্দন'। এরপর দশাক্ষর গোপালমন্ত্র উচ্চারণ করে সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ মিলিত হয়ে চৈতন্যদেবের পূজা করেন। কবি চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তগণের এই পূজার যে অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দান করেছেন, তা থেকে কবির ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে থাকি —

''পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ।
প্রদীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র — যথা অনুরূপ।। ৪৭
যজ্ঞসূত্র, যথাশক্তি অঙ্গে অলঙ্কার।
পূজিলেন করিয়া ষোড়শ উপচার।। ৪৮
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসীমঞ্জরী।
পুনঃপুন দেন সভে চরণ-উপরি।। ৪৯"[৩৩১]

এভাবে সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ গোপীজনবল্লভ রূপে চৈতন্যদেবের পূজা সম্পন্ন করে তাঁর প্রতি স্তব-স্তুতি করতে থাকেন। চৈতন্যদেবের অত্যন্ত সমুজ্জ্বল রূপ প্রকাশ করতে দেখে সকল বৈষ্ণবেরাই অভিভূত হয়ে পরমানন্দ লাভ করেন এবং চৈতন্যচরণ বন্দনা করতে থাকেন নানাবিধ দিব্য গন্ধ দিয়ে। নানা

উপচারের সমন্বয়ে চৈতন্যচরণ বারবার পূজা করে বৈষ্ণবভক্তগণ ভক্তি বিগলিত হয়ে চৈতন্যদেবের ভোজনের উদ্যোগ করেন। ভক্তগণ প্রদত্ত নানাবিধ সহস্রাধিক দ্রব্য চৈতন্যদেবকে ভোজন করতে দেখে সকলেই পরমানন্দ প্রকাশ করেন। এরপর চৈতন্যদেব সকল বৈষ্ণবভক্তগণের জন্মাবধি কৃত কর্মের বিবরণ দান করেন। এমনকি দেবানন্দ পণ্ডিতের কাছে শ্রীবাস পণ্ডিতের 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এর অধ্যয়ন এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে প্রেমাশ্রুতে তিনি কীভাবে লিপ্ত হয়েছিলেন তাও স্মরণ করান চৈতন্যদেব। অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবভক্তগণই পূর্বে যা যা কৃত কার্য করেছিলেন তা তাদের স্মৃতিপথে জাগ্রত করিয়ে পুনরায় কৃষ্ণপ্রেমাবেশে সুচারিত করেন চৈতন্যদেব। এভাবে চৈতন্যদেবের নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে সমস্ত দিন অতিবাহিত হলে সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যাকালেও চৈতন্যদেবের এই মহা ঐশ্বর্য সমরূপেই বিদ্যমান ছিল বলে কবি জানিয়েছেন।

এরপর কবি সুকৌশলে শ্রীধর নামে নবদ্বীপের এক বৈষ্ণবের কাহিনি উত্থাপন করেন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবভক্তদের দিয়ে এই শ্রীধরকে ডেকে পাঠান। বৈষ্ণব ভক্ত এই শ্রীধর কলাগাছের খোলা বিক্রি করে অতি দারিদ্র্য-দুঃখে দিন অতিবাহিত করতেন। দারিদ্র সত্ত্বেও শ্রীধর কিন্তু ভক্তিপথ থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি। রাত্রে বাড়িতে গিয়ে শ্রীধর কৃষ্ণের সেবা করে পরমানন্দে যখন হরিধ্বনি করতেন তখন বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাঁকে ব্যঙ্গ করতেন —

> ''যতেক পাষণ্ডী বোলে, 'শ্রীধরের ডাকে।
> রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, দুই কর্ণ ফাটে।। ১৪৭
> মহা চাষা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে।
> ক্ষুধায় ব্যাকুল হৈয়া রাত্রি জাগি মরে।।' ১৪৮''[৩৩২]

শ্রীধরের প্রতি বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এই উক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমরা পুনর্বার তৎকালীন সামাজিক চিত্রের পরিচয় পেয়ে থাকি। এরপর শ্রীধরকে বৈষ্ণবেরা চৈতন্যদেবের সম্মুখে নিয়ে আসে। চৈতন্যদেব তখন শ্রীধরের কাছে নিজ পূর্বকথন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। বিদ্যা বিলাসের সময় পরম উদ্ধত চৈতন্যদেব প্রতিদিন কীভাবে শ্রীধরের সঙ্গে খোলা কেনা নিয়ে রঙ্গ-কৌতুক মিশ্রিত তর্ক-বিতর্ক করতেন — তার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। শ্রীধরের সঙ্গে এভাবে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে চৈতন্যদেব তাঁকে নিজ মহা-ঐশ্বর্য দর্শন করতে বলেন। চৈতন্যদেবের স্বীয় স্বরূপ ঐশ্বর্যের যে দর্শন শ্রীধর করেছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন —

> ''মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
> তমাল-শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর।। ১৯০
> হাতে বংশী মোহন, দক্ষিণে বলরাম।
> মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান। ১৯১

কমলা তাম্বুল দেই হস্তের উপরে।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে।। ১৯২
মহা ফণা-ছত্র দেখে শিরের উপরে।
সনক, নারদ, শুক, দেখে জোড় করে।। ১৯৩”[৩৩৩]

চৈতন্যদেবের এই মহা ঐশ্বর্য দর্শন করে শ্রীধর মূর্ছিত হয়ে পড়েন। পরে, চৈতন্যদেবের ডাকে শ্রীধর জ্ঞান ফিরে পান এবং চৈতন্যদেবের স্তব করতে শুরু করেন। শ্রীধর চৈতন্যদেবের যে স্তব-স্তুতি করেছেন, তা থেকে কবির ভক্তিবিগলিত হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে থাকি। শ্রীধরের এই স্তব-স্তুতির মধ্য দিয়েও কবি পুনর্বার জানিয়েছেন যে, গোকুলবিহারী কৃষ্ণই নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তবে, কৃষ্ণরূপে দুই-চারজন মুষ্টিমেয় ভক্তের কাছে তাঁর প্রকাশ থাকলেও সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীব ভক্তির অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু আজ চৈতন্যদেব নিজ প্রেমভক্তি বিতরণের দ্বারা সকল জীবের কাছেই বদ্ধ। শ্রীধরের মুখ থেকে এই স্তব-স্তুতি শ্রবণ করে চৈতন্যদেব তাঁকে বরদান করতে উদ্যত হন। কিন্তু শ্রীধর বর গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে চৈতন্যদেব তাঁকে পুনর্বার বর নিতে অনুরোধ করেন। তখন শ্রীধর চৈতন্যদেবকে ভক্তিবিগলিত প্রেমাশ্রুতে লিপ্ত হয়ে বলেন —

“যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ।। ২২৪
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউ তাঁর চরণ যুগল।। ২২৫”[৩৩৪]

শ্রীধরের এই বর প্রার্থনায় চৈতন্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে প্রেমভক্তি দান করেন। আসলে বৈষ্ণবের কাছে অভিপ্সিত বস্তুই হল প্রেমভক্তি। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রেমভক্তি ধন-ঐশ্বর্য-মান-যশ-খ্যাতি-প্রতিপত্তি সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে। তাই কবি বলেছেন —

“কি করিব বিদ্যা-ধন-রূপ-বেশ কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে।। ২৩৪
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটি কল্পে কোটীশ্বরে না দেখিল তাহা।। ২৩৫”[৩৩৫]

আসলে, বিষয়ের মধ্য দিয়ে কেবল নিজ অহঙ্কারই প্রকাশ পায়। সেখানে থাকে না কোন দীনতা। ধন কিংবা বিদ্যার গর্বে গর্বিত ব্যক্তি তাই প্রেম-ভক্তি থেকে বিচ্যুত হন। কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে প্রেমভক্তিই হল একমাত্র উপায়। শ্রীধরের কাহিনি বিবৃত করে কবি যেন এই অধ্যায়ে প্রেমভক্তি অর্জনেরই উপদেশ দিয়েছেন পরোক্ষ ভাবে। আবার, বৈষ্ণব ভক্তের কাছে যে বাহ্যিক দারিদ্র্য দুঃখকর বলে মনে হয় না — তাও শ্রীধরের এই কাহিনি থেকে আমরা জানতে পারি। এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে অবশ্য

কবি পুনর্বার বৈষ্ণবদের নিন্দা করতে বিরত করেছেন নিন্দুকদের। তাই নিন্দুকদের প্রতি কবির আবেদন —

> ‘‘প্রেমভক্তি হয় কৃষ্ণচরণারবিন্দে।
> সেই কৃষ্ণ পায়ে যে বৈষ্ণবে না নিন্দে।। ২৪৪
> নিন্দায়ে নাহিক কার্য্য, সব পাপ লাভ।
> এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহাভাগ।। ২৪৫’’ [৩৩৬]

‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যের ‘মধ্যখণ্ড’-এর দশম অধ্যায়েও কবি চৈতন্যদেবের মহাভাব-ঐশ্বর্য প্রকাশের বর্ণনা দিয়েই কাহিনির সূত্রপাত করেছেন। এই সময় আর এক বৈষ্ণব ভক্ত মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবকে রঘুনাথরূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন। মুরারি গুপ্ত যেহেতু ছিলেন রামচন্দ্রের উপাসক; তাই তিনি চৈতন্যদেবকে রামচন্দ্র রূপেই দর্শন করলেন। প্রসঙ্গত কবি চৈতন্যদেবের মধ্যে রামচন্দ্ররূপের ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন —

> ‘‘দূর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
> বীরাসনে বসি আছে মহা ধনুর্দ্ধর।। ৭
> জানকী লক্ষ্মণ দেখে — বামেতে দক্ষিণে।
> চৌদিগে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে।। ৮’’[৩৩৭]

চৈতন্যদেবের মধ্যে রামচন্দ্রের মহাভাব ঐশ্বর্য লক্ষ করে এবং রামচন্দ্রের প্রেমে আবিষ্ট হয়ে মুরারি গুপ্ত মূর্ছিত হয়ে পড়েন। পরে চৈতন্যদেবের ডাকে তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিরে পান। চৈতন্যদেব মুরারি গুপ্তকে তখন তাঁর পূর্বপরিচয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন — ত্রেতা যুগে তিনি ছিলেন রাম ভক্ত হনুমান। চৈতন্যদেবের মুখে এই কথা শ্রবণ করে মুরারি গুপ্ত প্রেমাবেশে লিপ্ত হন। চৈতন্যদেব তখন মুরারি গুপ্তকে বর চাইতে বললে মুরারি গুপ্ত জন্মে জন্মে তাঁর ‘দাস’ হবার বাসনা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ চৈতন্যদেব যে স্বয়ং ঈশ্বর একথা সকল বৈষ্ণবের কাছে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল এই মহাভাব ঐশ্বর্য প্রকাশের ফলে। আবার লক্ষণীয়, কবি মুরারি গুপ্ত প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন —

> ‘‘ঠাকুর চৈতন্য বোলে ‘‘শুন সর্ব্ব গণ।
> সকৃত মুরারি নিন্দা করে যেই জন।। ২৮
> কোটি গঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
> গঙ্গা-হরি-নামে তার করিব সংহার।। ২৯’’[৩৩৮]

মুরারি গুপ্ত প্রসঙ্গে কবির এই ধরনের উক্তি প্রয়োগের কারণ অনুসন্ধানে মনে হয়, কবি এই বৈষ্ণবের প্রতি একদিকে যেমন দীনতা প্রকাশ করেছেন, অপরদিকে তেমনি মুরারি গুপ্তের বিপক্ষে যেসব নিন্দুকেরা ছিলেন তাদের সাবধান বাণীও নিক্ষেপ করেছেন। আসলে এই মুরারি গুপ্ত ছিলেন চৈতন্যদেবের পার্ষদ

ও সংস্কৃতে চৈতন্যজীবনীর রচয়িতা। মুরারি গুপ্ত রচিত সংস্কৃত চৈতন্য জীবনী কাব্যটি 'মুরারিগুপ্তের কড়চা' নামে পরিচিত। এই কাব্যটি বৃন্দাবন দাসের কাব্য রচনার তথ্য অনুসন্ধানে সহায়ক হয়েছিল বলে কবির পূর্বকবি সম্পর্কে এরূপ দীনতা প্রকাশ বলেও মনে করতে পারি।

এরপর, কবি এই অধ্যায়ে হরিদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। হরিদাসের প্রতি দৃঢ়তার সঙ্গে চৈতন্যদেব বলেছেন — জাতিগত ভাবে তাঁদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। যবন কুলে আবির্ভূত হলেও চৈতন্যদেবের মতে নিজ কর্মের দ্বারা হরিদাস ছিলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ। অত্যাচারিত যবনরাজেরা হরিদাসের প্রতি কি পরিমাণ উৎপীড়ন করেছিল তা পুনরায় স্মরণ করেন চৈতন্যদেব। আবার, চৈতন্যদেব সেই সমস্ত অত্যাচারী যবন রাজাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে চাইলে হরিদাসই তাদের প্রতি কৃপাভাজন হয়ে ওঠেন। এই কারণে চৈতন্যদেব হরিদাসকে বলেছেন —

''আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি লেখ'।
তখননেহ তা' সভারে মনে ভাল দেখ।। ৪০''[৩৩৯]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব বলতে চেয়েছেন হরিদাস অত্যাচারিত যবনদের কৃপাবশত মঙ্গল কামনা করেছেন বলেই তিনি চক্রদ্বারা তাদের সংহারের সঙ্কল্প থেকে বিরত থেকেছেন। আর হরিদাসের প্রতি যবনদের এই পাশবিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চৈতন্যদেব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। চৈতন্যদেবের মুখে ভক্তের প্রতি ভগবানের কারুণ্যের কথা শ্রবণ করে হরিদাস কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। চৈতন্যদেব তখন তাঁকে নিজ মহাভাব ঐশ্বর্য দর্শন করতে বললে হরিদাস শুধু স্তব-স্তুতির দ্বারা চৈতন্যদেবের মহিমাকীর্তন করেন। চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে হরিদাস বলেন — তোমার যে স্মরণ গ্রহণ করে সে সকল বিষয়ে হীন হলেও তাঁকে তুমি রক্ষা করো। তবে তোমার সেই কৃপালাভের শক্তি, সামর্থ্য বা যোগ্যতা আমার নেই। তাই চৈতন্যদেবের কাছে হরিদাসের কিছুই চাইবার নেই বলে তিনি জানান। কিন্তু চৈতন্যদেব মহাভাব ঐশ্বর্যে পুনর্বার তাঁকে বর চাইতে বললে হরিদাস বলেন —

''তোমার চরণ ভজে — যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস।। ৮৫
সেই সে ভোজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধর্ম্ম।। ৮৬''[৩৪০]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের কাছে হরিদাস জন্মে জন্মে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট প্রার্থনা করেন। হরিদাসের এই বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ করতে দেখে চৈতন্যদেব তাঁকে বর দান করেন। প্রসঙ্গত কবি হরিদাসের এই কাহিনির পরিসমাপ্তিতে বলেন —

''জাতি কুল ক্রিয়া ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে।। ৯৮''[৩৪১]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব বা কৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য যে ভক্তি মিশ্রিত প্রেমের প্রয়োজন তা যেন কবি পুনরায় পাঠকবর্গকে জানিয়ে দেন। এরপর কবি বেশ কিছু পয়ার জুড়ে পরম বৈষ্ণব হরিদাসের মহিমাকীর্তন করেছেন।

এরপর কবি এই অধ্যায়েই অদ্বৈতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। অদ্বৈতের কাছেও চৈতন্যদেব পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করান। অদ্বৈত আচার্য্য ছিলেন শাস্ত্রে পণ্ডিত অধ্যাপক ব্যক্তি। তিনি শাস্ত্র পড়াবার সময় কেবলমাত্র ভক্তি তাৎপর্যময় অর্থই প্রকাশ করতেন। অন্য কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করতেন না। এই অদ্বৈতাচার্য্য একদিন এক শ্লোকের ভক্তিতাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পেরে দুঃখে উপবাস করলে ভগবান স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে সেই শ্লোকের ভক্তিমূলক অর্থ প্রকাশ করেন। পূর্বের এই কাহিনি স্মরণ করিয়ে অদ্বৈতাচার্য্যকে চৈতন্যদেব নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশের কথা বলেন। শুধু তাই নয়, তিনি পরমতত্ত্ব বিষয়ে গীতার একটি শ্লোকের যথার্থ ব্যাখ্যা দান করেন অদ্বৈতের কাছে। চৈতন্যদেবের কাছ থেকে এই গীতার নব ব্যাখ্যা শ্রবণ করে অদ্বৈত আচার্য্য কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ক্রন্দন করতে থাকেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন চৈতন্যদেবকে বলেন —

"অদ্বৈত বোলয়ে 'আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে, মোর নাথ তুঞি।।' ১৩৩"[৩৪২]

এরপর, দীর্ঘ বেশ কিছু পয়ার জুড়ে কবি অদ্বৈতের মহিমা বর্ণনা করেছেন। অদ্বৈতের প্রতি কবির এই মহিমা বর্ণনা দেখে মনে হয় এখানেও কবির বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ পেয়েছে। কবি বলেছেন — চৈতন্যদেবের চরণ বন্দনা করাই অদ্বৈতাচার্যের প্রধান কার্য। তাই যে সব বৈষ্ণব ভক্ত চৈতন্যদেবকে না পূজা করে অদ্বৈতের ভজনা করেন, তাঁরা অদ্বৈত আচার্যের কৃপাভাজন হন না। কবির এই উক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে অদ্বৈতাচার্যের প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে অদ্বৈতাচার্যের প্রভাব যে চৈতন্যাপেক্ষা অধিক হয়ে উঠেছিল তার ইঙ্গিত কবির এই উক্তিতে স্পষ্ট বলেই মনে হয়। আবার, কবি যখন কাব্যটি প্রণয়ন করেন সেই সময় বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে ভক্তদের মধ্যে যে 'অদ্বৈতভক্ত' কিংবা 'চৈতন্যভক্ত' কিংবা 'নিত্যানন্দ ভক্ত' — এই হিসাবে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তারও প্রমাণ আমরা কবির পাঠকের প্রতি এই উক্তি প্রয়োগ থেকেই অনুধাবন করতে পারি। কবি তাই যেন বার বার এই অংশে 'অদ্বৈতভক্ত'-দের পরিচয় দান করতে গিয়ে বলেছেন —

"যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্ব-সিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি।। ১৫০
ইহা বলিতেই আইসে ধাইয়া মারিবারে।
অহো মায়া বলবতী! কি বলিব তারে।। ১৫১"[৩৪৩]

এভাবে কবি অদ্বৈতাচার্য্যের মহিমা বর্ণনা করবার পর চৈতন্যদেবের কাছে বৈষ্ণব ভক্তগণের

বর প্রার্থনা ও আশীর্বাদ প্রাপ্তির কাহিনি বর্ণনা করেছেন অণুপুঙ্ক্ষভাবে। এরপর কবি মুকুন্দ দত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এই মুকুন্দ দত্ত ছিলেন চৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ। কিন্তু এই মুকুন্দ দত্তের প্রতি চৈতন্যদেব গভীর রাগ প্রকাশ করে বলেন —

> ''প্রভু বোলে 'ও বেটা যখন যথা যায়।
> সেইমত কথা কহি তথায় মিশায়।। ১৮৬''[৩৪৪]

অর্থাৎ, কখনও মুকুন্দ নিজের ভক্তিভাবকে প্রকাশ করে যেমন পরম ভক্তিমান মনে করতেন নিজেকে, তেমনি কখনও কর্মী বা জ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কর্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে ভক্তির অপকর্ষ কীর্তন করতেন। মুকুন্দের চরিত্রের এই বৈপরীত্যের কথা চৈতন্যদেব জানতে পেরে তাঁর প্রতি বিরূপ হন। কিন্তু মুকুন্দের দুঃখ দেখে তাঁর প্রতি কৃপা হয় চৈতন্যদেবের। চৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করে মুকুন্দ দত্ত পরমানন্দ লাভ করেন এবং চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ প্রার্থী হন। এরপর মুকুন্দ দত্ত চৈতন্যদেবের স্তব-স্তুতি করেন এবং নিজের ভক্তিশূন্য হৃদয়ের প্রতি নিজেই আক্ষেপ করে বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেন। মুকুন্দ দত্তের নিজের প্রতি এই খেদোক্তি দেখে চৈতন্যদেব নিজেই লজ্জিত হন এবং তাঁকে প্রেম মিশ্রিত শুদ্ধ ভক্তির মমার্থ বুঝিয়ে আশীর্বাদ দান করে বলেন —

> ''যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
> তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার।। ২৫৮''[৩৪৫]

এভাবে, চৈতন্যদেব শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে মহাভাব ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। সকল বৈষ্ণব ভক্তগণই নিজ নিজ উপাস্য রূপে চৈতন্যদেবের আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন। এরপর কবি ভক্তিহীনতার কারণে কি দোষ ঘটে এবং ভক্তির মহিমা বর্ণনা করেছেন। কবি এই অংশে বলেছেন চৈতন্যদেবের লীলা আজও সমভাবে প্রকটিত। তবে, যার ভক্তিবিগলিত দৃষ্টি রয়েছে সেই কেবল চৈতন্যলীলা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। চৈতন্যদেব নিজ ভক্ত-বৈষ্ণবের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেছেন এই অংশে। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় কবি বৃন্দাবন দাস এই অংশে নিজ মাতা নারায়ণী দেবীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন —

> ''ভোজনের অবশেষে যতেক আছিল।
> নারায়ণী পুন্যবতী তাহা সে পাইল।। ২৮৮
> শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা — বালিকা অজ্ঞান।
> তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান।। ২৮৯''[৩৪৬]

এই 'শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা' নারায়ণী দেবীই ছিলেন কবির মাতা। তবে, কবি এই অধ্যায়ের শেষে নিজ গুরুদেব নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করতেও কার্পন্য করেন নি। তিনি স্বীকার করেছেন নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত চৈতন্যপ্রাপ্তি সম্ভব নয় —

> ''নিত্যানন্দ কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভক্ত তত্ত্ব জানি।। ৩০৬

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দ রায়।

সভে নিত্যানন্দ স্থানে ভক্ত-পদ পায়।। ৩০৭”[৩৪৭]

এভাবে, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের মহিমা বর্ণনার মধ্য দিয়েই কবি এই ‘মধ্যখণ্ড’-এর দশম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

‘মধ্যখণ্ড’-এর একাদশ অধ্যায়ে কবি চৈতন্যদেবের স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশের প্রসঙ্গ দিয়েই কাহিনির সূচনা করেছেন। চৈতন্যদেবের এই স্বরূপ তত্ত্ব প্রকাশিত হত শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে। আর এই শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই থাকতেন নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ বাল্যভাবাবেশে শ্রীবাসকে যেমন ‘বাবা’ বলে সম্বোধন করতেন তেমনি শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবীর স্তন পান করতেন অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে। কবি বর্ণিত নিত্যানন্দের এরূপ বাল্যভাবে মালিনীর স্তন পান প্রসঙ্গে কতটা বাস্তবতা রয়েছে — এ তথ্য সম্পর্কে অবশ্যই আমরা সন্দিহান। কবি অবশ্য বলেছেন ঐশ্বর্যশক্তি বা লীলা শক্তির প্রভাবেই এরূপ সম্ভব। আর তাই নিত্যানন্দ যেমন মালিনীকে মা বলে ভাবতেন, তেমনি মালিনীও নিত্যানন্দকে সবসময় বাল্যভাবাপন্ন শিশুরূপেই দেখতেন। আবার, বাল্যভাবে নিত্যানন্দ যখন শ্রীবাসের বাড়িতে থাকতেন তখন চৈতন্যদেব তাঁকে চাঞ্চল্য প্রকাশ না করতে শিক্ষা দেন। চৈতন্যদেবের কাছে তখন নিত্যানন্দ স্বীকার করেন তিনি চঞ্চল হলেও শ্রীবাসের গৃহে আর কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ করবে না। তাঁর চঞ্চলতা প্রকাশ পেলেই চৈতন্যদেব যেন তাঁকে উচিত শিক্ষা দেন। কিন্তু সে মুহূর্তেই নিত্যানন্দ পরমানন্দে যে ব্যবহার করেন তার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন —

“আনন্দে না জানে বাহ্য কোন্ কর্ম্ম করে।

দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে।। ২২

জোড়ে জোড়ে লাফ দেই হাসিয়া হাসিয়া।

সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া।। ২৩”[৩৪৮]

নিত্যানন্দের এরূপ দিগম্বর অবস্থা দেখে গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত ও হরিদাস ঠাকুর হাসতে থাকলে চৈতন্যদেব তাঁকে শিক্ষা দান করেন আর চঞ্চলতা প্রকাশ না করবার। কিন্তু বাল্যভাবের আবেশে চাঞ্চল্য প্রদর্শন করা নিত্যানন্দের স্বভাব।

শ্রীবাসের কৃষ্ণ-নৈবেদ্যের ঘৃতপাত্র একদিন এক কাক নিয়ে পলায়ন করে। শ্রীবাস শুনতে পেলে ক্রুদ্ধ হবেন — এই ভয়ে মালিনী দেবী ক্রন্দন করতে থাকেন। নিত্যানন্দ মালিনী দেবীকে ক্রন্দন করতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে মালিনী দেবী বলেন —

“মালিনী বোলয়ে ‘শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।

ঘৃতপাত্র কাকে লই গেল কোন্ ঠাঞি’।। ৩৯”[৩৪৯]

নিত্যানন্দ মালিনী দেবীর কান্নার কারণ জানতে পেরে তাঁকে চিন্তা করতে না বলেন। এরপর নিত্যানন্দ নিজ অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে কাকের কাছ থেকে সেই ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ করেন। নিত্যানন্দ কাকের কাছ থেকে ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ করেছেন দেখে মালিনী দেবী তখন তাঁর স্তব-স্তুতি করতে থাকেন। মালিনী দেবী নিত্যানন্দের প্রতি যে স্তব করেছেন তাতে কবির নিজ গুরুদেবের প্রতি বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ পেয়েছে বলেই মনে হয়। মালিনী দেবীর স্তব শুনে নিত্যানন্দ পুনরায় বাল্যভাবাবেশে মালিনীর স্তন পান করতে চান। কবি নিজেও জানেন, অনেকে এই ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে পারে। তাই কবি নিজেই বলেছেন—

> ''এইমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
> আমি কি বলিব — সর্ব্বজগতে বিদিত।। ৫৯''[৩৫০]

এভাবে কবি নিজ গুরু নিত্যানন্দের ঐশ্বর্যের মহিমা কীর্তন করে তাঁর চরণ বন্দনা করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় নিত্যানন্দের নিন্দুকদের প্রতি কবি বিরূপ মন্তব্য করতে কোনরূপ সঙ্কোচবোধ করেন নি। নিত্যানন্দের নিন্দুকদের প্রতি কবির মন্তব্য —

> ''এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
> তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।। ৬৪''[৩৫১]

এরপর কবি চৈতন্যদেবের গৃহে গিয়ে নিত্যানন্দের বাল্যভাবে পুনর্বার দিগম্বর হবার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। নিত্যানন্দকে এই দিগম্বর অবস্থায় দেখে চৈতন্যদেব বিস্মিত হন এবং নিত্যানন্দের এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে মগ্ন হয়ে চৈতন্যদেবের প্রশ্নের অসংলগ্ন উত্তর দেন। তখন চৈতন্যদেব নিজে গিয়ে নিত্যানন্দের বসন পরিয়ে দেন। শচীমাতা নিত্যানন্দকে নিজ পুত্র বিশ্বরূপ মনে করে অপত্যস্নেহ করতেন। শচীমাতা প্রদত্ত ক্ষীর-সন্দেশ ভোজন করতে গিয়ে নিত্যানন্দ নিজ অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ ঘটান। শচীমাতা নিত্যানন্দকে তখন স্বয়ং ঈশ্বর বলে চিনতে পারেন। এরপর কবি পুনরায় নিত্যানন্দের মহিমা বন্দনার মধ্য দিয়ে এই একাদশ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

'মধ্যখণ্ড'-এর দ্বাদশ অধ্যায়েও কবি অনুরূপে নিজ গুরুদেব নিত্যানন্দের মহিমা বর্ণনা করেছেন। নিত্যানন্দ বাল্যভাবাবেশে কি কি ঐশ্বর্য প্রকাশ করতেন কবি এই অধ্যায়ে পুনর্বার তার অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ষায় পরিপূর্ণ গঙ্গা নদীতে কুমীরের ভয়কে উপেক্ষা করে বাল্যভাবে নিত্যানন্দ দীর্ঘক্ষণ ধরে স্নান করতেন। আবার, বাল্যভাবে চাঞ্চল্য প্রকাশ করে ভাবাবেশে নিত্যানন্দ কখনও দিগম্বর হয়েও ভ্রমণ করতেন বলেও পুনর্বার কবি এই অধ্যায়ে জানিয়েছেন। নিত্যানন্দের এরূপ দিগম্বর বাল্যভাবাবেশ দেখে চৈতন্যদেব নিজ হস্তে তাঁকে কাপড় পরিয়ে দেন এবং নিজের সম্মুখে বসান। এরপর চৈতন্যদেব নিজে যে নিত্যানন্দের স্তুতি করেছেন তা কবির নিজ গুরুদেবের প্রতি স্তুতিমূলক বিনয় প্রকাশ বলেই মনে হয়। এই অংশে কবি নিত্যানন্দের যে মহিমাকীর্তন করেছেন পরোক্ষভাবে তা কবির বৈষ্ণবোচিত

ভাবাবেগকেই ফুটিয়ে তুলেছে। আবার, নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের মধ্যে যে কতটা সখ্যতা ছিল — তাও যেন এই অংশের বর্ণনার মাধ্যমে কবি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কবি আরো জানান— স্বয়ং চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের কাছ থেকে তাঁর একখানি কৌপীন ভিক্ষা করেন অর্থাৎ চেয়ে নেন এবং তারপর সেই কৌপীন খণ্ড খণ্ড করে ছিড়ে প্রত্যেক বৈষ্ণবভক্তবৃন্দকে এক এক খণ্ড করে দান করেন। চৈতন্যদেব সেই টুকরো করা বস্ত্রখণ্ডগুলিকে প্রত্যেক বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের মাথায় বাঁধতে বলেন। কারণ হিসাবে চৈতন্যদেব বলেন —

''নিত্যানন্দ প্রসাদে সে হয় বিষ্ণুভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি।। ২৫
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই।। ২৬''[৩৫২]

অর্থাৎ, নিত্যানন্দ যেহেতু ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ এবং স্বয়ং বলরামের অবতার — তাই নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত বিষ্ণুভক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আবার কৃষ্ণসেবায় নিত্যানন্দ অদ্বিতীয় হওয়ায় তাঁর কৃপা লাভ করবার জন্য চৈতন্যদেব বৈষ্ণবভক্তবৃন্দকে তাঁর পরিহিত টুকরো করা কাপড় মাথায় বাঁধতে বলেন ও বাড়ি নিয়ে গিয়ে পূজো করতে বলেন। শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের পাদোদক-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন এবং বৈষ্ণব ভক্তদের সেই নিত্যানন্দ পাদোদক গ্রহণ করতে বলেন। চৈতন্যদেবের কাছ থেকে নিত্যানন্দের পাদোদক মাহাত্ম্য শ্রবণ করে সকল বৈষ্ণবেরা পরমানন্দে ও প্রেমোল্লাসে নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে প্রত্যেকেই লিপ্ত হন। সকল বৈষ্ণবেরাই তখন উচ্চস্বরে হরিনাম সঙ্কীর্তন করতে থাকেন। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়েই প্রেমাবেশে এই হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন। সঙ্কীর্তন সমাপ্ত করে চৈতন্যদেব পুনরায় বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে নিত্যানন্দ সম্পর্কে যে মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন তা কবির নিজ অভিপ্রেত বলেই মনে হয়। চৈতন্যদেবের মাধ্যমে আসলে কবি যেন নিজেই বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে বলতে চেয়েছেন —

''প্রভু বোলে 'এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।। ৫৪
ইহান চরণ ব্রহ্মা-শিবেরো বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সভে প্রীত।।' ৫৫''[৩৫৩]

শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেব আরো বলেছেন, এত সত্ত্বেও যে বৈষ্ণব ভক্ত নিত্যানন্দের অবজ্ঞা করবেন সে কখনোই আমার প্রিয় হতে পারে না। আমাদের স্বীকার করতে দ্বিধা থাকে না যে, চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ সম্পর্কে এই কথা বললেও পরক্ষভাবে এই উক্তি আসলে কবি বৃন্দাবন দাসের। এই অধ্যায়ে আসলে কবি গুরুদেব নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য কীর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি নিজ বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ করেছেন।

'মধ্যখণ্ড'-এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কবি পুনরায় চৈতন্যদেবের স্বরূপ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলেছেন, সকল নবদ্বীপবাসী কিন্তু চৈতন্যদেবের এই ঐশ্বর্য প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে পারতেন না। কেবলমাত্র যাঁদের চৈতন্যদেবের স্বরূপ-তত্ত্ব দেখবার মত দৃষ্টি ও প্রেমভক্তি রয়েছে তারাই এই ঐশ্বর্য দৃষ্টিগোচর করতে পারতেন। চৈতন্যদেব এভাবে নবদ্বীপে যখন নিজ ভগবৎস্বরূপ সম্যকরূপে প্রকাশ করে চলেছেন, ঠিক সময় নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি তিনি আদেশ করেন—

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।

কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর' কৃষ্ণ-শিক্ষা।। ৭"[৩৫৪]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব কৃষ্ণভজনের জন্য সকল নদীয়া তথা নবদ্বীপবাসীর কাছে প্রার্থনা জানাতে বলেন। নবদ্বীপবাসী জনসাধারণের প্রতি চৈতন্যদেব কৃষ্ণভজনের জন্য নিজ উপদেশ প্রচার করতে বললে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিরা নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে থাকেন নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে। এমনকি রাজদরবারে ধরিয়ে দেবার ভয়ও দেখায়। নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি প্রয়োগ থেকে আমরা তৎকালীন সামাজিক চিত্রের পরিচয় পেয়ে থাকি। এভাবে চৈতন্যদেব নদীয়া তথা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম প্রচার করেন।

এরপর কবি এই অধ্যায়েই জগাই-মাধাই এর প্রসঙ্গ আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হলেও জগাই-মাধাই ছিল ডাকাত। অন্যের সম্পত্তি চুরি করা এবং ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য মদ ও গোমাংস ভক্ষণ করা ছিল এদের নিত্য কর্ম। মদের নেশায় এই জগাই-মাধাই বিভোর হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যায় এবং পথিকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। এমন সময় নিত্যানন্দ ও হরিদাস সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে দূর থেকে এই দুই মাতালের কার্যকলাপ লক্ষ করে নিত্যানন্দ সমবেত লোকদের কাছে এদের পরিচয় জানতে চান। সমবেত লোকেরা বলেন সৎ ব্রাহ্মণ বংশে এদের জন্ম হলেও —

"হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুজন।

ডাকা, চুরি, মদ্য-মাংস করয়ে ভক্ষণ।। ৫০"[৩৫৫]

সমবেত লোকেদের কাছে জগাই-মাধাইয়ের পরিচয় পেয়ে নিত্যানন্দের তাদের প্রতি বড় করুণা হয়। নিত্যানন্দ তাই এই দুই পাপীর উদ্ধারের জন্য হরিদাসের কাছে আবেদন করতে থাকেন। কারণ হরিদাসের ইচ্ছা কখনই অপূর্ণ রাখেন না চৈতন্যদেব। কিন্তু হরিদাস জানেন চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের ইচ্ছার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাঁদের উভয়ের স্বরূপ অভিন্ন। তাই নিত্যানন্দ ও হরিদাস উভয়ে মিলে জগাই-মাধাইকে উপদেশ দান করে বলেন—

"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, বল কৃষ্ণ নাম।

কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।। ৮১

তোমা' সভা' লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।

হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার।। ৮২”[৩৫৬]

কিন্তু নিত্যানন্দ ও হরিদাসের এই উপদেশ শুনে জগাই-মাধাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁদের ধরতে উদ্যত হন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস এই দুই মদ্যপের আচরণে সত্যিই ভীত হন এবং পলায়ন করেন। তবে, পলায়নকালে নিত্যানন্দ ও হরিদাস যে কলহোক্তি করেছেন এবং পরস্পরের প্রতি দোষ দিয়েছেন তা থেকে উভয়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেতে পারি। হরিদাস নিত্যানন্দকে 'চঞ্চল' বলে ব্যঙ্গ করলে প্রত্যুত্তরে নিত্যানন্দ হরিদাসের প্রভু চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা তাঁর খেদোক্তি বলেই মনে হয়। চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে নিত্যানন্দ বলেছেন —

“ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান বোল বলি সব প্রতি ঘরে ঘরে।। ১০২
কোথাও যে নাহি শুনি, সেই আজ্ঞা তাঁর।
'চোর ঢঙ্গ' বই লোক নাহি বোলে আর।। ১০৩”[৩৫৭]

যদিও কবি বলেছেন নিত্যানন্দের চৈতন্যদেবের প্রতি এই উক্তি প্রয়োগ আসলে 'আনন্দ-কন্দল' বা প্রণয় কলহ। আসলে চৈতন্যদেবের প্রতি নিত্যানন্দ ব্যাজস্তুতি প্রয়োগ করেছেন এই উক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কবি যেন নিত্যানন্দের স্বভাবের কুরুচিময় দিকটি প্রকাশ করে ফেলেছেন এক্ষেত্রে নিজের অজান্তেই। যাই হোক, এরপর নিত্যানন্দ ও হরিদাস চৈতন্যদেবের কাছে গিয়ে জগাই ও মাধাইয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন এবং জগাই-মাধাইকে উদ্ধারের জন্য নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের কাছে আবেদন করেন। নিত্যানন্দের কথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব স্বীকার করেন যে তিনি জগাই-মাধাই-কে উদ্ধার করবেন।

এরপর কবি অদ্বৈতাচার্যের কাছে গিয়ে হরিদাসের নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে অনুযোগের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রেও হরিদাস নিত্যানন্দের কাছে যে 'চঞ্চলতা' প্রকাশ করেছেন তা থেকে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। নিত্যানন্দের চঞ্চলতার বিবিধ পরিচয় দিয়ে হরিদাস বলেছেন, সে যদি তাঁকে শিক্ষা দিতে যায় তাহলে নিত্যনন্দ তিরস্কার করেন। এমনকি অদ্বৈত আচার্য কিংবা চৈতন্যদেবকেও তিনি ভয় করেন না বলে জানান। কবির দেওয়া এই বর্ণনা থেকে আমরা নিত্যানন্দের চরিত্রের পরিচয় পেয়ে। অদ্বৈতাচার্য এরপর নিত্যানন্দ প্রতি ব্যাজস্তুতিময় উক্তি প্রয়োগ করেন। কবি কিন্তু খুব সচেতন ভাবে এক্ষেত্রেও বৈষ্ণব বিভাজনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আমরা বুঝতে পারি, একদিকে যেমন অদ্বৈত মতপন্থী বৈষ্ণবভক্তের সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি অপরদিকে গদাধরপন্থী কিংবা নিত্যানন্দপন্থী বৈষ্ণব ভক্তের সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই ভিন্ন ভিন্ন মতপন্থী বৈষ্ণবদের মধ্যে বিভেদ ছিল প্রবল। কবি এই ভিন্নমতপন্থী বৈষ্ণবভক্তদের মধ্যে সমন্বয়সূত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাই কবি বলেছেন—

“এবে পাপিসব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।

গদাধর নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া।। ১৫৭

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।

অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে', সেই যায় ক্ষয়।। ১৫৮"[৩৫৮]

এরপর কবি অবশ্য পুনর্বার জগাই-মাধাইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। জগাই ও মাধাই উভয়েই চৈতন্যদেবের বাড়ির কাছে রাত্রিযাপন করতে থাকেন দস্যুবৃত্তির কারণে। রাত্রিবেলা তারা চৈতন্যদেবের হরিনাম কীর্তন শ্রবণ করে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' বলে মনে করে। কবির দেওয়া এই বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' যে বহুল প্রচলিত ছিল তা বুঝতে পারি। আবার, একদিন রাত্রিবেলা জগাই-মাধাইয়ের কাছে ধৃত হন নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দের মাথায় মুকুটি দিয়ে প্রহার করেন মাধাই। এতে নিত্যানন্দের শিরচ্ছেদ হয়। পুনর্বার মাধাই নিত্যানন্দকে মারতে উদ্যত হলে জগাই বাধা দেয়। এই সংবাদ চৈতন্যদেবের কাছে পৌঁছয়। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ স্থানে এসে ক্রুদ্ধ হন এবং বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হয়ে চক্রের আহ্বান করতে থাকেন জগাই-মাধাইকে সংহারের জন্য। কিন্তু জগাই-মাধাইকে রক্ষার জন্য নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের প্রতি নিবেদন করে বলেন —

"মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই।

দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই।। ১৮৬

মোরে ভিক্ষা দেহ' প্রভু! এ দুই শরীর।

কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির।। ১৮৭"[৩৫৯]

নিত্যানন্দের এই নিবেদন শুনে জগাইয়ের প্রতি করুণায় চৈতন্যদেবের চিত্ত বিগলিত হয়। চৈতন্যদেব তখন পরমানন্দে জগাইকে আলিঙ্গন করেন এবং প্রেমভক্তি প্রদান করেন। চৈতন্যদেব এরপর নিজ ঐশ্বর্যাত্মক চতুর্ভুজ রূপ পরিদর্শন করান জগাইকে। চৈতন্যদেবের অপূর্ব রূপ পরিদর্শন করে জগাই তখন পরমানন্দে মূর্ছিত হন। জগাইয়ের এরূপ কৃষ্ণপ্রেমাবেশ দেখে মাধাইয়েরও মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। চৈতন্যদেবের চরণ ধরে মাধাই তখন নিজের উদ্ধারের জন্য আবেদন করতে থাকেন। চৈতন্যদেব মাধাইকে নিত্যানন্দের কাছে আবেদন করতে বলেন। মাধাই তখন নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাইলে নিত্যানন্দ তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে কাছে টেনে নেন। জগাই-মাধাই এভাবে চৈতন্যদেবের প্রভাবে কৃষ্ণপথে ফিরে এলে উভয়েই নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের স্তব-স্তুতি করতে থাকেন। চৈতন্যদেব জগাই-মাধাইয়ের সঙ্গে নিজ গৃহে হরিনাম-সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন। প্রেমাবেশে সাত্ত্বিকভাবের কারণে জগাই-মাধাই আনন্দাশ্রু নির্গত করতে থাকেন এবং চৈতন্যদেবের মহিমা বন্দনায় লিপ্ত হন। চৈতন্যদেব জগাই-মাধাইয়ের স্তব-স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে নিজ সেবক করে নেন এবং তাদের অর্জিত পাপ লীলাশক্তির প্রভাবে নিজ শরীরে ধারণ করে গৌরদেহকে 'কালিয়া আকার' করে তোলেন। চৈতন্যদেবের এই কৃষ্ণবর্ণ রূপ দেখে সকল বৈষ্ণবভক্তই বিস্মিত হন। তখন

চৈতন্যদেব সকল বৈষ্ণবদের হরিনাম কীর্তন করতে বলেন এবং এর ফলে সেই পাপ যেন বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে সঞ্চিত হয় তার পরামর্শ দেন। চৈতন্যদেবের পরামর্শে সকল বৈষ্ণব ভক্ত সঙ্কীর্তন করতে আরম্ভ করেন এবং তখন নিন্দুকদের কাছে সেই পাপ সঞ্চারিত হয়। জগাই-মাধাইয়ের প্রতি চৈতন্যদেবের কৃপাভাজনের কথা এরপর বলেছেন কবি। জগাই-মাধাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা করবার পরামর্শ দিয়ে চৈতন্যদেব সকল বৈষ্ণবভক্তের সঙ্গে গঙ্গায় গিয়ে উপনীত হন এবং জলক্রীড়ায় আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে সকল বৈষ্ণবভক্তেরা মিলে চৈতন্য সহযোগে এই জলকেলি চলে। চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ভক্তগণের এই জলক্রীড়ার মধ্য দিয়ে কবি তৎকালীন বঙ্গের সামাজিক চিত্রের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। অবশ্য লক্ষণীয় চৈতন্যদেবের এই জলক্রীড়ার বর্ণনার মাঝেই কবি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের কলহের বর্ণনা দিয়েছেন। কবির দেওয়া এই উভয়ের কলহের বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে হয়ত মতপার্থক্য ছিলই। অদ্বৈত আচার্য তাই নিত্যানন্দের সম্পর্কে শ্লেষাত্মক উক্তি প্রয়োগ করে বলেছেন —

> ''নিত্যানন্দ মদ্যপ করিল চক্ষু কাণ।
> কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল উপস্থান।। ৩৪২
> শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি।
> কোথাকার অবধূতে আনি দিলা ঠাঞি।। ৩৪৩''[৩৬০]

যদিও কবি বলেছেন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের এই কলহ আসলে প্রেম-কন্দল। তাই উভয়ের এই মিথ্যা কলহের মধ্যে বাস্তবিক কোন সত্যতা নেই। এই কারণে কবি বলতে বাধ্য হয়েছেন —

> ''হেন রস কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
> ভিন্ন জ্ঞানে নিন্দে' বন্দে' সে মরে পুড়িয়া।। ৩৪৬''[৩৬১]

আসলে মনে হয়, কবি যেন উভয় বৈষ্ণবের মধ্যে সম্মিলনের প্রচেষ্ট করেছেন এই ক্ষেত্রে। তাই কবি অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে পরস্পর 'কোলাকোলী' বা আলিঙ্গন করিয়ে কলহের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এভাবে গঙ্গাস্নান সম্পন্ন করে চৈতন্যদেব নিজ গৃহে ফিরে আসেন এবং তুলসী চরণ বন্দনা করে ভোজন করতে বসেন। পরম সন্তোষে ভোজন সম্পন্ন করে চৈতন্যদেব বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে রয়েছেন দেখে শচীমাতা পরমানন্দ অনুভব করেন। এরপর চৈতন্যদেবের মধ্যাহ্ন শয়নের সময় উপস্থিত হলে সকল বৈষ্ণবেরা বিদায় গ্রহণ করেন। কবি ভক্তনিন্দা কিংবা বৈষ্ণব নিন্দার কারণে কি কি কুফল হতে পারে শাস্ত্র থেকে তার উদাহরণ দিয়ে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি দান করেছেন।

'মধ্যখণ্ড'-এর চতুর্দশ অধ্যায়ে কবি চৈতন্যদেবের ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে দেখে দেবতাদের বিস্ময়ের বিবরণ দিয়ে কাহিনির সূচনা করেছেন। চৈতন্যদেব যেহেতু ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর তাই দেবতারাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বিহার করতেন। তবে কবির মতে, যাদের তা দেখবার মতো দৃষ্টি রয়েছে কেবলমাত্র তারাই

এই ঈশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারেন। চৈতন্যদেব কর্তৃক জগাই-মাধাইকে উদ্ধার হতে দেখে দেবতারা মহানন্দ প্রকাশ করেন। দেবতাদের মত জগাই-মাধাইকে উদ্ধার হতে দেখে ধর্মরাজ যমও পরম বিস্ময় প্রকাশ করেন। চিত্রগুপ্তের কাছে যমরাজ তাই জগাই-মাধাইয়ের পাপের পরিণাম সম্বন্ধে জানতে চাইলে চিত্রগুপ্ত উত্তরে বলেন, এই দুইজনের পর্বত প্রমাণ পাপ রয়েছে। পাপের বোঝা জগাই-মাধাইয়ের এত বেশি যে তা লিখতে লিখতে দূতেদের মাথা পর্যন্ত গরম হয়ে যেত। আর এই কারণে চন্দ্রগুপ্ত বলেছেন—

''আমরাও কান্দিয়াছি ও দুই লাগিয়া।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া।। ১৭
তিল-মাত্র মহাপ্রভু সব কৈলা দূর।
এবে আজ্ঞা কর' 'গড়া' ডুবাই প্রচুর।। ১৮''[৩৬২]

অর্থাৎ জগাই-মাধাইয়ের এত বিপুল পরিমাণ পাপ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু চৈতন্যদেবের কৃপাভাজন হয়ে প্রেমাবেশে লিপ্ত হয়েছিলেন তাই তাদের ইহলৌকিক সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়েছে বলে চিত্রগুপ্ত ধর্মরাজ যমকে জানান। ধর্মরাজ যম একথা শ্রবণ করে নিজেও কৃষ্ণপ্রেমাবেশে লিপ্ত হয়ে মূর্ছিত হন। পরে দেবতাদের হরিনাম সঙ্কীর্তনে ধর্মরাজ যম চেতনা ফিরে পান। তারপর সমস্ত দেবতা মিলে পরমানন্দে হরিনাম সঙ্কীর্তন করেন এবং সেই সঙ্গে নৃত্য করতে আরম্ভ করেন। শুধু তাই নয়, দেবতাগণ কর্তৃক চৈতন্যদেবের মহিমা কীর্তন বর্ণনার মধ্য দিয়ে কবি এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তবে, বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কবি এই অধ্যায়ে চৈতন্যজীবন মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বাস্তবতার চেয়ে কল্পনারই বেশি আশ্রয় নিয়েছেন।

'মধ্যখণ্ড'-এর পঞ্চদশ অধ্যায়েও কবি এরূপ চৈতন্যদেবের অনন্ত ও অচিন্ত্য ঐশ্বর্য বর্ণনার মধ্য দিয়েই কাহিনির সূচনা করেছেন। তবে কবি বলেছেন, চৈতন্যদেবের ঐশ্বর্য প্রকাশিত হলেও বহির্মুখ লোকেরা তাঁর স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। চৈতন্যদেবের প্রভাবে জগাই-মাধাইয়ের কিরূপ মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে তাঁদের পরিবর্তিত নিত্যকর্মের অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন কবি এই অধ্যায়ে। কবি প্রসঙ্গতই বলেছেন —

''জগাই-মাধাই দুই — চৈতন্যকৃপায়।
পরম ধার্ম্মিকরূপে বৈসে নদীয়ায়।। ৩
উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে।। ৪''[৩৬৩]

জগাই-মাধাই কৃষ্ণভক্তিরসের আস্বাদন পেয়ে অত্যন্ত উদার হয়ে উঠেছেন। তাঁদের দেহাবেশ জনিত সঙ্কীর্ণতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে। এখন তাই সমস্ত বস্তুতেই কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনুভব করেন তাঁরা। এমনকি মুখে তাঁদের সর্বদাই 'কৃষ্ণ' নাম। আবার, পূর্বের পাপকর্মের কারণে উভয়ে অনুশোচনা যেমন

করেছেন তেমনি সেই কথা স্মরণ করে অপরাধবোধে ক্রন্দনও করেছেন।

মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহারজনিত অপরাধবোধের কারণে একদিন নিভৃতে নিত্যানন্দের চরণ যুগল ধরে প্রেমাশ্রুতে লিপ্ত হন এবং নিত্যানন্দের স্তব-স্তুতি করেন। নিত্যানন্দের প্রতি মাধাইয়ের যে দীর্ঘ স্তব-স্তুতির বর্ণনা দিয়েছেন কবি তাতে নিজ গুরুদেবের প্রতি বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশিত হয়েছে। কবি এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে যেন নিজে নিত্যানন্দের মহিমা কীর্তন করেছেন বলে মনে হয়। যাই হোক, মাধাইয়ের দীর্ঘ আত্মদংশনের কারণে ও স্তব-স্তুতির ফলে নিত্যানন্দ প্রফুল্ল হয়ে তাঁকে উপদেশ দান করেন। নিত্যানন্দ মাধাইয়ের আত্মধিক্কার প্রকাশ করতে দেখে তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেন —

“উঠ উঠ মাধাই! আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ।। ৬৩
শিশু-পুত্রে মারিলে কি বাপে দুঃখ পায়?
এইমত তোমার প্রহার মোর গায়।। ৬৪”[৩৬৪]

এরপর মাধাই পুনরায় নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি এতদিন যত অপরাধ যাদের কাছে করেছেন তারা কি প্রকারে মাধাইকে ক্ষমা করতে পারে। তখন নিত্যানন্দ মাধাইকে পরামর্শ দিয়ে গঙ্গাঘাট পরিষ্কারের কাজ করতে বলেন। কারণ এই গঙ্গাঘাটে নদীয়ার সমস্ত লোকেরাই গঙ্গাস্নান করতে এলে তাদের অনুগ্রহ ও কৃপা লাভ করতে পারবেন মাধাই। মাধাই নিত্যানন্দের পরামর্শে এরপর থেকে গঙ্গাঘাট পরিষ্কারের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং নদীয়ায় বৈষ্ণব ভক্তগণের কৃপাভাজন হয়ে ‘ব্রহ্মচারী’ নামে খ্যাতি লাভ করেন। কবি মাধাই সম্পর্কিত এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে প্রসঙ্গতই বলেছেন —

“অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
‘মাধাই ঘাট’ বলি সর্ব্বলোকে গায়।। ৯৩”[৩৬৫]

সুতরাং, বিশেষভাবে লক্ষণীয় মধ্যখণ্ডে কবি মূলত চৈতন্যদেবের অনন্ত ঐশ্বর্য প্রকাশের এবং হরিনাম সঙ্কীর্তন প্রচারের কাহিনিকেই মুখ্য বর্ণিত বিষয় করেছেন। অনুরূপে ‘মধ্যখণ্ড’-এর ষোড়শ অধ্যায়েও কবি শ্রীবাসের গৃহে চৈতন্যদেবের হরিনাম সঙ্কীর্তনের বর্ণনা দিয়েই কাহিনির সূচনা করেছেন। একদিন রাত্রিবেলা চৈতন্যদেব শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ির দরজা রুদ্ধ করে দিয়ে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হরিনাম সঙ্কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন। চৈতন্যদেবের এই সঙ্কীর্তন সহযোগে নৃত্য দর্শন করবার জন্য ঔৎসুক্য হয়ে শ্রীবাসের শাশুড়ি বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। এই কারণে চৈতন্যদেব সঙ্কীর্তন সহযোগে নৃত্য করেও প্রফুল্ল হতে পারছিলেন না সেই দিন। চৈতন্যদেব তাই পার্ষদদের উদ্দেশ্যে বলেছেন —

“পুনঃপুনঃ নাচি বোলে ‘সুখ নাহি পাই।
কে বা জানি লুকাইয়া আছে কোন্ ঠাঁই?’ ৮”[৩৬৬]

এরপর সকল বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দেরা শ্রীবাসের বাড়ির ভেতরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অবাঞ্ছিত কোনও ব্যক্তিকে দেখতে পান না। ফলে চৈতন্যদেব পুনরায় আনন্দ চিত্তে নৃত্য করতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুনর্বার তাঁর নৃত্যের তাল ভেঙে গেলে শ্রীবাস পণ্ডিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর শাশুড়িকে বার করে দেন। তখন চৈতন্যদেব প্রফুল্ল চিত্তে সকল ভক্তগণ সহ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে প্রেমোন্মত্ত হয়ে হরিনাম সঙ্কীর্তনে নৃত্য করতে থাকেন। প্রশ্ন উঠতে পারে শ্রীবাস পণ্ডিতের শাশুড়ি চৈতন্যদেবের হরিনামে নৃত্য দেখবার সুযোগ পেলেন না কেন? কবি প্রসঙ্গত কাহিনির সূচনাতেই বলেছেন —

''লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই।। ৫''[৩৬৭]

মধ্যখণ্ডের এই অধ্যায়েই কবি আবার অদ্বৈতাচার্যের চৈতন্যদেবের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বয়োজ্যেষ্ঠ অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যদেবের অচিন্ত্য গৌরাঙ্গতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যকভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই চৈতন্যদেব যখন কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ঐশ্বর্য প্রকাশে লিপ্ত হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হতেন তখন অদ্বৈত আচার্য তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি সহ প্রণাম করতেন। কিন্তু চৈতন্যদেব স্বয়ং ঈশ্বর ও অন্তর্যামী হওয়ায় অদ্বৈতের এই অভিসন্ধি ধরতে পারেন। তাই একদিন কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ও হরিনামে নৃত্য করতে করতে চৈতন্যদেব উৎফুল্ল প্রকাশ করতে পারছেন না বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের কাছে জানান। অর্থাৎ, চৈতন্যদেব বলেন কেউ তাঁকে ছলনা করেছে। তাই তিনি হরিনামে নৃত্য করেও প্রফুল্ল হতে পারছেন না। উপস্থিত বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের মধ্যে অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের অসাক্ষাতে তাঁর চরণধূলি গ্রহণ করবার অপরাধ স্বীকার করেন। এতে চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্যকে বলেন —

''তুমি সে করিলা চুরি, আমি কি না পারি।
হের দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি।। ৭২''[৩৬৮]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব তখন অদ্বৈতাচার্যকে জড়িয়ে ধরে তাঁর চরণ ধূলি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে কবি চৈতন্যদেব কর্তৃক অদ্বৈতাচার্যের যে মহিমা কীর্তন করেছেন তাতে কবির বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয়। অদ্বৈতের প্রতি চৈতন্যদেবের কৃপা দেখে সকল বৈষ্ণবেরাই তখন অপূর্ব বিস্ময় প্রকাশ করেন।

এই অধ্যায়েই কবি আবার শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নবদ্বীপেই বসবাস করতেন। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন —

''পরম স্বধর্মপর, পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহো, পরম মহান্ত।। ১১০''[৩৬৯]

কবি এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাহ্যিক আচরণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, সকলে তাঁকে ভিক্ষুক বলে জানলেও তিনি ছিলেন পরম ভাগবত। সারাদিন 'কৃষ্ণ' নাম মুখে নিয়ে ভিক্ষা করে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী যা কিছু পেতেন, তাই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে তিনি প্রসাদ পেতেন। কবি বলেছেন, বাহ্যিক দিক

থেকে তাঁকে দারিদ্র্য বলে মনে হলেও কৃষ্ণনাম করবার কারণে তাঁর ব্যক্তিগত কোনও দুঃখই ছিল না। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে যে হরিনাম সঙ্কীর্তন হত এবং চৈতন্যদেবের প্রেমাবেশ ঘটত তাতে সকল বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের সঙ্গে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীও অংশগ্রহণ করতেন। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমাবেশ দেখে এবং হরিনাম সঙ্কীর্তন শ্রবণ করে শুক্লাম্বরও প্রেমাবেশে কখনও নৃত্য করতেন, আবার কখনো কান্না করতেন। চৈতন্যদেব এই নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকেন এবং তাঁর ভিক্ষার ঝুলি থেকে সংগৃহীত চাল ভক্ষণ করেন। চৈতন্যদেব এক্ষেত্রে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে যা বলেছেন তা তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য নিরূপণের সহায়ক বলেই মনে করি —

> ''প্রভু বোলে, 'তোর খুদ-কণ মুঞি খাঙ।
> অভক্তের অমৃতে উলটি নাহি চা'ঙ।।' ১২৬''[৩৭০]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব শুক্লাম্বরকে বলেছেন — ভক্তি ও প্রেমের মিশ্রণে অতি অল্প বস্তুও আমাকে যে দান করে, আমি তাঁর দান গ্রহণ করি। কিন্তু ভক্তিহীন ভাবে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য দিলেও আমি গ্রহণ করি না। সুতরাং, চৈতন্যদেবের শুক্লাম্বরের প্রতি এরূপ কারুণ্য প্রকাশ করতে দেখে সকল বৈষ্ণব ভক্তই পরমানন্দে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন। আর চৈতন্যদেব শুক্লাম্বরের 'তণ্ডুল' ভোজন করে তাঁকে প্রেমভক্তি প্রদান করেন। আসলে কবি এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর এই কাহিনির দ্বারা দীন-দরিদ্রের প্রতি চৈতন্যদেবের সমবেদনা প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেব যে আসলে অন্যের দুঃখের সহমর্মী ছিলেন — তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটাই কবি এই অধ্যায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'মধ্যখণ্ড'-এর সপ্তদশ অধ্যায়ে কবি চৈতন্যদেবের নগর-ভ্রমণের বৃত্তান্ত দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত করেছেন। চৈতন্যদেব যখন হরিনাম সমকীর্তন করে নদীয়া তথা নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করতেন তখন তাঁর মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রকাশিত হত বলে কবি জানিয়েছেন। তাছাড়া চৈতন্যদেব যেহেতু ছিলেন বিদ্বান ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপক, তাই হরিনাম সঙ্কীর্তন করে নগর পরিভ্রমণ করবার সময় তাঁর দাম্ভিকতা প্রকাশিত হত। বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিরা চৈতন্যদেবের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে রাজভয় প্রদর্শন করে বলতেন —

> ''পাষণ্ডি সকল বোলে 'নিমাঞিপণ্ডিত।
> তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত।। ৭
> লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন।
> দেখিতে না পায় লোক, শাঁপে' অনুক্ষণ।।' ৮''[৩৭১]

সুতরাং, কবির বর্ণিত চৈতন্যদেবের প্রতি বাহ্যসুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের উক্তি থেকে বুঝতে পারি, সমসাময়িক সময়ে সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে চৈতন্যদেবকে অনেক সমালোচিত হতে হয়েছিল। তাছাড়া তখন বাংলার সিংহাসনে যেহেতু ছিলেন যবনরাজ, তাই চৈতন্যদেবের হিন্দুধর্ম প্রচারে ভীতির

আশঙ্কা ছিল অনেক বেশি। কিন্তু চৈতন্যদেব কোন অবস্থাতেই ভীত ছিলেন না। নির্ভীকতা তাঁর চরিত্রের অপর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে কবি জানিয়েছেন। তাই বাহ্যসুখে মগ্ন বিরূপ ব্যক্তিরা রাজভয় দেখালে চৈতন্যদেব আনন্দিত হয়েছেন। তিনি নিজের থেকে স্বেচ্ছায় রাজার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। এভাবে চৈতন্যদেব বিরূপ ব্যক্তিদের দেখানো রাজভয়কে উপেক্ষা করে নিজ গৃহে ফিরে আসেন এবং হরিনাম সঙ্কীর্তন সহযোগে নৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রেমসুখ অনুভব করেন। অদ্বৈত আচার্য আবার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি না পাবার জন্য চৈতন্যদেবের কাছে অনুযোগ করেন। এছাড়া অদ্বৈতের আরো অভিযোগ—কেন চৈতন্যদেব তাঁকে কিংবা শ্রীবাসকে বাদ দিয়ে নিত্যানন্দকে প্রেমের ভাণ্ডারি করেছেন? যদিও কবি বলেছেন অদ্বৈতের চৈতন্যদেবের প্রতি এটি ব্যাজস্তুতিপ্রয়োগ মাত্র। আসলে অদ্বৈতের অভিপ্রেত অর্থ এ নয়। কিন্তু অদ্বৈতের চৈতন্যদেবের প্রতি এই উক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আমরা কোথাও যেন নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর বিভেদের ইঙ্গিত খুঁজে পাই। চৈতন্যদেব কিন্তু অদ্বৈতের ব্যঙ্গময় বাক্য শুনে মুখে কিছু না বললেও অন্তরে ব্যথিত হন এবং গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন করতে ঝাঁপ দেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস উভয় মিলে তখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে চৈতন্যদেবকে গঙ্গাপাড়ে তুলে আনেন। এরপর নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবকে অদ্বৈতের অভিমানের কারণ সম্পর্কে বোঝান। আসলে ভক্তি থেকে উত্থিত দৈন্যের কারণেই নিজেকে প্রেমহীন মনে করে অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের প্রতি অনুযোগ করেছিলেন।

নিত্যানন্দের কথায় চৈতন্যদেব প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করলেন ঠিকই, কিন্তু অদ্বৈতকে শাস্তি দেবার জন্য অন্য এক উপায় গ্রহণ করেন। নন্দন-আচার্যের গৃহে তিনি লুকিয়ে থাকবেন স্থির করেন। আর নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আদেশ করেন যে তাঁর লুকিয়ে থাকবার কথা কেউ যেন জানতে না পারে। চৈতন্যদেবকে না দেখতে পেয়ে সকল বৈষ্ণবভক্তবৃন্দ তখন দুঃখে কাতর হলেন। নিজ অপরাধবোধে অদ্বৈতাচার্যও তীব্র দুঃখে দ্রবীভূত হয়ে উপবাস করে থাকেন। এদিকে চৈতন্যদেব নন্দন আচার্যের গৃহে সারারাত পরম আতিথ্যে এবং কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্যকরূপে গোপন রাখেন। পরদিন সকালবেলায় চৈতন্যদেব নন্দন আচার্যকে পাঠান শ্রীবাসকে ডেকে আনতে। শ্রীবাস এসে চৈতন্যদেবকে দেখতে পেয়ে প্রেমানন্দে কাঁদতে থাকেন। চৈতন্যদেব তখন অদ্বৈতের খবর জিজ্ঞাসা করলে শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁর চৈতন্যবিরহ জনিত অসহ্য দুঃখের কথা বর্ণনা করেন। এতে চৈতন্যদেব কৃপাভাজন হয়ে অদ্বৈতের কাছে এসে দেখেন তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। চৈতন্যদেবের ডাকে এরপর অদ্বৈত চেতনা ফিরে পেয়ে নিজের দীনতা প্রকাশ করেন। অদ্বৈত নিজের রাগ এবং অহঙ্কার স্বভাবের জন্য নিজেই লজ্জিত হন এবং চৈতন্যদেবের প্রতি বিনয় প্রকাশ করে বলেন—

> ''হেন কর' প্রভু! মোরে দাস্যভাব দিয়া।
> চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া।। ৮৬''[৩৭২]

অদ্বৈত আচার্যের এরূপ দীনতা ও বিনয় প্রকাশ করতে দেখে চৈতন্যদেব তাঁর প্রতি কৃপাভাজন হন।

চৈতন্যদেবের কৃপা ধন্য লাভ করে অদ্বৈত আচার্য এবং উপস্থিত সকল বৈষ্ণব ভক্তেরাই পরমানন্দ লাভ করেন এবং জয়ধ্বনি দিয়ে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন। আমাদের মনে হয় আসলে কবি যেন এই কাহিনিগুলি বর্ণনার মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের বৃহৎ উন্মুক্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। অপরাধীর প্রতি ক্ষমা যে একটি মহৎ গুণ এবং চৈতন্যদেব যে সেই গুণের অধিকারী ছিলেন — কবি যেন তাঁর চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন এই অংশে। আবার, বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কাব্যটি রচনা করবার সময় প্রেক্ষিতে বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে যে বিভাজনের সূত্রপাত ঘটেছিল, কবি যেন তার প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই কবি বলতে বাধ্য হয়েছেন —

" 'সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র' ইথে দ্বিধা যার।
কভু 'শুদ্ধ-ভক্ত' নহে সেই দুরাচার।। ১১০
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহো বোলে 'আমি রঘুনাথ ভাব' গিয়া।। ১১১"[৩৭৩]

অর্থাৎ, চৈতন্য সমসাময়িক কালে অনেকেই যে নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর বলে প্রকাশ করে খ্যাতি লাভ করতে চাইতেন, তাই যেন কবি বলতে চেয়েছেন এই অধ্যায়ে। তবে, কবি যে নিত্যানন্দের আজ্ঞায় কাব্যটি রচনা করতে আত্মনিয়োগ করেছেন, নিজ গুরুদেবের প্রতি সেই ঋণ স্বীকার করতেও কবি ভোলেন নি। তাই এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে কবি বলেছেন —

"জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।। ১১৪
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি — সব তাঁহার শকতি।। ১১৫"[৩৭৪]

'মধ্যখণ্ড'-এর অষ্টাদশ অধ্যায়ের সূচনাতে কবি চৈতন্যদেবের এক নব নৃত্যের ইচ্ছার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। কবি নিজে এই নব আঙ্গিকের নৃত্যকে 'লক্ষ্মী-কাচে' নৃত্য নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ লক্ষ্মীর বেশ ধারণ করে হয়ত চৈতন্যদেব এই আঙ্গিকের নৃত্য করতেন বলে এরূপ নামকরণ হয়েছে মনে করতে পারি। অবশ্য চৈতন্যদেব নিজে তাঁর বৈষ্ণব ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলেছেন —

"একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
'আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে।' ৬
সদাশিব-বুদ্ধিমন্তখানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু 'কাচ সজ্জ কর' গিয়া।। ৭"[৩৭৫]

বৈষ্ণব ভক্তদের প্রতি চৈতন্যদেবের এই উক্তি প্রয়োগ থেকে বুঝতে পারি — আসলে এই 'লক্ষ্মী-কাচে' নৃত্য হল নাটক বা দৃশ্যকাব্য। তাই চৈতন্যদেব নাট্যশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ 'অঙ্ক' কথাটি ব্যবহার

করেছেন। আবার, সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত খানকে ডেকে চৈতন্যদেব 'কাচ-সজ্জ' করতে বলেছেন। অর্থাৎ, নাটকে যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদের পোষাক সজ্জিত করতে চৈতন্যদেব বুদ্ধিমন্তখানকে আদেশ করেছেন। এই বুদ্ধিমন্ত খান ছিলেন প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী। পূর্বে আমরা জেনেছি, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের বিয়েতে ইনি প্রচুর নিজ অর্থ ব্যয় করেছিলেন। কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করবে চৈতন্যদেব নিজেই তা ঠিক করে দিয়ে বলেছেন —

''গদাধর কাচিবেন রুক্মিনীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ি-সখী সুপ্রভাত।। ৯
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস — জাগাইতে ভার।। ১০''[৩৭৬]

অর্থাৎ গদাধর রুক্মিনীর যেমন অভিনয় করবেন বলে চৈতন্যদেব জানিয়েছেন তেমনি ব্রহ্মানন্দ অভিনয় করবেন রুক্মিনীর সখীর। আবার নিত্যানন্দ বড়াইয়ের যেমন অভিনয় করবেন তেমনি হরিদাস অভিনয় করবেন কোটালের। এছাড়া শ্রীবাস পণ্ডিত যেমন নারদের অভিনয় করবেন বলে চৈতন্যদেব জানিয়েছেন তেমনি শ্রীবাসের ভাই শ্রীরামও নারদের শিষ্যের অভিনয় করবেন। এই সভাস্থলেই উপস্থিত শ্রীবাসের আরেক ভাই শ্রীমানও নিজে অভিনয় করতে চান। উপস্থিত অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যদেবকে নাটকের প্রধান নায়ক কে হবে জিজ্ঞাসা করলে প্রত্যুত্তরে চৈতন্যদেব সিংহাসনে অবস্থিত গোপীনাথ বিগ্রহের কথাই উল্লেখ করেন। এরপর চৈতন্যদেবের আদেশে চন্দ্রাতপ বা 'চান্দোয়া' দিয়ে বুদ্ধিমন্ত খান সকলের জন্য সুন্দর সুন্দর পোষাক তৈরী করেন। লক্ষণীয়, চৈতন্যদেব নাটকের দৃশ্যে অভিনয় করবার পূর্বে বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে বলেন —

''প্রকৃতি-স্বরূপে নৃত্য হইব আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় — তার অধিকার।। ১৮
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে।। ১৯''[৩৭৭]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে নাটক সূচনার পূর্বেই বলেন, তিনি যেহেতু প্রকৃতি স্বরূপা লক্ষ্মীর বেশে অভিনয় করবেন তাই যিনি ইন্দ্রিয়কে দমন করতে পারেন; একমাত্র তারই নাটকের অভিনয় দেখবার অধিকার রয়েছে। চৈতন্যদেবের এই অভিমত শ্রবণ করে অদ্বৈতাচার্য এবং শ্রীবাস নাটকের অভিনয় দেখবেন না বলে জানিয়ে দেন। কারণ তাঁরা উভয়েই জিতেন্দ্রিয় নন। কিন্তু চৈতন্যদেব সকলের ইন্দ্রিয়ই আজ সম্যক্‌রূপে বশীভূত হবে— একথা স্বীকার করেন এবং লক্ষ্মীরূপে নাটক অভিনয় করবার জন্য চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ি যান। সুতরাং, বুঝতে পারি চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতেই এই নাটকগুলি অভিনীত হত। চৈতন্যদেবের নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য সকল বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের সঙ্গে

শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও উপস্থিত হন চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে। এরপর অভিনয় শুরু হয়। প্রথমে অভিনয় করতে আসেন হরিদাস। কোটাল বেশে তাঁর নবরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

> "প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
> মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস।। ৩৯
> মহা-পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান।
> দণ্ডহস্তে সভারে করয়ে সাবধান।। ৪০"[৩৭৮]

এরপর অভিনয় মঞ্চে প্রবেশ করেন নারদ বেশে শ্রীবাস পণ্ডিত। আর তাঁর পশ্চাৎ অনুসরণ করে মঞ্চে প্রবেশ করেন নারদ মুনির শিষ্যরূপে শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীবাস পণ্ডিত এমনভাবে নারদ সেজে মঞ্চে প্রবেশ করেন যে তাঁকে দেখে স্বয়ং নারদ বলেই ভ্রম হয়। এরপর চৈতন্যদেব রুক্মিনী বেশ ধারণ করেন এবং নিজে রুক্মিনীর ভাবের আবেশে লিপ্ত হন। অর্থাৎ রুক্মিনী যেভাবে কৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য পত্র লিখেছিলেন চৈতন্যদেবও অনুরূপ রুক্মিনী আবেশে কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে পত্র লেখেন এবং কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন।

নাটকের দ্বিতীয় প্রহরে অভিনয় মঞ্চে প্রবেশ করেন গদাধর। তিনি 'রমা-বেশে' বা লক্ষ্মী রূপে এমন অভিনয় করেন যে উপস্থিত সকল বৈষ্ণবেরাই কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন করতে থাকেন। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করতে হয় অভিনয় শুরুর পূর্বে কবি আমাদের জানিয়েছিলেন, চৈতন্যদেব অভিনয় করবেন লক্ষ্মীর আর গদাধর অভিনয় করবেন রুক্মিনীর। কিন্তু কবি পূর্বের কথা স্মরণে না রেখে চৈতন্যদেব যে রুক্মিনীর এবং গদাধর যে লক্ষ্মীর অভিনয় করেছিলেন সার্থকভাবে তার অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন। কবির এই ভ্রান্তি নিছক বাহ্যিক ত্রুটি বলেই মনে হয়। আসলে কবি চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচর ভক্তেরা যে নাটকের অভিনয় করতেন, এই ঐতিহাসিক তথ্যটিই এখানে প্রতিপাদন করেছেন। তবে লক্ষণীয়, এই নাটকের অভিনয়ে সকলেই ছিলেন পুরুষ অভিনেতা। কোনও নারী অভিনেত্রী যে নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করত না — কবির বর্ণনা থেকে তার প্রমাণ মেলে।

এরপর কবি জানিয়েছেন — চৈতন্যদেব পুনর্বার মঞ্চে অভিনয়ের জন্য প্রবেশ করেন আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা রূপে। চৈতন্যদেবকে এই নবরূপে অভিনয় করতে দেখে কেউই তাঁকে চিনতে পারেন নি। এমনকি, শচীদেবীও চৈতন্যদেবকে চিনতে পারেন নি বলে কবি জানিয়েছেন। চৈতন্যদেব আদ্যাশক্তি রূপে অভিনয় করতে গিয়ে সেই ভাবাবেশ লিপ্ত হয়ে নৃত্য করতে থাকেন। বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দেরা তখন চৈতন্যদেবের জননী ভাবের আবেশ বুঝতে পেরে কেউ লক্ষ্মীর স্তব-স্তুতি, আবার কেউ চণ্ডীর স্তব-স্তুতি পাঠ করতে থাকেন। এভাবে সারারাত্রি ধরে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে চৈতন্যদেব তাঁর অনুচর বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নাটকের অভিনয় করেন। প্রভাতকালে নাটক শেষ হয়ে যাওয়ায় উপস্থিত

সকলেই আক্ষেপ করতে থাকলে চৈতন্যদেব আদ্যাশক্তির ভাবে আবিষ্ট হয়ে স্তনদান করেন। চৈতন্যদেবের আদ্যাশক্তির ভাবে আবিষ্ট হয়ে সকল ভক্তকে স্তনদান অলৌকিক মনে হতে পারে। কিন্তু কবি তাঁর এরূপ মন্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দান করে বলেছেন —

> ‘‘সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
> ‘আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা।।’ ২০৪’’[৩৭৯]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব যেহেতু স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ তাই তাঁর এরূপ জননীর ভাবে আবিষ্ট হয়ে সকল ভক্তবৃন্দকে স্তন পান করানোর মধ্যে কোন অলৌকিকতা নেই বলেই কবি জানিয়েছেন। এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে কবি আবার জানিয়েছেন, যে রাত্রিতে চৈতন্যদেব ‘লক্ষ্মী-কাচে’ নৃত্য করেছিলেন চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে সেই অভিনয় স্থলে সাতদিন সর্বদা অবিচ্ছিন্ন ভাবে পরম অদ্ভুত তেজ দেখা গিয়েছিল। তবে এই অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের নাটক অভিনয় থেকে আমরা বুঝতে পারি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নাটক অভিনয়ের প্রচলন ছিল তৎকালীন সমাজে।

‘মধ্যখণ্ড’-এর ঊনবিংশ অধ্যায়েও কবি চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ও হরিনাম সঙ্কীর্তনে নদীয়া বিহারের বর্ণনা দিয়েই কাহিনির সূত্রপাত করেছেন। তবে কবি এই অধ্যায়ে পুনরায় অদ্বৈত আচার্যের কাহিনি উত্থাপন করেছেন। শান্তিপুর নিবাসী অদ্বৈতাচার্য ছিলেন চৈতন্যদেবের মহাভক্ত। কিন্তু চৈতন্যদেব যখন বাহ্যদশা ফিরে পেতেন কৃষ্ণপ্রেমাবেশ থেকে তখন তিনি অদ্বৈতাচার্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করতেন। এমনকি চৈতন্যদেব বয়োজ্যেষ্ঠ অদ্বৈতকে যেমন প্রণাম করতেন, তেমনি জোর করে তাঁর পদধূলিও গ্রহণ করতেন। এই কারণে অদ্বৈতাচার্য মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করতেন এবং কি উপায় নির্ধারণ করা যায় তা চিন্তা করতেন। অদ্বৈতাচার্য জানতেন ভক্তিব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা চৈতন্যদেবকে পরাজিত করা যাবে না। তাই তিনি স্থির করেন —

> ‘‘হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
> স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে।। ১৫’’[৩৮০]

অর্থাৎ, অদ্বৈতাচার্য স্থির করেন, ভক্তিবিরোধী আচরণের দ্বারা চৈতন্যদেবের এমন তীব্র ক্রোধ উৎপাদন করবেন যে নিজের থেকেই তখন চৈতন্যদেব তাঁকে শাস্তি দেবেন। কারণ — ভক্তির প্রচার করবার উদ্দেশ্যেই চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই ভক্তি হল চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু। কিন্তু সত্যি অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের ভৃত্যরূপে শাসন লাভ করবার জন্য নিজ শিষ্যদের কাছে ভক্তির মহিমা বা উৎকর্ষ স্বীকার না করে সর্বশক্তিসম্পন্ন ‘জ্ঞান’-এর কথা বলেন। অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্যের মতে, সকল সাধনের প্রাণস্বরূপ হল — যোগবশিষ্ঠ নামক এই জ্ঞানমার্গ। এই জ্ঞানমার্গ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান করে বলে তা ভক্তিবিরোধী। তবে, এই জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করে অদ্বৈতাচার্য নিজ শিষ্যদের বলেন—

" 'বিষ্ণুভক্তি' দর্পণ, লোচন হয় 'জ্ঞান'।

চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম? ২৩

আদি বৃদ্ধ আমি পঢ়িলাঙ সর্ব্বশাস্ত্র।

বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র।। ২৪"[৩৮১]

অর্থাৎ, অদ্বৈতাচার্য বলেন 'বিষ্ণুভক্তি' হল দর্পণতুল্য। আর 'জ্ঞান' হল চোখের তুল্য। তাই যার চোখ নেই তার কাছে দর্পণ যেমন কোন কার্য সাধিত করতে পারে না, তেমনি যার জীব ও ব্রহ্ম সম্পর্কে ঐক্যজ্ঞান নেই তার কাছে বিষ্ণুভক্তির দ্বারা কোন ইষ্টবস্তুই লাভ করা সম্ভব নয়। অদ্বৈতাচার্যের মুখে এই জ্ঞানের উৎকর্ষের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে উপস্থিত হরিদাস অট্টহাস্য করতে থাকেন। যদিও কবি বলেছেন, অদ্বৈতাচার্যের এই ভক্তিবিরোধী জ্ঞানমার্গের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে কপটতা মাত্র, কিন্তু আমাদের জ্ঞানমার্গের উৎকর্ষ প্রসঙ্গে অদ্বৈতের শাস্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা দেখে মনে হয় তিনি চৈতন্যভক্ত হয়েও হয়ত জ্ঞানমার্গেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাই জ্ঞামার্গের শ্রেষ্ঠত্বের প্রসঙ্গে অদ্বৈতাচার্যের এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান।

এরপর কবি জানিয়েছেন, একদিন নগর ভ্রমণের উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে সঙ্গে করে ঘর থেকে বার হন। নিজে যেহেতু চৈতন্যদেব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা, তাই তাঁর নিজ সৃষ্ট নবদ্বীপের সমস্ত বস্তু দেখে তিনি অভিভূত হন। আসলে চৈতন্যদেব যে শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে যাবার উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন নিত্যানন্দের কাছেও তা গোপন করেন প্রথমে। পরে অবশ্য নিত্যানন্দকে চৈতন্যদেব বলেন—

"নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বোলে বিশ্বম্ভর।

'চল যাই শান্তিপুর — আচার্য্যের ঘর।।' ৪০"[৩৮২]

কিন্তু নবদ্বীপ থেকে শান্তিপুর যাবার পথে গঙ্গার কাছে 'ললিতপুর' নামক গ্রামে এক গৃহস্থ সন্ন্যাসীর বাড়িতে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ আশ্রয় গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে বাহ্যসুখ লাভের জন্য আশীর্বাদ প্রদান করলে চৈতন্যদেব তাঁর কাছে কৃষ্ণভক্তি লাভের আশীর্বাদ চান। সুতরাং, বোঝা যায় সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবকে চিনতে পারেন নি। সামান্য 'ব্রাহ্মণকুমার' মনে করেছিলেন। আবার, চৈতন্যদেবের প্রতি সন্ন্যাসীর উক্তি প্রয়োগ থেকে বুঝতে পারি তিনি ছিলেন বাহ্যসুখে নিয়োজিত বামাচারী। এমনকি, তিনি যে তন্ত্রমতাবলম্বী ছিলেন এবং মদ্যপান করতেন তাও কবি জানিয়েছেন। চৈতন্যদেব এই গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে বেদের নিগূঢ় অভিপ্রায়ের কথা বোঝান। বাহ্যিক বিষয় সুখ কখনই যে জীবের পক্ষে কাম্য নয়, কেবল কৃষ্ণভক্তিই যে জীবের কাম্যবস্তু— এই নিগূঢ় তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন চৈতন্যদেব সন্ন্যাসীর কাছে। এরপর চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ উভয়ে এই গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং স্নানাহার সম্পন্ন করেন। স্নানাহারকালে চৈতন্যদেব যখন জনতে পারেন গৃহস্থ সন্ন্যাসী মদ্য পান করেন তৎক্ষণাৎ তিনি নিত্যানন্দ সঙ্গে সেই স্থান ত্যাগ করেন এবং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ভাসতে ভাসতে অদ্বৈত গৃহে গমন করেন। অদ্বৈত গৃহে এসে চৈতন্য দেখতে পান জ্ঞানের উৎকর্ষের অনুভূতি

জনিত আনন্দে অদ্বৈতাচার্য উৎফুল্ল হয়ে রয়েছেন। চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের এহেন উৎফুল্লতা দেখে তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান'-এর মধ্যে কে বড়? অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের প্রত্যুত্তরে বলেন —

''অদ্বৈত বোলয়ে 'সর্ব্ব কাল বড় 'জ্ঞান'।
যার 'জ্ঞান' নাহি তার ভক্তিতে কি কাম।। ১৩২''[৩৮৩]

অদ্বৈতের মুখে এই কথা শ্রবণ করে অত্যধিক ক্রোধবশত চৈতন্যদেব তাঁকে প্রহার করতে উদ্যত হন এবং নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেবের নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে দেখে অদ্বৈতাচার্য পরমানন্দ লাভ করেন এবং নিজেকে চৈতন্যদেবের দাস হিসাবে স্বীকার করেন। কৃষ্ণপ্রেমভক্তির প্রভাবে তখন অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের চরণযুগল আশ্রয় করে কাঁদতে থাকেন। চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের প্রেমভক্তি দেখে তাঁর প্রতি কৃপা বর্ষণ করেন এবং তাঁকে বর দান করেন। চৈতন্যদেবের আশীর্বাদ লাভ করে অদ্বৈতাচার্য সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলেন যে —

''যদি তোরে না মানিঞা মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে।। ১৭২
তোর পাদপদ্মে যার না পশিবে মন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন।। ১৭৩''[৩৮৪]

লক্ষণীয়, চৈতন্যদেবের প্রতি অদ্বৈতাচার্যের এই উক্তি প্রয়োগ থেকে আমরা বুঝতে পারি, অদ্বৈতাচার্যের প্রভাব এবং শিষ্য সংখ্যা কত বিপুল পরিমাণ ছিল। তাই অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের ভক্তিমার্গকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নেওয়ায় এবং চৈতন্যমতবাদের কাছে নতিস্বীকার করায় কবি আসলে অদ্বৈত শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলতে চেয়েছেন, চৈতন্যদেবের প্রভাবকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে। এরপর কবি অদ্বৈতের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, স্বয়ং ভগবানকে উপেক্ষা করে অন্য দেবতার পূজা করলে কি কুফল লাভ হতে পারে। অর্থাৎ, স্বয়ং ভগবানের একমাত্র পূজা করাই যে জীবের কাম্য — একথাই কবি বলতে চেয়েছেন। অদ্বৈতাচার্যের গৃহে এরপর চৈতন্যদেব বাহ্যদশা ফিরে পেয়ে স্নানাহার করেন পরমানন্দে। চৈতন্যদেবের সঙ্গে একাসনে ভোজন করতে বসেন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য। আসলে কবি এক্ষেত্রে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটিয়ে সম্মিলনের জয়গান করেছেন বলেই মনে হয়। কিন্তু একসাথে ভোজনে বসেও নিত্যানন্দ যখন বাল্যভাবাবেশে সমস্ত ঘরে খাবার ছিটিয়ে ফেলেন, তখন অদ্বৈতাচার্য পুনরায় তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দকে ক্রোধাবেশে বলেন —

''জাতিনাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ।। ২৪৫
গুরু নাহি, বোলয় 'সন্ন্যাসী' করি নাম।

জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম।। ২৪৬"[৩৮৫]

শুধু তাই নয়, নিত্যানন্দ কোন্ জাতির এবং কোন বংশের তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অদ্বৈতাচার্য। যদিও কবি বলেছেন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের এই কলহ আসলে প্রেম-কন্দল। আর তাই ক্রোধাবেশে অদ্বৈতাচার্য যখন দিগম্বর হয়ে যান তখন চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ হাসতে থাকেন। শুধু তাই নয়, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ উভয়ে যে কত অন্তরঙ্গ ছিলেন তাও প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন কবি। তাই অদ্বৈত আচার্য যখন ক্রোধাবেশে লিপ্ত হয়েছেন তখন নিত্যানন্দ তাঁকে আরো রাগিয়ে তোলবার জন্য বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখালেও পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করেছেন। কবি জানিয়েছেন—

"নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী।

প্রেমরসে দুই প্রভু মহাকুতূহলী।। ২৫৪"[৩৮৬]

এরপর চৈতন্যদেব অদ্বৈতের গৃহে কিছুদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং হরিনাম সঙ্কীর্তনের মাধুর্য আস্বাদন করে নবদ্বীপে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাস সহ প্রত্যাবর্তন করেন। তখন নবদ্বীপের বৈষ্ণবভক্তগণ চৈতন্যদেবকে ফিরে পেয়ে পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

'মধ্যখণ্ড'-এর বিংশ অধ্যায়ে কবি সূচনাতেই জানিয়েছেন— এভাবে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নানারূপ কৌতুক প্রকাশ করতেন বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের সঙ্গে। একদিন চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে সঙ্গে করে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এসে উপস্থিত হন। সেই সময় পণ্ডিত তথা বৈষ্ণব ভক্ত মুরারি গুপ্তও আসেন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে। মুরারি গুপ্ত আগে চৈতন্যদেবকে নমস্কার করে পরে নিত্যানন্দকে প্রণাম করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের কাছে এই অপরাধ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি মুরারি গুপ্তকে বলেন —

"যে করিলা মুরারি! না হয় ব্যবহার।

ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার।। ৯

কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে।

ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘ' কেনে? ১০"[৩৮৭]

অর্থাৎ, একই স্থানে সমমর্যাদাসম্পন্ন দুইজন লোক উপস্থিত থাকলে যে তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁকে আগে প্রণাম করতে হয় এবং যে বয়োকনিষ্ঠ তাঁকে পরে নমস্কার জানাতে হয়— এটাই লৌকিক জগতের শিষ্টাচার। কিন্তু মুরারি গুপ্ত বয়োজ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দকে প্রণাম না করে চৈতন্যদেবকে আগে প্রণাম করেছেন। তাই চৈতন্যদেব তাঁকে শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ করেন। এরপর মুরারি গুপ্ত বাড়ি ফিরে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দ তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। এক্ষেত্রে কবি নিত্যানন্দের তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেছেন —

"নিত্যানন্দমূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।

শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বম্ভর।। ১৬"[৩৮৮]

অর্থাৎ, মুরারি গুপ্ত নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দেখেন শ্রীহল-ধারণকারী বলরাম রূপে। আর চৈতন্যদেবকে দেখেন নিত্যানন্দের মাথায় পাখা ধরে রয়েছে। অর্থাৎ, নিত্যানন্দ যে চৈতন্যদেবের বয়োজ্যেষ্ঠ এই তত্ত্বই প্রকাশিত করতে চেয়েছেন কবি এখানে। স্বপ্নে নিত্যানন্দ সম্পর্কিত এই তত্ত্ব দর্শন করে মুরারি গুপ্ত আনন্দিত হৃদয়ে চৈতন্যদেবের কাছে এসে উপস্থিত হন এবং এবার পূর্বে নিত্যানন্দকে প্রণাম করে পরে চৈতন্যদেবকে প্রণাম করেন। এভাবে মুরারি গুপ্তের কাছে চৈতন্যদেব নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করে হরিনাম সঙ্কীর্তনের সময়ে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে লিপ্ত হন এবং কাশীবাসী প্রকাশানন্দের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। কারণ প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ভাষ্যের অনুসরণকারী। শঙ্করাচার্যের মতই তিনি পারমার্থিক অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। পারমার্থিক ভগবানের লীলা, কর্ম সমস্তই মিথ্যা বলে মনে হত তাঁর কাছে। কিন্তু চৈতন্যদেব মুরারি গুপ্তের কাছে নিজ স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করে স্বয়ং ভগবানের নিত্যতা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেন। এরপর বাহ্যদশা ফিরে পেয়ে চৈতন্যদেব মুরারি গুপ্তকে 'অকিঞ্চন ভক্ত' বলে স্বীকার করে নিজ দাস করে নেন। এভাবে চৈতন্যদেবের কৃপাভাজন হয়ে মুরারি গুপ্ত বাড়ি ফিরে যান এবং প্রেমাবেশে লিপ্ত হয়ে চৈতন্যদেবকে অন্ন দান করেন। কবি মুরারি গুপ্ত কর্তৃক চৈতন্যদেবকে অন্ন দানের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> ''বিহ্বল মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের রসে।
> 'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে।। ৫৬
> ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
> 'খাও খাও খাও কৃষ্ণ!' এই বোল বোলে।। ৫৭''[৩৮৯]

পরদিন প্রাতঃকালে মুরারি গুপ্ত যখন কৃষ্ণপ্রেমাবেশের আনন্দে মগ্ন তখন চৈতন্যদেব উপস্থিত হয়ে জানান যে, কাল রাত্রে মুরারি গুপ্তের হাতে ভোজন করে তাঁর অজীর্ণ রোগ হয়েছে। যেহেতু মুরারি গুপ্তের অন্ন ভোজন করে তাঁর অজীর্ণ রোগ হয়েছে তাই মুরারির হাতে জলপান করলেই অজীর্ণ রোগ উপশম হতে পারে। এই কথা বলে চৈতন্যদেব মুরারির জলপাত্র থেকে ভক্তিরসের জল পান করেন। চৈতন্যদেবকে জলপান করতে দেখে প্রেমবিহ্বল হয়ে মুরারি গুপ্ত মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এভাবে কবি চৈতন্যদেবের প্রেম ভক্তি প্রকাশের পরিচয় দিয়েছেন এই অধ্যায়ে অণুপুঙ্ক্ষ ভাবে।

শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেব একদিন ঈশ্বর ভাবাবেশে শ্রীবাসের গৃহে নিজ চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করেন এবং মুরারি গুপ্তও গরুড় ভাবে আবিষ্ট হন বলে কবি জানিয়েছেন। মুরারি গুপ্ত গরুড় ভাবে আবিষ্ট হয়ে চৈতন্যদেবকে বলেন —

> ''এই মোর স্কন্ধে প্রভু! আরোহন কর'।
> আজ্ঞা কর' নিব কোন্ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর? ৮৬''[৩৯০]

এভাবে, মুরারি গুপ্ত গরুড় ভাবে আবিষ্ট হয়ে চৈতন্যদেবকে স্কন্ধে ধারণ করে শ্রীবাসের সকল অঙ্গন

পরিভ্রমণ করতে দেখে উপস্থিত সকল ভক্তগণ পরমানন্দে ক্রন্দন করতে থাকেন। চৈতন্যদেব এরপর বাহ্যদশা ফিরে পান এবং মুরারি গুপ্তেরও গরুড় ভাব অন্তর্হিত হলে তিনি সুস্থির হন।

মুরারি গুপ্ত এরপর একদিন চৈতন্যদেবের অবতীর্ণ হওয়ার স্থিতি-কাল সম্বন্ধে চিন্তা করে এই উপলব্ধি করেন যে, চৈতন্যদেব যেহেতু স্বয়ং ভগবান তাই তাঁর অবস্থান বা লীলা কখন প্রকটিত হয় আর কখন অন্তর্হিত হয় তার কোন সঠিক সময় জানবার উপায় নেই। অর্থাৎ চৈতন্যদেব তাঁর প্রকট-লীলা বা অবস্থান কখন অন্তর্হিত করবেন বা সমাপ্তি করবেন তা জানার উপায় নেই বলে মুরারি গুপ্ত তাঁর অন্তর্ধানের পূর্বেই নিজ দেহত্যাগ করবার বাসনা প্রকাশ করেন। দেহত্যাগ করবার জন্য মুরারি গুপ্ত তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট কাটারি সংগ্রহ করে সযত্নে রেখে দেন। কিন্তু চৈতন্যদেব মুরারি গুপ্তের এই অভিসন্ধি বুঝতে পারেন এবং তাঁর কাছ থেকে কাটারি সংগ্রহ করেন। শুধু তাই নয়, মুরারি গুপ্তকে চৈতন্যদেব বলেন —

> ‘‘মোর মাথা খাও গুপ্ত! মোর মাথা খাও।
> যদি অরবার দেহ ছাড়িবারে চাও।। ১২৮’’[৩৯১]

চৈতন্যদেবের পরামর্শে মুরারি গুপ্ত তখন আত্মহত্যা থেকে বিরত হন এবং প্রেম ভক্তির কারণে চৈতন্য চরণ ধরে কাঁদতে থাকেন। এরপর কবি এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে চৈতন্য নিন্দকদের প্রতি সাবধান বাণী নিক্ষেপ করেছেন এবং জানিয়েছেন মুরারি গুপ্তকে সান্ত্বনা দিয়ে চৈতন্যদেব প্রফুল্ল হৃদয়ে আপন ঘরে ফিরে যান।

‘মধ্যখণ্ড’-এর একবিংশ অধ্যায়ে কবি একটি নব কাহিনির সূচনা করেছেন। পূর্বের মত এই অধ্যায়েও কবি চৈতন্যদেবের কৃত কর্মের মধ্য দিয়ে ভক্তিকেই জীবের মুক্তিলাভের উপায় বলে প্রমাণ করেছেন। ভক্তিহীন হয়ে ভগবত পাঠেও যে কোন লাভ নেই এই কথাই দেবানন্দ পণ্ডিতের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন চৈতন্যদেব। কবি বলেছেন প্রেমভক্তি রসে নিমগ্ন হয়ে চৈতন্যদেব নিজ অনুচর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে একদিন নগরভ্রমণ কালে দেবানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। দেবানন্দ পণ্ডিত ছিলেন জ্ঞানবান, তপস্বী, আজন্ম-উদাসীন এবং পরম সুশান্ত। তাঁর চরিত্রের এই সমস্ত মহৎগুণ থাকলেও ভাগবতের গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে তিনি অসমর্থ ছিলেন। অর্থাৎ, ‘ভক্তিহীন’ হয়ে তিনি ভাগবতের পাঠ করতেন। লোকে দেবানন্দ পণ্ডিতকে ‘ভাগবতে মহা-অধ্যাপক’ বলে সম্মানিত করলেও চৈতন্যদেব তাঁর ভাগবত ব্যাখ্যায় ভক্তিযোগের মহিমা শুনতে না পেয়ে ক্রোধ প্রকাশ করে বলেন —

> ‘‘কোপে বোলে প্রভু ‘বেটা কি অর্থ বাখানে’।
> ভাগবৎ-অর্থ কোন জন্মেও না জানে।। ১৩
> এ বেটার ভাগবত কোন্ অধিকার।
> গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।। ১৪’’[৩৯২]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেবের মতানুসারে, ‘শ্রীমদ্‌ভাগবত’ গ্রন্থ এবং স্বয়ং কৃষ্ণের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। কারণ কৃষ্ণের মহিমা কথাই বর্ণিত হয়েছে ভাগবত গ্রন্থে। আবার ভাগবত কথার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই যেহেতু প্রেমভক্তির প্রকাশ তাই ভক্তিহীন হয়ে ভাগবত পাঠে কোন তত্ত্বই প্রকাশিত হয় না বলে চৈতন্যদেব অভিমত প্রকাশ করেন। এমনকি বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের গর্বে যুক্তি-তর্কের দ্বারাও ‘শ্রীমদ্‌ভাগবত’ গ্রন্থের অচিন্ত্য তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই চৈতন্যদেব বলেছেন —

> ‘‘ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে’।
> প্রভু বোলে ‘সে অধম কিছুই না জানে।।’ ২০’’[৩৯৩]

এভাবে চৈতন্যদেব দেবানন্দ পণ্ডিতের কাহিনির মধ্য দিয়ে ‘ভাগবত তত্ত্ব’ প্রকাশ করে এবং ‘শ্রীমদ্‌ভাগবত’ গ্রন্থকে সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন করেন।

এরূপে নগরভ্রমণ করতে করতে চৈতন্যদেব একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে নবদ্বীপ নগরের উপান্তে এক মদ্যপের ঘরের কাছে এসে উপস্থিত হন। মদ্যপের বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে চৈতন্যদেব বলরামভাবে আবিষ্ট হন এবং মদ্য গন্ধে বিমোহিত হয়ে ‘বারুণী’ ভেবে তা পান করার জন্য মদ্যপের ঘরে যেতে চান। শ্রীবাস পণ্ডিত তখন চৈতন্যদেবকে মদ্যপের ঘরে প্রবেশ করতে বিরত করেন। কারণ সাধারণ ব্যক্তিরা চৈতন্যদেবের এই বলরামভাবের কথা এবং বারুণীর জন্য তাঁর লোভের কথা বুঝতে না পেরে হয়ত অপপ্রচার করবেন। শ্রীবাসের অনুরোধে চৈতন্যদেব নিজ অভিলাষ পরিত্যাগ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তবে, মদ্যপ ব্যক্তিরা চৈতন্যদেবকে দেখতে পেয়ে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন। কবি প্রসঙ্গতই জানিয়েছেন—

> ‘‘মহা-হরি-ধ্বনি করে মদ্যপের গণে।
> এইমত হয় বিষ্ণু বৈষ্ণব দর্শনে।। ৪৬’’[৩৯৪]

এরপর কবি পুনরায় দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। দেবানন্দ পণ্ডিতকে দেখতে পেয়ে চৈতন্যদেব তাঁর পূর্ব অপরাধের জন্য মহাক্রোধে লিপ্ত হন। এরপর কবি দেবানন্দ পণ্ডিতের পূর্ব অপরাধ কি তা অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা করে বলেছেন — যখন চৈতন্যদেবের প্রকাশ ঘটেনি তখন শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত অধ্যয়ন করতে তাঁর পাঠশালায় গিয়ে উপস্থিত হন। কারণ দেবানন্দ পণ্ডিত ছিলেন ‘ভাগবত অধ্যাপক’। তাঁর কাছে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করে শ্রীবাস পণ্ডিত যখন কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে কাঁদতে থাকেন তখন দেবানন্দের ছাত্রেরা তাঁকে ভাগবত অধ্যয়নে বাধা ঘটায় পাঠশালা থেকে বের করে দেন। অধ্যাপক দেবানন্দ পণ্ডিত শিষ্যদের এরূপ ভক্তিশূন্য কর্ম দেখেও তাদের প্রতি কিছুই বলেন নি। আসলে অধ্যাপক দেবানন্দ পণ্ডিত ছিলেন ভক্তিহীন। তিনি ভাগবতের চর্চা করলেও ভক্তিহীন ভাবেই তার ব্যাখ্যা করতেন বলেই কবি জানিয়েছেন। যেহেতু ভক্তিশূন্য হয়ে দেবানন্দ ভাগবতের ব্যাখ্যা করতেন তাই ভাগবতের প্রেমরস আস্বাদন করতে পারেন নি বলে চৈতন্যদেবও

তাঁকে অনুযোগ করেন। চৈতন্যদেবের কাছ থেকে তিরস্কৃত হয়ে অধ্যাপক দেবানন্দ নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে বাড়ি ফিরে যান। অধ্যাপক দেবানন্দ ভক্তিশূন্য হলেও 'পুণ্যবন্ত' বলে কবি জানিয়েছেন। কারণ —

"চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।

সেই দণ্ড তার তরে ভক্তিযোগ হয়।। ৭৮"[৩৯৫]

'মধ্যখণ্ড'-এর দ্বাবিংশ অধ্যায়ে কবি জানিয়েছেন অধ্যাপক দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ড করে চৈতন্যদেব ঘরে ফিরে আসেন এবং দেবানন্দ পণ্ডিতও নিজ ঘরে ফিরে গিয়ে প্রেমভক্তিহীন হওয়ায় দুঃখ অনুভব করেন। কবি এরপর বলেছেন —

"বৈষ্ণবের ঠাঞি যার হয় অপরাধ।

কৃষ্ণপ্রেম হইলেও তার প্রেম-বাধ।। ৭"[৩৯৬]

অর্থাৎ, বৈষ্ণবের প্রতি অবমাননা বা অপরাধ করলে যদি ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হয়ও তবু সেই কৃষ্ণপ্রেম সার্থকতা পায় না বলে অভিমত প্রকাশ করেন কবি। বিষয়টিকে পরিস্ফুট করবার জন্য কবি শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। একদিন চৈতন্যদেব ঈশ্বর ভাবে আবিষ্ট হয়ে বিষ্ণুর সিংহাসনে উপবেশন করে নিজ স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করে বলেন —

"মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।

মুঞি রামরূপে কৈলুঁ সাগরবন্ধন।। ১৪

শুতিয়া আছিলু ক্ষীরসাগর ভিতরে।

মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাঢ়ার হুঙ্কারে।। ১৫"[৩৯৭]

এভাবে নিজ স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করে চৈতন্যদেব জানান যে, আসলে প্রেমভক্তি বিতরণের উদ্দেশ্যেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। আর তাই উপস্থিত সকল বৈষ্ণবভক্তকেই চৈতন্যদেব প্রেমভক্তি প্রদান করেন। শ্রীবাস পণ্ডিত তখন শচীমাতাকেও প্রেমভক্তি প্রদান করতে বললে চৈতন্যদেব তাঁকে প্রেমভক্তি দেবেন না বলে জানান। কারণ হিসাবে তিনি বলেন —

"বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।

অতএব তান হৈল প্রেমভক্তি বাধ।। ২৫"[৩৯৮]

অর্থাৎ, যেহেতু শচীমাতা পূর্বে বৈষ্ণবভক্তের কাছে অপরাধ করেছেন তাই সেই অপরাধ খণ্ডনের অধিকার চৈতন্যদেবেরও নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে চৈতন্যদেব তো স্বয়ং ভগবান। তাহলে বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের সামর্থ্য তাঁর নেই কেন? আসলে মনে হয় চৈতন্যদেব জীবসমূহকে বৈষ্ণবের মর্যাদা রক্ষার গুরুত্ব শিক্ষাদানের জন্যই এরূপ উক্তি প্রয়োগ করেছেন। চৈতন্যদেব তাই শ্রীবাসকে বলেন — শচীমাতা অদ্বৈতাচার্যের কাছে যেহেতু অপরাধ করেছেন তাই তাঁর চরণধূলি গ্রহণ করলেই একমাত্র প্রেমভক্তি

লাভ হতে পারে। অদ্বৈতাচার্য এ কথা শ্রবণ করে বলেন —

"শুনিঞা অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন।। ৩৭
যাঁর গর্ভে মোহোর প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাঁহার।। ৩৮"[৩৯৯]

অর্থাৎ, অদ্বৈতাচার্য বলেন — শচীমাতা নিজেই বিষ্ণুভক্তি স্বরূপা। তিনি প্রেমভক্তির মূর্ত বিগ্রহ। তাই তাঁর নতুন করে প্রেম প্রাপ্তির প্রয়োজন থাকতে পারে না এবং কোনওরূপ অপরাধের সম্ভাবনা তাঁর নেই। শচীমাতা আসলে ব্রজের যশোদা। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ শুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেম বিরাজিত। এভাবে শচীমাতার তত্ত্ব প্রকাশ করে অদ্বৈতাচার্য প্রেমাবিষ্ট হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হন। তখন শচীমাতা অদ্বৈতাচার্যের চরণধূলি গ্রহণ করেন। কারণ অদ্বৈতের বাহ্যজ্ঞান থাকলে তাঁর চরণধূলি শচীমাতার গ্রহণ করা সম্ভব হত না। অবশ্য শচীমাতাও প্রেমভক্তির কারণে ও অদ্বৈতানুরাগে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হন। এভাবে চৈতন্যদেব শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের এবং প্রেমভক্তি উদয়ের কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

এরপর কবি অদ্বৈতাচার্যের প্রতি শচীমাতার অপরাধের মূল কারণ অন্বেষণ প্রসঙ্গে বিশ্বরূপের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বরূপের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন —

"প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ মহাশয়।
ভুবন দুর্ল্লভ রূপ মহাতেজোময়।। ৬০"[৪০০]

শুধু তাই নয়, সর্বশাস্ত্রে বিশারদ মহাপণ্ডিত ছিলেন এই বিশ্বরূপ। তবু সমবয়সী বালকদের কাছে কোন অহংকার প্রকাশ না করে শিশুর ন্যায়ই আচরণ করতেন। একদিন নিজ পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সঙ্গে তিনি ভট্টাচার্য সভায় গিয়ে উপনীত হন। উপস্থিত ভট্টাচার্যগণ তাঁর বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বরূপ যে উত্তর দেন তাতে শিশু সুলভ চাঞ্চল্য এবং অহংকার প্রকাশিত হয়েছে বলেই মনে করেন সকলে। পিতা জগন্নাথ মিশ্র তখন অপমানিত হয়ে পুত্র বিশ্বরূপের গালে এক চড় মারেন এবং বলেন—

"যে পুথি পড়িস বেটা! তাহা না বলিয়া।
কি বোল বলিলি তুই সভা মাঝে গিয়া।। ৬৯
তোমারে ত সভার হইল মূর্খ জ্ঞান।
আমারেও দিলে লাজ কহি অপ্রমাণ।। ৭০"[৪০১]

পিতার কাছ থেকে এরূপ অপমানিত হয়ে বিশ্বরূপ পুনরায় সেই ভট্টাচার্য সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন এবং পুনর্বার তাঁকে শাস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করতে বলেন। এক ভট্টাচার্য তাঁকে আজ কি অধ্যয়ন করেছেন জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বরূপ ব্যাকরণের সূত্র ব্যাখ্যা করেন এবং পরে নিজেই তা খণ্ডন করেন। এভাবে বিশ্বরূপ তিনবার ব্যাকরণের সূত্র ব্যাখ্যা করেন এবং নিজেই সেই সূত্র খণ্ডন করে অপর সূত্র প্রতিস্থাপন

করেন। বিশ্বরূপের এরূপ পাণ্ডিত্য দেখে উপস্থিত ভট্টাচার্যগণ সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। কিন্তু বিশ্বরূপের ঈশ্বর তত্ত্ব বা স্বরূপ তত্ত্ব কেউই জানতে পারেন না। বিশ্বরূপ নবদ্বীপ তথা নদীয়ার ভক্তিশূন্য রূপ দেখে বড়ই ভারাক্রান্ত হন। লক্ষণীয়, বিশ্বরূপের দৃষ্টিতে কবি এক্ষেত্রে নদীয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে তৎকালীন সামাজিক চিত্রের পরিচয় পেয়ে থাকি —

''ব্যবহার মদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার।। ৮২
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন ব্যয়।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধর্ম্ম কেহো না জানয়।। ৮৩''[৪০২]

অর্থাৎ, বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখের জন্য আড়ম্বর পূর্ণ উৎসবে তৎকালীন মানুষ অর্থব্যয় করলেও কোথাও কৃষ্ণপূজা হত না। সুতরাং ভক্তিশূন্য এক সমাজ পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে বিশ্বরূপ যখন বড়ই ব্যথিত তখন একমাত্র অদ্বৈতাচার্য কৃষ্ণভক্তির কথা ব্যাখ্যা করেন। যদিও কবি পূর্বেই জানিয়েছেন — অদ্বৈতাচার্য পড়াতেন যোগবাশিষ্ঠ নামে জ্ঞানমার্গের উপযোগী গ্রন্থ। এই স্থানেও কবি সেকথা স্বীকার করে নিয়ে বললেন —

''সকলে অদ্বৈতসিংহ পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি।
পঢ়াইয়া বাশিষ্ঠ, বাখানে' কৃষ্ণভক্তি।। ৮৭''[৪০৩]

অর্থাৎ, অদ্বৈতাচার্য যেহেতু কৃষ্ণের পূর্ণশক্তিরূপে বিরাজিত তাই তিনি 'যোগবাশিষ্ঠ' নামে জ্ঞানমার্গের গ্রন্থ ব্যাখ্যা করলেও তা ভক্তিবিরোধী ছিল না। অর্থাৎ, প্রেমভক্তির প্রকাশ অদ্বৈতাচার্যের মধ্যে বিদ্যামান ছিল। একারণে বিশ্বরূপ সর্বদাই অদ্বৈতের সঙ্গে থেকে ভক্তিরস আস্বাদন করতেন। চৈতন্যদেব এই সময় অত্যন্ত ছোট বালক ছিলেন। শচীমাতা একদিন বালক চৈতন্যদেবকে পাঠান অদ্বৈতের গৃহে বিশ্বরূপকে ভোজনের জন্য ডাকতে। বালক চৈতন্যের পরম সুন্দর রূপ দেখে সকলের মত অদ্বৈতাচার্যও মোহিত হন। এরপর কবি বলেছেন —

''বিশ্বরূপ কথা আদিখণ্ডে সে বিস্তার।
অনন্ত চরিত্র নিত্যানন্দকলেবর।। ১০৩''[৪০৪]

অর্থাৎ, কবি আদিখণ্ডে বিশ্বরূপের কথা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন বলে এখানে শুধুমাত্র বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। বিশ্বরূপ 'শ্রীশঙ্করারণ্য' নাম গ্রহণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে শচীদেবী মনে মনে অদ্বৈতাচার্যকেই দায়ী করেন। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ হবার ভয়ে শচীদেবী অদ্বৈতাচার্যকে মুখে কিছুই বলেন না। এরপর চৈতন্যদেব বড় হয়ে নিজ স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করে সর্বদাই অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে কৃষ্ণকথারসে মত্ত হয়ে থাকতেন দেখে শচীদেবী ভীত হয়ে আক্ষেপের সুরে বলেন —

''না রহে গৃহেতে পুত্র — হেন দেখি আই।

'এহো পুত্র নিলা মোর আচার্য্যগোসাঞি।।' ১১২"[৪০৫]

একারণে শচীমাতা আশঙ্কিত চিত্তে এবং বিশ্বম্ভরের বিরহ দুঃখে অদ্বৈতাচার্যকে 'দ্বৈত' বলে অনুযোগ করেন। অদ্বৈত শব্দের অর্থ 'ন দ্বৈত' হলেও অদ্বৈতাচার্য যেহেতু শচীমাতা ও তাঁর পুত্রের মধ্যে বিভেদ সংস্থাপন করেছেন, তাই তিনি 'দ্বৈত'— এরূপ অভিমত শচীদেবীর। কবি জানিয়েছেন, শুধুমাত্র এই অপরাধের কারণেই চৈতন্যদেব শচীমাতাকে প্রেমভক্তি প্রদান করেন নি। আসলে বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধে জগতের জীবকে শিক্ষা দেবার কারণেই চৈতন্যদেব এই সকল কথা বলেছেন বলে কবি জানিয়েছেন। তবে, বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়, এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে কবি অদ্বৈতাচার্য ও তাঁর অনুচর শিষ্যদেব প্রতি বিরূপ মন্তব্য করে বলেছেন —

"অদ্বৈতেরে গাইবেক 'শ্রীকৃষ্ণ' করিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন লঙ্ঘিয়া।। ১২২
যে বলিব অদ্বৈতেরে 'পরম বৈষ্ণব'।
তাহারেই বেড়িয়া লঙ্ঘিব পাপি সব।। ১২৩"[৪০৬]

কবির এরূপ মন্তব্য অদ্বৈতাচার্যের অনুগামী শিষ্যদের প্রতি বলেই মনে হয়। অর্থাৎ, অদ্বৈতাচার্যের শিষ্যরা তাঁকে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে মনে করতেন এবং পরম কৃষ্ণের সেবক মহা বৈষ্ণব বলে ভাবতেন তা কবির উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয়। আবার পাশাপাশি কবি নিজ গুরুদেব নিত্যানন্দের যে দীর্ঘ মহিমা বর্ণনা করেছেন এই অংশে তা থেকেও কবির পক্ষপাতিত্বের মনোভাবটি পরিস্ফুট হয়। এমনকি, কবি নিজ গুরুদেব নিত্যানন্দকে ঈশ্বর-তত্ত্ব বলে প্রমাণ করতে যেমন কখনও বলরামের অবতার কল্প বলেছেন তেমনি সন্ন্যাসে চলে যাওয়া বিশ্বরূপের 'অভেদ তত্ত্ব' বলেও স্বীকার করেছেন। শুধু তাই নয় চৈতন্যপরবর্তী কালে অর্থাৎ কবি যখন কাব্যটি প্রণয়ন করেন তখন বৈষ্ণবদের মধ্যে যে রীতিমত প্রভেদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তার সূত্রও আমরা এই অধ্যায়েই পেয়ে থাকি—

"বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা সমর্থ নহিব কোন জন। ১২৭
বৈষ্ণবনিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়।। ১২৮"[৪০৭]

লক্ষণীয়, এখানে কবি 'যার গণ' বলতে বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় দলের অনুগত লোকেদের কথা বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, একটি দলের বৈষ্ণবেরা অপর দলের বৈষ্ণবদের যে নিন্দা করতেন তা কবির উক্তিতে স্পষ্ট। কবি এই বিরোধের অবসান চেয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মিলনের প্রচেষ্টা করেছেন বলেই মনে হয়।

'মধ্যখণ্ড'-এর ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে কবি আবার বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা

বৈষ্ণবের প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্যদেব যখন এভাবে নবদ্বীপে মহামানবীয় ধর্ম প্রচার করে চলেছেন এবং প্রতিদিন রাত্রে নিজ অনুচর বৈষ্ণবভক্তের সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হয়ে প্রেমভক্তির প্রকাশ করে চলেছেন তখন তাঁর এই মহামানবীয় ঐশ্বর্য দেখে ইহলৌকিক সুখে নিয়োজিত মানুষেরা তাঁর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন। তবে এই অবৈষ্ণব ব্যক্তিদের চৈতন্যদেবের প্রতি বিরাগ ভাজনের প্রধান কারণ হল শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে হরিনাম সঙ্কীর্তনে প্রবেশ করতে না পারা। কবি প্রসঙ্গতই বলেছেন —

''সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্তবৃত্তি করয়ে শোধন।। ১৩
দেখিতে না পায় লোক, করে অনুতাপ।
সভেই 'অভাগ্য' বলি ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।। ১৪''[৪০৮]

সুতরাং বোঝা যায়, বাহ্যসুখে নিয়োজিত অবৈষ্ণব ব্যক্তিরা চৈতন্য প্রবর্তিত সঙ্কীর্তনে প্রবেশাধিকার না পেয়েই বিরূপ মন্তব্য করতেন। শুধু তাই নয় অত্যন্ত গোপনে অনেকে লুকিয়ে চৈতন্যদেবের হরিনাম সঙ্কীর্তনে নৃত্য দর্শন করতে চাইত। এমনি এক নবদ্বীপের ব্রহ্মচারী চৈতন্যদেবের হরিনাম সঙ্কীর্তন ও তৎসহ তাঁর নৃত্য দর্শন করতে শ্রীবাসের কাছে আবেদন করে বলেন —

''তুমি যদি একদিন কৃপা' কর মোরে।
আপনে লইয়া যাও বাড়ীর ভিতরে।। ২১
তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল কঁরো, হঙ কৃতকৃত্য।। ২২''[৪০৯]

ব্রহ্মচারীর আবেদনে শ্রীবাস ব্যথিত হয়ে তাঁকে চৈতন্যদেবের হরিনাম সঙ্কীর্তন ও নৃত্য দর্শন করবার জন্য বাড়ির ভেতরে প্রবেশাধিকার দেন এবং লুকিয়ে থাকতে বলেন। এরপর বৈষ্ণবদের সঙ্গে চৈতন্যদেব হরিনাম সঙ্কীর্তন ও নৃত্য করতে আরম্ভ করেন এবং পরমানন্দে প্রেমাবেশে লিপ্ত হন। চৈতন্যদেব যেহেতু সর্বজ্ঞ, তাই তিনি ব্রহ্মচারীর লুকিয়ে নৃত্য দর্শনের কথা বুঝতে পারেন এবং তাঁকে অতি সত্ত্বর বাড়ির বাইরে বের করে দিতে শ্রীবাসকে আদেশ করেন। শ্রীবাস তখন ব্রহ্মচারীর নিষ্পাপ ও সাত্ত্বিক জীবনাচরণের পরিচয় দিলে চৈতন্যদেব বলেন —

''চণ্ডালেহো মোহোর শরণ যদি লয়।
সেহো মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয়।। ৪৩
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে, সত্য বলিলু বচন।। ৪৪''[৪১০]

অর্থাৎ, একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে যে লাভ করা যায় এবং ভক্তিহীন হয়ে সদাচার-সাত্ত্বিক হলেও

ভগবানকে যে পাওয়া যায় না — এই মহৎ সত্যই এখানে প্রকাশ করেছেন চৈতন্যদেব। সুতরাং তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে চৈতন্যদেবের এই উক্তি প্রয়োগ তাঁকে মহামানবের পর্যায়ে উন্নীত করেছে বলেই মনে হয়। সদাচার-সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী তখন সম্যক্রূপে নিরভিমান হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে চৈতন্যদেব তাঁর মাথায় স্বীয় পাদপদ্ম দান করেন এবং পুনরায় কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করতে শুরু করেন। এভাবে, চৈতন্যদেব ভক্তিই যে ভগবান লাভের প্রধান উপায়— তা প্রমাণ করেন।

এরপর কবি পুনরায় হরিনাম সঙ্কীর্তনে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় নবদ্বীপবাসীর আক্ষেপের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব নবদ্বীপবাসীর আক্ষেপ দেখে তাঁদের 'মহামন্ত্র' দান করেন এবং সেই মহামন্ত্র 'জপ' করবার যেমন উপদেশ দেন, তেমনি কীর্তন করবারও পরামর্শ দান করেন। চৈতন্যদেবের কাছ থেকে 'মহামন্ত্র' লাভ করে নবদ্বীপের সকলেই তখন 'কৃষ্ণনাম' যেমন ধ্যান করতে শুরু করেন তেমনি সন্ধ্যাকালে সঙ্কীর্তনেও লিপ্ত হন। এভাবে চৈতন্যদেব নিজ হরিনাম সঙ্কীর্তন ধর্ম নবদ্বীপ নগরে প্রচার করেন বলে কবি জানিয়েছেন। আবার কবি চৈতন্যদেব প্রবর্তিত হরিনাম সঙ্কীর্তনে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেছেন—

''মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে।। ৮৯
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তন সময়ে।
গায়েন বা'য়েন সভে আনন্দে হৃদয়ে।। ৯০''[৪১১]

লক্ষণীয়, কবির দেওয়া এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তৎকালীন সমাজ-পরিমণ্ডলে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল এবং তা মহাসমারোহেই অনুষ্ঠিত হত।

এই অধ্যায়েই কবি আবার শ্রীধরের মুখে হরিনাম সঙ্কীর্তন শ্রবণ করে বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের যে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা থেকেও তৎকালীন সামাজিক চিত্রের পরিচয় পেয়ে থাকি। পাশাপাশি লক্ষণীয়, চৈতন্যদেবের উপদেশে নবদ্বীপ নগরের সর্বত্র হরিনাম সঙ্কীর্তন উচ্চস্বরে গাওয়া হতে থাকলে কাজি সেই সংবাদ শ্রবণ করেন এবং মহাক্রোধ প্রকাশ করেন। শুধু তাই নয়, কবি বলেছেন —

''যাহারে পাইল কাজি, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে।। ১০৪''[৪১২]

নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের প্রতি কাজির এই অত্যাচারের বর্ণনা থেকেও আমরা তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় পেয়ে থাকি। এভাবে কাজি ও বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভয়ে ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বৈষ্ণবেরা ছিল সত্যিই মর্মাহত। ভীত-সন্ত্রস্ত বৈষ্ণবেরা তখন চৈতন্যদেবের কাছে তাঁদের দুঃখ নিবেদন করেন। বৈষ্ণবদের বেদনা দেখে চৈতন্যদেব তখন ক্রোধাবেশে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন এবং সমগ্র নদীয়া

নগর জুড়ে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন। কবি চৈতন্যদেবের এই নগরকীর্তনের বিস্তৃত বর্ণনা দান করে বলেছেন —

“কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।
কি সুখের না জানি হইল অবতার।। ১৬৪
কি চন্দ্র শোভা করে, কিবা দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে, কিছুই না জানি।। ১৬৫”[৪১৩]

এভাবে কবি একদিকে যেমন চৈতন্যদেবের অপরূপ রূপের বর্ণনা করেছেন তেমনি অপরদিকে নবদ্বীপ তথা নদীয়ার তৎকালীন সামাজিক চিত্রের পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন। চৈতন্যদেবের এই নগর কীর্তনে লক্ষ-কোটি লোকের যে সমাগম ঘটেছিল কবির অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা থেকে আমরা তা জানতে পারি। চৈতন্যদেব এরূপে নৃত্য করতে করতে অসংখ্য লোকের সঙ্গে নবদ্বীপের নানাস্থান পরিভ্রমণ করে কাজিগৃহে গমন করেন। কাজি অসংখ্য লোকের বাদ্য কোলাহলে হরিনাম শুনে বলেন —

“কাজি বোলে ‘জান’ ভাই! কি গীত বাজন।
কিবা কারো বিভা’, কিবা ভূতের কীর্ত্তন।। ৩৬১
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি আয় তবে চলিব আপনি।।’ ৩৬২”[৪১৪]

এই অভিমত প্রকাশ করে কাজি কীর্তনরত হিন্দুদের ধরে আনতে তাঁর অনুচরবৃন্দকে আদেশ করেন। কাজির অনুচরেরা চৈতন্যদেব ও তাঁর সঙ্গে লক্ষ-কোটি নদীয়া নগরের লোককে আসতে দেখে ভীত হয়ে পলায়ন করে কাজিকে সংবাদ প্রদান করেন। কাজি নিজেও চৈতন্যদেবের ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শ্রবণ করে এবং রুদ্রমূর্তি দর্শন করে ঘর থেকে অনুচরবৃন্দ সহ পলায়ন করেন। চৈতন্যদেব তখন ক্রোধাবেশে বলেন —

“ক্রোধে বোলে প্রভু ‘আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন’ ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা।।’ ৩৮৯”[৪১৫]

শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবের আদেশে কাজির ঘর যেমন ভাঙা হয়, তেমনি তাঁর ঘরে আগুনও ধরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে কাজির প্রতি দণ্ডদান করার পর বৈষ্ণব ভক্তদের নিবেদনে চৈতন্যদেবের মহাক্রোধ প্রশমিত হয় এবং পুনরায় সঙ্কীর্তনরসে মত্ত হয়ে পরমানন্দে তিনি প্রত্যাবর্তন করে শ্রীধরের গৃহে গমন করেন। শ্রীধরের গৃহে উপস্থিত হয়ে চৈতন্যদেব ভাঙ্গা লৌহপাত্রের জলপান করে ‘বিষ্ণুভক্তি’ লাভ করবার উপায়ে শিক্ষা দান করেন। আসলে চৈতন্যদেবের কাছে ধনী-দরিদ্র, উচু-নীচু ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। তিনি যে আসলে মানবতাবাদী ছিলেন, প্রেম এবং ভক্তিই যে তাঁর কাছে মুখ্য ছিল — শ্রীধরের গৃহে জলপান করবার মধ্য দিয়ে তাই প্রমাণিত হয়। এরপর কবি ভক্তের ও ভক্তির মাহাত্ম্য

কথন বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তবে, কবি এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতেও নিজ গুরুদেব নিত্যানন্দের প্রতি দীর্ঘ সশ্রদ্ধ বিনয় প্রকাশ করেছেন অযাচিত ভাবে এবং 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটি প্রণয়ন করবার সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রভেদের সৃষ্টি হয়েছিল তার চিত্রও তুলে ধরেছেন —

"তবে যে দেখহ হের অন্যোহন্যে বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহো নাহি বুঝে।। ৫২৬
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবের নিন্দে' সে-ই যায় ক্ষয়।। ৫২৭"[৪১৬]

'মধ্যখণ্ড'-এর চতুর্বিংশতি অধ্যায়েও কবি চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ভাব বিমোহিত রূপের বর্ণনা দান করেছেন। চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ও হরিনাম সঙ্কীর্তনে সর্বদা এতই মগ্ন থাকতেন যে কোন সময় মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়তেন। প্রেমভক্তির আবেশের কারণেই চৈতন্যদেবের এরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা বলে মনে হয়। আবার কৃষ্ণ বিরহের কারণে চৈতন্যদেব যে নিরন্তর কাঁদতেন তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেও কবি বলেছেন —

"কি নগরে কি চত্বরে কিবা জলে বনে।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে শ্রী নয়নে।। ৭"[৪১৭]

তবে লক্ষণীয়, কৃষ্ণপ্রেমাবেশে চৈতন্যদেবের দু'টি ভাব বিমোহিত রূপের পরিচয় কবি দিয়েছেন। চৈতন্যদেব কখনও স্বয়ং ঈশ্বর ভাবে আবিষ্ট হয়ে যেমন নিজেকে "মুঞি সেই মদনগোপাল" বলেছেন, তেমনি কখনও আবার ভক্তভাবে আবিষ্ট হয়ে "মুঞি কৃষ্ণদাস সর্বকাল" — একথাও বলেছেন। শুধু তাই নয় কৃষ্ণঅপ্রাপ্তির কারণে বিরহের অতলতায় চৈতন্যদেব ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাবেশে অভিযোগ, অনুযোগ ও অভিমান প্রকাশ করেছেন। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণের প্রতি এই বিরহার্তি প্রকাশে রাধাভাবই পরিস্ফুট হয়েছে বলে মনে হয়। তাই চৈতন্যদেব কৃষ্ণকে শঠ, ধৃষ্ট, কপট প্রভৃতি যেমন বলেছেন, তেমনি আরও বলেছেন —

"কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায়।।
যে 'কৃষ্ণ' বোলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায়।। ১৯"[৪১৮]

শুধু তাই নয়, বিরহাবস্থায় রাধা যেমন কৃষ্ণের নাম শ্রবণ কিংবা শুধুমাত্র চিত্র দর্শনেই সুখ পরিগ্রহ করতেন চৈতন্যদেবও অনুরূপে কৃষ্ণের 'ত্রিভঙ্গ-আকৃতি' অঙ্কন করে প্রেমাভাবে আবিষ্ট হয়েছেন। তবে লক্ষণীয়, কবি চৈতন্যদেবের মধ্যে 'গোপী' ভাবাবেশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেও কোথাও সরাসরি রাধাভাবের কথা বলেন নি।

এরপর কবি অদ্বৈতাচার্যের গোপীভাবে আবিষ্ট হয়ে প্রেমজনিত আর্তি প্রকাশের প্রসঙ্গ উত্থাপন

করেছেন। একদিন অদ্বৈতাচার্য গোপীভাবে যখন কৃষ্ণ বিরহার্তি প্রকাশ করে চলেন নিরন্তর, তখন সচ্চিদানন্দ চৈতন্যদেব সেখানে এসে উপস্থিত হন। চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের প্রেমভক্তির প্রকাশ দেখে তাঁর প্রতি সদয় হয়ে নিজ বিশ্বরূপ ঐশ্বর্য পরিদর্শন করান। চৈতন্যদেবের বিশ্বরূপ দর্শন করে অদ্বৈতাচার্য অনির্বচণীয় এক সুখে বিমোহিত হয়ে কাঁদতে থাকেন। লক্ষণীয়, কবি এক্ষেত্রে চৈতন্যদেবের যে বিশ্বরূপের বর্ণনা দান করেছেন তা ভাগবতের অনুযায়ী। তবে শুধু অদ্বৈতাচার্যই নন, নিত্যানন্দও চৈতন্যদেবের এই বিশ্বরূপ পরিদর্শন করেন এবং কৃষ্ণপ্রেমের ভাবে বিমোহিত হয়ে পড়েন। চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্য এবং নিত্যানন্দকে বিশ্বরূপ পরিদর্শন করানোর কিছুক্ষণ পর নিজ ঈশ্বর ভাব সম্বরণ করে আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য তখন পরস্পর প্রণয়-কলহে লিপ্ত হন বলে কবি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উভয় বৈষ্ণবই পরস্পরের প্রতি যে উক্তিতে কলহ করেন এবং একে অপরকে শ্লেষপূর্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন তা থেকে বৈষ্ণব সমাজে উভয়ের প্রতিষ্ঠার একটি লড়াইয়ের চিত্র ফুটে ওঠে। কবি নিজে নিত্যানন্দের শিষ্য হলেও উভয় বৈষ্ণবের এই কলহ বর্ণনায় কোনও পক্ষপাত করেন নি। বরং কবি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই কলহের অবসান চেয়ে বলেছেন —

> ‘‘সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
> যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া।। ১০১’’[৪১৯]

আমরা পূর্বেই কবির দেওয়া বর্ণনা থেকে জেনেছি, চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমাবেশে যে হরিনাম সঙ্কীর্তন তা শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই অনুষ্ঠিত হত। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় চৈতন্যদেব সকল বৈষ্ণব অনুচরবৃন্দ সহ শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হতেন এবং সমগ্র রাত্রি জুড়ে হরিনাম সঙ্কীর্তনের মধ্য দিয়ে নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করতেন। ‘মধ্যখণ্ড’-এর পঞ্চবিংশতি অধ্যায়েও কবি অনুরূপে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ঐশ্বর্য প্রকাশের বর্ণনা দান করে বলেছেন —

> ‘‘নিরবধি করে প্রভু হরিসঙ্কীর্ত্তন।
> আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে অনুক্ষণ।। ৫’’[৪২০]

এভাবে চৈতন্যদেব নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ করে প্রেমরসের দ্বারা আনন্দ-আবেশে প্রত্যহ লিপ্ত হন। কিন্তু এরপর বাহ্যদশা ফিরে পেয়ে চৈতন্যদেব সকল বৈষ্ণব ভক্তসহ যেমন কোনদিন গঙ্গা বিহারে বের হতেন, তেমনি কোনদিন শ্রীবাসের অঙ্গনেই ভক্তগণের অর্পিত গঙ্গা জলে স্নান করতেন। চৈতন্যদেবকে স্নান করাবার জন্য এই গঙ্গাজল বহন করে আনতেন শ্রীবাসের এক দাসী। তাঁর নাম ছিল ‘দুঃখী’। চৈতন্যদেব নিজের স্নানের জন্য সারি সারি গঙ্গাজলে পূর্ণ কলসী সমূহ দেখে পরমানন্দে শ্রীবাসকে প্রশ্ন করেন কে এই জল বহন করে এনেছে? শ্রীবাস তখন নিজ দাসী ‘দুঃখী’-র কথা জানালে চৈতন্যদেব এই ভাগ্যবতী দাসীর নাম পরিবর্তন করে রাখেন ‘সুখী’। চৈতন্যদেব বলেন —

> ‘‘এ জনের ‘দুঃখী’ নাম কভু যোগ্য নহে।

সর্ব্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্ত লয়ে।। ১৬"[৪২১]

যেহেতু ভক্তি ও প্রীতির সঙ্গে তিনি চৈতন্যদেবের সেবা করেছিলেন তাই তিনি গৌরাঙ্গের কৃপায় 'দুঃখী' থেকে 'সুখী' হয়ে যান। আসলে কবি এখানে বলতে চেয়েছেন — ভক্তি এবং প্রেমের দ্বারাই ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব।

আবার একদিন চৈতন্যদেব শ্রীবাসের গৃহে হরিনাম সঙ্কীর্তন করবার সময় শ্রীবাসের অসুস্থ পুত্র পরলোক গমন করেন এবং এ কারণে উপস্থিত নারীগণ চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেন। নারীদের কান্না শুনে শ্রীবাস অতি সত্বর গৃহের ভেতর প্রবেশ করেন এবং দেখতে পান তাঁর পুত্র পরলোক গমন করেছেন। তখন শ্রীবাস নারীদের কান্না থাকাবার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ চৈতন্যদেবের প্রেমাবেশে নৃত্যের যে আনন্দ তা ভঙ্গ হতে পারে বলে শ্রীবাস মনে করেন। কবি জানিয়েছেন — সর্বতত্ত্ব জ্ঞানী শ্রীবাস জানেন অন্তকালে যেখানে কৃষ্ণের নাম কীর্তন হয় মৃত্যুর পর তাঁর পরলোক গমন ঘটে। তাই পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। শ্রীবাস পণ্ডিত উপস্থিত শোকাকুল আত্মীয়বর্গকে একথা জানিয়ে চৈতন্যদেবের হরিনাম সঙ্কীর্তনে পুনরায় যোগদান করেন এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করতে থাকেন। কিন্তু অন্তর্যামী চৈতন্যদেব ভক্তগণের মনোদুঃখের কথা বুঝতে পারেন এবং শ্রীবাসের কাছে মনোদুঃখের কারণ জানতে চান। শ্রীবাস পণ্ডিত নিজে চৈতন্যদেবকে কিছু না বললেও উপস্থিত ভক্তবৃন্দেরা শ্রীবাস-পুত্রের মৃত্যু সংবাদ জানান। এই বেদনাদায়ক সংবাদ শ্রবণ করে চৈতন্যদেব নিজেও মনোদুঃখ প্রকাশ করেন এবং নিজের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন —

"পুত্রশোক না জানিল যে মোহোর প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িমু কেমনে।। ৫২"[৪২২]

চৈতন্যদেবের মুখে গার্হস্থ্য ধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছার কথা শ্রবণ করে সকল বৈষ্ণব ভক্ত তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় কাঁদতে থাকেন। এদিকে চৈতন্যদেব শ্রীবাসের মৃত শিশুপুত্রের সঙ্গে কথোপকথনে তত্ত্বকথার প্রকাশ করেছেন। আসলে কর্মফল অনুসারেই জীবের জন্ম হয় এবং প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ সমাপন হলে জীব আর সেই দেহে থাকতে পারে না। জীব তখন নতুন দেহ ধারণ করে পুনরায় প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করেন। ভারতীয় এই 'কর্মফলবাদ'-এর তত্ত্ব প্রকাশ করে শ্রীবাসের মৃত পুত্র চৈতন্যদেবকে বলেছেন —

"কে বা কার বাপ প্রভু! কে কার নন্দন।
সভে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন।। ৬২"[৪২৩]

সুতরাং, এভাবে 'কর্মফল' সম্পর্কিত তত্ত্বকথা প্রকাশ করে শ্রীবাসের মৃত পুত্র সকল বৈষ্ণবগণসহ চৈতন্যদেবের চরণে নমস্কার জানিয়ে বিদায় প্রার্থনা করেন। মনে হতে পারে শ্রীবাসের মৃত পুত্র কি প্রকারে চৈতন্যদেবের সঙ্গে এই তত্ত্বকথা আলোচনায় সমর্থ হতে পারলেন? কবি জানিয়েছেন—

চৈতন্যদেব যেহেতু স্বয়ং ভগবান তাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শ্রীবাসের অচেতন পুত্র চেতনা পেয়ে তত্ত্বকথার প্রকাশ করেছে। এভাবে ‘তত্ত্বকথা’র প্রকাশ করে শ্রীবাসের মৃত পুত্র বিদায় গ্রহণ করলে উপস্থিত সকল বৈষ্ণবভক্ত শোক দূরীভূত করে পুনরায় কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মত্ত হন। চৈতন্যদেব তখন শ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রদ্ধা-ভক্তির বশীভূত হয়ে তাঁর পুত্রত্ব অঙ্গীকার করেন এবং অভিন্নস্বরূপ নিত্যানন্দকেও শ্রীবাসের পুত্রত্বের অঙ্গীকার করান।

এভাবে চৈতন্যদেব ধীরে ধীরে হরিনাম সঙ্কীর্তনে এতই বিভোর হয়ে পড়েন যে তাঁর মধ্যে সংসার বিমুখতা প্রতীয়মান হয়ে উঠতে থাকে। একদিন আবার চৈতন্যদেব শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে অন্ন ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেবের এই বাসনা প্রকাশে শুক্লাম্বর অত্যন্ত ভীত হন। কারণ সে নিজেই ভিক্ষা করে অন্ন সংস্থান করে থাকেন। কিন্তু তবু চৈতন্যদেবের ইচ্ছার কারণে শুক্লাম্বর প্রেমভক্তি ও দীনতার সঙ্গে সযত্নে রন্ধন করে সপার্ষদসহ তাঁকে ভোজন করান। পরমানন্দে চৈতন্যদেব শুক্লাম্বরের অন্ন ভোজন করেন এবং তাঁর প্রতি কৃপা বর্ষণ করেন। অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে চৈতন্যদেব ভোজন সমাপন করে শুক্লাম্বরের গৃহেই সপার্ষদ শয়ন গ্রহণ করেন এবং নবদ্বীপের বিজয়দাস নামে এক পুথির অনুলিপিকরকে নিজ ঐশ্বর্যের পরিদর্শন করান। চৈতন্যদেবের ঐশ্বর্য পরিদর্শন করে বিজয়দাস বিমোহিত হয়ে পড়েন। এভাবে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নানারূপ ঐশ্বর্যের যে প্রকাশ করতেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন —

“মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘুসিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন।। ১৫৪
এইমত যত অবতার সে সকল।
সেই রূপ হয় প্রভু স্বভাববৎসল।। ১৫৫”[৪২৪]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেবই যে স্বয়ং ভগবান এবং তিনি দুষ্টের দমন ও সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্যই যে অবতীর্ণ হয়েছেন এই তথ্যই প্রতিপাদন করেছেন কবি। আবার লক্ষণীয়, চৈতন্যদেব বলরাম ভাবেও আবিষ্ট হয়ে নিজ ঐশ্বর্য যেমন প্রকাশ করেছেন তেমনি কখনও কখনও গোপীভাবেও আবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণ অপ্রাপ্তির কারণে বিরহার্তি প্রকাশ করেছেন। চৈতন্যদেব গোপীভাবে আবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণের জন্য যে বিরহার্তি প্রকাশ করেছেন তা রাধার ব্যাকুলতাময় বিরহের কথা স্মরণ করালেও কবি কিন্তু কোথাও চৈতন্যদেবের রাধাভাবের কথা সরাসরি উল্লেখ করেন নি। এরূপে গোপীভাবে চৈতন্যদেবকে আবিষ্ট হতে দেখে বহির্মুখ পড়ুয়াগণ তাঁকে নিন্দা করেন। আসলে কবি বলতে চেয়েছেন, এই পড়ুয়াগণেরা মূর্খ ও অল্পবুদ্ধির হওয়ায় চৈতন্যদেবের গোপীভাবে ঐশ্বর্য প্রকাশের তত্ত্ব বুঝতে না পারায় তাঁর নিন্দা করেছেন। এরপর চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের কাছে জীবের উদ্ধারের জন্যে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শুধু নিত্যানন্দই নন, একে একে সকল বৈষ্ণব ভক্তগণের কাছেই চৈতন্যদেব নিজ সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সকল বৈষ্ণব ভক্তগণই তখন ভাবি বিচ্ছেদের বিরহে নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করেন।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শ্রবণে সকল ভক্তগণের নিরতিশয় দুঃখ বর্ণনার কাহিনি দিয়েই কবি 'মধ্যখণ্ড'-এর ষড়বিংশ অধ্যায়েরও সূচনা করেছেন। চৈতন্যদেবের ভাবী বিরহের কারণে সকল ভক্তবৃন্দ দুঃখ প্রকাশ করলে তিনি প্রবোধ দিয়ে বা সান্ত্বনা দান করে বলেন—

''প্রভু বোলে 'তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব্বক্ষণ।। ৬
তোমা সভার জ্ঞান আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিলাঙ আমি তোমা' সভারে ছাড়িয়া।। ৭''[৪২৫]

এভাবে সকল বৈষ্ণবভক্তবৃন্দকে প্রবোধ দান করে চৈতন্যদেব নিজ গৃহে প্রবেশ করেন। কিন্তু লোকপরম্পরায় তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প শচীমাতা জানতে পেরে মর্মন্তুদ রোদন করতে থাকেন। দুঃখের অতল গভীরে প্রবেশ করে শচীমাতা চৈতন্যদেবের কাছে আর্তি প্রকাশ করেন সন্ন্যাসে না যাবার জন্য। শচীমাতার শুদ্ধ বাৎসল্য স্নেহের আর্তি শুনে এবং নিরন্তর রোদন প্রকাশ করতে দেখে চৈতন্যদেবেরও মাতৃপ্রেমে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। শচীমাতার সন্ন্যাসে না যাবার আর্তির প্রত্যুত্তরে চৈতন্যদেব একটি কথাও বলতে পারেন নি। কিন্তু শচীমাতা যখন পুত্রের ভাবী বিচ্ছেদের বিরহে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন তখন চৈতন্যদেব মাতার কাছে 'গোপ্য কথা' প্রকাশ করে বলেন —

''প্রভু বোলে 'মা! তুমি স্থির কর' মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন।। ৩৮''[৪২৬]

অর্থাৎ, শচীদেবী যে চৈতন্যদেবের জন্ম-জন্মের মাতা এবং সেব্য-বিগ্রহ-স্বরূপা— এই গুহ্য কথা প্রকাশ করেন চৈতন্যদেব। শচীমাতাকে প্রবোধ দান করে এরপর তিনি পুনরায় হরিনাম সঙ্কীর্তনের আনন্দে লিপ্ত হন বৈষ্ণব ভক্তদের নিয়ে। কিন্তু এরই মাঝে নিত্যানন্দের কাছে চৈতন্যদেব নিজের সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগের কথা এবং সন্ন্যাস গ্রহণের তারিখের কথা প্রকাশ করে বলেন —

''শুন শুন নিত্যানন্দস্বরূপ গোসাঞি!
এ কথা ভাঙ্গিবে সব পঞ্চ-জন-ঠাঞি।। ৫৬
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।। ৫৭''[৪২৭]

অর্থাৎ, যেদিন নিত্যানন্দের কাছে চৈতন্যদেব এই কথাগুলি বলেন, তার অব্যবহিত পরবর্তী সংক্রান্তির দিনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন বলে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আবার কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন তাও নিত্যানন্দের কাছে প্রকাশ করেন। নিত্যানন্দের কাছে নিজের এই

অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করে চৈতন্যদেব সেই দিন সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ সহ হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হয়ে পরমানন্দে ভোজন করেন। পরে সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গা পরিভ্রমণে বের হয়ে চৈতন্যদেব গঙ্গার বন্দনা করে সকল বৈষ্ণবের প্রতি কৃষ্ণভজনর উপদেশ দান করেন। সকল বৈষ্ণবকে যখন চৈতন্যদেব কৃষ্ণভজনের উপদেশ দান করছিলেন এমন সময় শ্রীধর একটি লাউ হাতে করে তাঁর ভোজনের জন্য নিয়ে আসেন। শ্রীধরের হাতে লাউ দেখে চৈতন্যদেব মনে মনে বলেন —

> ''নিজ মনে জানে প্রভু 'কালি চলিবাঙ।
> এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ।। ৮৩
> শ্রীধরের পদার্থ কি হইব অন্যথা।
> এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা।।' ৮৪''[৪২৮]

সুতরাং, বোঝা যায় নিত্যানন্দকে চৈতন্যদেব যেদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছিলেন, সেই সংক্রান্তির দিনটি ছিল তার অব্যবহিত পরের দিন। এই কারণে শ্রীধরের ভক্তিমিশ্রিত লাউ চৈতন্যদেব সেইদিনই রাত্রে ভোজন করেন পরমানন্দে। ভোজন সমাপন করে চৈতন্যদেব শয়ন-গৃহে গমন করেন। চৈতন্যদেবের কাছেই সেদিন গদাধর পণ্ডিত ও হরিদাস ঠাকুর শয়ন গ্রহণ করেছিলেন বলে কবি জানিয়েছেন। সুতরাং, বোঝা যায় চৈতন্য-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সেদিন বাড়িতে ছিলেন না। সেই রাত্রেই চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করলে দেখতে পান শচীদেবী উঠোনে বসে ভাবী বিচ্ছেদের বিরহে রোদন করছেন। শচীদেবীকে তখন চৈতন্যদেব প্রবোধ দান করে এবং তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে সন্ন্যাসে বের হন।

চৈতন্যদেব এভাবে রাত্রিবেলায় সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছিলেন বলে বৈষ্ণবেরা কেউই বিষয়টি জানতে পারেন নি। পরদিন সকালে চৈতন্য পরিদর্শনে এসে তাঁকে না দেখতে পেয়ে এবং তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শ্রবণ করে সকলেই চৈতন্য বিরহে আর্তনাদ করে ওঠেন। কবি এই বৈষ্ণবদের চৈতন্যবিরহের ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে বলেছেন —

> ''শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
> ভূমিতে পড়িলা সভে হই অচেতন।। ১২১
> কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ।
> কান্দিতে লাগিলা সভে করি আর্ত্তনাদ।। ১২২''[৪২৯]

তবে লক্ষণীয়, কেবল বৈষ্ণবভক্তগণই নয়, সকল নবদ্বীপবাসী, এমনকি, বাহ্যিক ইন্দ্রিয় সুখে নিয়োজিত নিন্দুকেরাও চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদে বিরহার্তি প্রকাশ করেন।

এরপর কবি চৈতন্যদেবের কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। পরদিন সকালবেলা চৈতন্যদেব যখন কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে এসে উপস্থিত হন তখন নিত্যানন্দ,

গদাধর, মুকুন্দ দত্ত, চন্দ্রশেখরাচার্য এবং ব্রহ্মানন্দও কেশব ভারতীর আশ্রমে আসেন। চৈতন্যদেব এই পাঁচ বৈষ্ণবভক্তকে আশ্রমে আসবার জন্য পূর্বেই অনুরোধ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের অনুরোধে প্রত্যেকে উপস্থিত হয়ে কেশব ভারতীকে দণ্ডবত প্রণাম করেন। চৈতন্যদেব এইসময় কেশব ভারতীর কাছে কৃষ্ণদাস্য প্রার্থনা করেন এবং নিজ ভক্তি থেকে উত্থিত দৈন্যবশতঃ প্রেমাশ্রুতে লিপ্ত হন। চৈতন্যদেবের দৈন্য ও ভক্তি দেখে কেশব ভারতী প্রসন্নচিত্তে তাঁকে বলেন —

> ''যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে।
> এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে।। ১৬৯
> তুমি সে জগতগুরু জানিল নিশ্চয়।
> তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয়।। ১৭০''[৪৩০]

প্রশ্ন উঠতে পারে চৈতন্যদেব যদি স্বয়ং ঈশ্বর ও জগৎ গুরু হন তাহলে তিনি কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিতে এসেছেন কেন? কেশব ভারতী প্রসঙ্গত নিজেই বলেছেন, আসলে লোকশিক্ষা দেবার জন্যই চৈতন্যদেবের এরূপ বাসনা প্রকাশ। সাধন-ভজন করতে হলে গুরুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করা যে প্রয়োজন, জীবকে সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেব এই শিক্ষাই দিয়েছেন। এরপর চৈতন্যদেব কেশ মুণ্ডন করবার সময় তাঁর অতি সুন্দর চাঁচর-চিকুর-শোভিত মস্তক মুণ্ডনের করুণ দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকল লোকই অতিদুঃখে রোদন করেন। এভাবে মস্তক মুণ্ডনের পর চৈতন্যদেব গঙ্গাস্নান করে সন্ন্যাস গ্রহণের স্থানে এসে উপবেশন করেন এবং নিজে সন্ন্যাস গ্রহণের যে মন্ত্র পূর্বে স্বপ্নে শ্রবণ করেছিলেন সঠিক কিনা তা যাচাই করতে কেশব ভারতীর কর্ণগোচর করেন। কেশব ভারতী সেই মন্ত্র শ্রবণ করে মহাবিস্ময়ে অভিভূত হন এবং চৈতন্যদেবের ইচ্ছার কারণে সেই মন্ত্রই পুনর্বার তাঁর কর্ণগোচর করেন। এভাবে চৈতন্যদেব কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণের মন্ত্র দীক্ষা লাভ করেন। প্রথা অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের পর নব নাম ধারণ করতে হয়। কারণ সন্ন্যাস গ্রহণের পর সেই ব্যক্তির পূর্ব পরিচয় সম্পূর্ণরূপে বিলোপিত হয়; চৈতন্যদেবেরও নব নাম দেবার সময় কেশব ভারতী চিন্তিত হন। 'ভারতী' উপাধি গুরুর শিষ্য 'ভারতী' উপাধিধারী হবেন — এই প্রথা প্রচলিত থাকলেও কেশব ভারতী চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসাশ্রমের নামকরণে 'ভারতী' উপাধিহীন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম রাখেন। প্রসঙ্গত কেশব ভারতী চৈতন্যদেবকে বলেন —

> ''যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
> করাইলা চৈতন্য — কীর্ত্তন প্রকাশিয়া।। ২১৬
> এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
> সর্বলোকে তোমা হইতে যাতে হৈল ধন্য।। ২১৭''[৪৩১]

এভাবে চৈতন্যদেবের নব নামকরণের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্ব সমাপন হলে কবি 'মধ্যখণ্ড'-এর

পরিসমাপ্তি দান করেন।

'চৈতন্যভাগবত' কাব্যের 'অন্ত্যখণ্ড' কবি বৃন্দাবন দাস আবার দশটি অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত করেছেন। 'মধ্যখণ্ড'-এ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনি বর্ণনার পর কবি 'অন্ত্যখণ্ড'-এ তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী জীবন কাহিনি অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন বলেই মনে হয়। 'অন্ত্যখণ্ড'-এর প্রথম অধ্যায়েই কবি সূচনাতে বলেছেন —

> ''শেষখণ্ড-কথা ভাই! শুন একচিত্তে।
> নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে।। ৪''[৪৩২]

অর্থাৎ, কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে উন্মত্তের ন্যায় হরিনাম সঙ্কীর্তনে নৃত্য করতে থাকেন এবং সন্ন্যাস গুরু কেশব ভারতীকে আলিঙ্গনের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম বা বিষ্ণুভক্তি দান করেন। শিষ্য চৈতন্যদেবের কাছ থেকে কৃষ্ণপ্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে গুরুদেব কেশব ভারতীও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে 'হরি হরি' বলে নৃত্য করতে থাকেন। শুধু তাই নয় প্রেমরসে মত্ত হয়ে কেশব ভারতী ভূমিতে গড়াগড়ি যাবার সময় হাতের দণ্ড, কমণ্ডুলু, এমনকি, পরিধেয় বস্ত্রও সংবরণ করতে পারেন নি বলে কবি জানিয়েছেন। এভাবে সন্ন্যাস গ্রহণের দিন সারারাত্রি চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত থেকে পরদিন সকালবেলায় বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি কেশব ভারতীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে চান। সন্ন্যাস গুরু কেশব ভারতী তখন চৈতন্যদেবের সঙ্গেই হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত থাকার জন্য বাসনা প্রকাশ করেন এবং গুরু-শিষ্য উভয়ে মিলে বনে প্রবেশ করেন। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রশেখর আচার্য। এই চন্দ্রশেখর আচার্যের পত্নী ছিলেন শচীমাতার সহোদরা। সুতরাং চন্দ্রশেখর ছিলেন চৈতন্যদেবের 'মেশোমহাশয়'। উপস্থিত চন্দ্রশেখরকে 'পিতা' বলে সম্বাধন করে ও আলিঙ্গন করে চৈতন্যদেব নবদ্বীপের গৃহে ফিরে যেতে বলেন এবং তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনের উদ্দেশ্যে গমন করেছেন তাও সবাইকে জানাতে বলেন। চন্দ্রশেখর আচার্য তখন চৈতন্যদেবের বিরহ-দুঃখে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। পরে তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে ব্যথিত হয়ে নবদ্বীপে ফিরে আসেন এবং সকল নবদ্বীপবাসীর কাছে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে যাবার কথা প্রকাশ করেন। চন্দ্রশেখরের কাছে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শ্রবণ করে সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ বিরহের অতল গভীরে প্রবেশ করে বিরহার্তি প্রকাশ করেন। হঠাৎ তখন আকাশবাণী হয় যে, চৈতন্যদেব দু-চারদিনের মধ্যে পুনরায় নবদ্বীপে আসবেন এবং পূর্বের ন্যায় নবদ্বীপে হরিনাম সঙ্কীর্তনে নৃত্য করবেন। এই আকাশবাণী শ্রবণ করে নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণবভক্তগণ তখন কিছুটা বিরহ-দুঃখ থেকে প্রশান্তি লাভ করেন।

এরপর কবি জানিয়েছেন, চৈতন্যদেব কাটোয়া থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেন। এসময় চৈতন্যদেবের সঙ্গে ছিলেন —

"নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, আগে কেশব ভারতী।। ৪৯"[৪৩৩]

সুতরাং, বোঝা যায় চৈতন্যদেব যখন পশ্চিমদিকে যাত্রা করেন তখন গুরুদেব কেশবভারতী ছাড়াও নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ ও গোবিন্দ সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু কবির বর্ণনা থেকে আমরা পূর্বেই জেনেছি, চৈতন্যদেব যখন গৃহত্যাগ করে নবদ্বীপ থেকে কাটোয়ায় আসেন তখন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ দত্ত, চন্দ্রশেখরাচার্য এবং ব্রহ্মানন্দ — এই পাঁচজন অনুচর বৈষ্ণব ভক্তও কাটোয়ায় এসেছিলেন। তাহলে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন ওঠে কবি এই পয়ারে যে 'গোবিন্দ'-র কথা উল্লেখ করেছেন তিনি কে? কখনই বা তিনি নবদ্বীপ থেকে কাটোয়ায় গিয়ে উপস্থিত হলেন? আবার পূর্বে বর্ণিত 'ব্রহ্মানন্দ'-ই বা কোথায় অবস্থান করলেন? তবে, এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় ব্রহ্মানন্দের জায়গায় লিপিকর হয়তো প্রমাদবশতঃ 'গোবিন্দ'-র নাম উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, এভাবে চৈতন্যদেব কাটোয়ার পশ্চিম দিকে যাত্রা করে রাঢ়দেশে এসে উপস্থিত হন এবং রাঢ় দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করতে আরম্ভ করেন। অতঃপর চৈতন্যদেব বীরভূম জেলার অন্তর্গত 'বক্রেশ্বর'-এ যাবার বাসনা প্রকাশ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সকল বৈষ্ণব ভক্তসহ গমন করেন। সারাদিন এভাবে পথ পরিভ্রমণ করে দিনাবশেষে চৈতন্যদেব এক ব্রাহ্মণের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাত্রে চৈতন্যদেব সেখানেই শয়ন গ্রহণ করলেও মাঝরাতে তিনি সকলের অগোচরে বের হয়ে প্রান্তর ভূমিতে গিয়ে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে আর্তি প্রকাশ করেন। সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ তখন চৈতন্যদেবকে না দেখতে পেয়ে তাঁর অনুসন্ধানে বের হন এবং কৃষ্ণবিরহে প্রান্তর ধারে তাঁর ক্রন্দন শুনতে পান। তখন সকলে মিলে হরিনাম সঙ্কীর্তন করলে চৈতন্যদেব পুনরায় কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করতে শুরু করেন। চৈতন্যদেব এইসময় বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে নিজের পশ্চিমাভিমুখে যাত্রার পথ পরিবর্তন করে 'নীলাচলে' যাবার বাসনা প্রকাশ করেন। কারণ তিনি বলেন —

"জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
'নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে'।। ৮৮"[৪৩৪]

এই কারণে চৈতন্যদেব নীলাচলে যাবার উদ্দেশ্যে গমন করেন এবং রাঢ় দেশে হরিনাম বিমুখতা দেখে ব্যথিত হন। কিন্তু তিনি নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে পথে শিশুদের মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ করেন এবং বিমোহিত হয়ে পড়েন কৃষ্ণনাম শ্রবণে। এরপর চৈতন্যদেব ভক্তদের কাছে জানতে পারেন রাঢ় দেশের কাছেই গঙ্গার অবস্থানের কথা। গঙ্গার অবস্থানের নৈকট্য জেনে চৈতন্যদেব তখন গঙ্গার মহিমা কীর্তন বর্ণনা করেন।

এভাবে গঙ্গার দীর্ঘ স্তব-স্তুতি করে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ করেন। নিত্যানন্দের কাছে তিনি নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণব ভক্তকে জানাতে বলেন যে, নীলাচলে যাবার পূর্বে তিনি শান্তিপুরে

অদ্বৈতের গৃহে অবস্থান করবেন। সেখানেই যেন নিত্যানন্দ সকল নদীয়ার বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দকে নিয়ে উপস্থিত হন। নিত্যানন্দকে এই উপদেশ দিয়ে নবদ্বীপে পাঠিয়ে চৈতন্যদেব নিজে হরিদাস ঠাকুরের গোঁফা ফুলিয়ার উদ্দেশ্যে গমন করেন। নিত্যানন্দ এরপর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে চৈতন্যদেবের গৃহে প্রবেশ করে দেখেন শচীমাতা 'দ্বাদশ-উপবাস' করে রয়েছেন এবং পুত্রের জন্য বাৎসল্য-প্রীতিতে অবিরত ক্রন্দন করে চলেছেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে। নিত্যানন্দ তখন শচীদেবীর চরণধূলি গ্রহণ করে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলেন —

''শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সভারে।
'সত্বরে চলহ সভে প্রভু দেখিবারে।। ১৫৩
শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাঙ তোমা' সভারে নিবারে।। ১৫৪''[৪৩৫]

নিত্যানন্দের এই কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দই পরমানন্দ লাভ করেন এবং সান্ত্বনা পান। নিত্যানন্দ এরপর শচীমাতাকে নানারূপ প্রবোধ দিয়ে তাঁর 'দ্বাদশ-উপবাস' ভঙ্গ করিয়ে ভোজন করান। সকল নবদ্বীপবাসী চৈতন্যদেবের পরিদর্শনের কারণে ফুলিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন বলে কবি জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এসময় কবি চৈতন্যদেবের রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনুপম সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সকল বৈষ্ণব ভক্ত চৈতন্যদেবের রূপ সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করবার পর পরমানন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং তাঁর সঙ্গে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে যাত্রা করেন।

শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে উপস্থিত হয়ে চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের পাদপদ্ম ছুঁয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। শুধু তাই নয় প্রেমাবেশে অভিষিক্ত হয়ে উভয়ে পরস্পর ক্রন্দন করতেও থাকেন। লক্ষণীয়, কবি এক্ষেত্রে অদ্বৈতাচার্যের পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দের নাম যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি তাঁর শিশু সুলভ চাপল্যেরও পরিচয় দিয়েছেন। শিশু অচ্যুতানন্দ অবশ্য চৈতন্যদেবের সঙ্গে যে বাক্‌বিনিময় করেছেন তাতে সকল ভক্তগণ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ অচ্যুতানন্দ যে শৈশব থেকেই তাত্ত্বিক-পণ্ডিত ছিলেন তাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন কবি।

এভাবে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে চৈতন্যদেব যখন অবস্থান করছিলেন ভক্তসহ, তখন নিত্যানন্দ নদীয়ার সকল বৈষ্ণবভক্তবৃন্দ সেখানে এসে উপস্থিত হন। নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ চৈতন্যদেবকে পুনরায় দর্শন করতে পেরে প্রেমাবেশে ক্রন্দন করতে থাকেন। চৈতন্যদেবও নিজ ভক্তগণকে দেখতে পেয়ে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে পরমানন্দে নৃত্য করতে শুরু করেন। চৈতন্যদেব ও নবদ্বীপবাসী উভয়ের এরূপ দীর্ঘ আনন্দ প্রকাশের পর চৈতন্যদেব নিজ স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। নিজ স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন স্বরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন তা ব্যাখ্যা করেন। আবার কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্তন প্রচারের মধ্য দিয়ে প্রেমভক্তি প্রকাশের জন্যই যে চৈতন্যদেব আবির্ভূত

হয়েছেন — তাও ব্যক্ত করেন ভক্তবৃন্দের কাছে। এভাবে চৈতন্যদেব নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করলে সকল ভক্তগণ পুনরায় প্রেমাবেশে ক্রন্দন করতে থাকেন। চৈতন্যদেব বাহ্যদশা ফিরে পেয়ে সকলভক্তসহ গঙ্গাস্নানে যান এবং গঙ্গাস্নান করে এসে পরমানন্দে ভোজন করেন। কবি প্রসঙ্গত এই প্রথম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে বলেছেন —

''পুন প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ-দরশন।
পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য-আবেশে সঙ্কীর্ত্তন।। ২৮৪
সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রভু-সংহতি ভোজন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন।। ২৮৫''[৪৩৬]

'অন্ত্যখণ্ড'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে কবি শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে বৈষ্ণবভক্তগণের সঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রেমাবেশে সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েই কাহিনির সূচনা করেছেন। অদ্বৈতাচার্যের গৃহে চৈতন্যদেব নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে নিজ স্বরূপ-তত্ত্ব কথা নিয়ে সমস্ত দিন অতিবাহিত করার পর পরদিন চৈতন্যদেব নীলাচলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উপস্থিত বৈষ্ণবভক্তেরা তখন উড়িষ্যার রাজা ও বাংলার রাজার বিবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে চৈতন্যদেবকে নীলাচলে যেতে বিরত করতে চাইলে —

''প্রভু বোলে 'যে সে কেনে উৎপাত না হয়।
অবশ্য চলিব আমি করিল নিশ্চয়।।' ১৪''[৪৩৭]

অর্থাৎ, নীলাচলের উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেব যে কোন উপায়েই যে গমন করবেন — একথা অদ্বৈতাচার্য বুঝতে পারেন। সত্যিই চৈতন্যদেব এরপর পরমানন্দে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহ থেকে নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। চৈতন্যদেবের অনুসরণে বৈষ্ণব ভক্তগণও নীলাচলে যাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তিনি বৈষ্ণবদের বিরত করে সান্ত্বনা দান করেন। এরপর চৈতন্যদেব শান্তিপুর থেকে দক্ষিণ দিকে নীলাচলের উদ্দেশ্যে গমন করেন। অবশ্য কবি জানিয়েছেন চৈতন্যদেবের সঙ্গে নীলাচলের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন —

''নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ।। ৩৫''[৪৩৮]

এই বৈষ্ণব ভক্তদের সঞ্চয়-বুদ্ধি সম্পর্কে পরীক্ষা করতে চৈতন্যদেব কার কাছে কি সম্বল আছে জানতে চান? প্রত্যেক বৈষ্ণবই তাঁদের কাছে কিছুই সম্বল সঞ্চিত নেই জানালে চৈতন্যদেব পরম সন্তোষে তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন। ভগবানের ইচ্ছাতেই যে জীবের আহার্য মেলে এবং তাঁর অনিচ্ছাতে সম্মুখে উপস্থিত ভক্ষ্যদ্রব্যও যে ভোজন করা যায় না— এই শিক্ষাই জীবকে দান করেন চৈতন্যদেব। এভাবে চৈতন্যদেব তত্ত্বকথা প্রকাশ করতে করতে 'আটিসারা' গ্রামে এসে উপস্থিত হন। এই গ্রামটি বর্তমানে

চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুর নামক স্থানে। এই আটিসারা গ্রামের অধিবাসী শ্রীঅনন্তের গৃহে চৈতন্যদেব আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং সারারাত্রি কৃষ্ণকথায় নিয়োজিত থেকে পরদিন জাহ্নবীর উপকূলে 'ছত্রভোগ' গ্রামে এসে উপস্থিত হন। এই ছত্রভোগ গ্রামের কাছেই 'অম্বুলিঙ্গ ঘাট'-এ যে জলময় শিবলিঙ্গ আছে তা দর্শন করেন চৈতন্যদেব। এরপর কবি এই জলময় শিবলিঙ্গের উদ্ভবের বিবরণ বর্ণনা করে 'ছত্রভোগ' গ্রামকে মহাতীর্থ বলেছেন শতমুখী গঙ্গা প্রবাহের জন্য। এই গ্রামে চৈতন্যদেবের রামচন্দ্র খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। রামচন্দ্র খান ছিলেন দক্ষিণারাজ্যের রাজার অধিকারী ও মহাবিষয়ী ব্যক্তি। তবু তিনি যে ভাগ্যবান ছিলেন তা বোঝা যায় নিজের দৈন্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে রামচন্দ্র খান নিজেকে চৈতন্যদেবের 'দাসানুদাস' বলেছেন। এই রামচন্দ্র খানের কাছে চৈতন্যদেব কি উপায়ে দ্রুত নীলাচলে পৌঁছানো যায় জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিজ সহায়তায় নৌকায় আরোহন করে উৎকলে প্রবেশ করান চৈতন্যদেবকে। এরপর সেখান থেকে প্রয়াগ ঘাটে এসে নৌকা উপস্থিত হলে চৈতন্যদেব নৌকা থেকে অবতরণ করেন এবং প্রবেশ করেন উড়িষ্যা দেশে। উড়িষ্যায় প্রবেশ করে চৈতন্যদেব 'গঙ্গাঘাট' নামক স্থানে স্নান করেন ও যুধিষ্ঠির প্রতিষ্ঠিত মহেশ-দর্শন করেন। এরপর চৈতন্যদেব উড়িষ্যার লোকালয়ে ভিক্ষা করতে বের হলে —

> ''আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
> সভেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর।। ১৫৪
> ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।
> সভেই সন্তোষ আনি দেয়েন প্রভুরে।। ১৫৫''[৪৩৯]

এভাবে, চৈতন্যদেব ভিক্ষা করে আনলে জগদানন্দ রান্না করেন এবং সকলে একসঙ্গে পরমানন্দে ভোজন করেন। পরদিন আবার সেখান থেকে নীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে রাজকর্মচারী 'দানী' চৈতন্যদেব ও ভক্তদের পথে আটকে দিয়ে কর আদায় করতে চান। প্রসঙ্গত বলতে হয় 'দানী' হল রাজকর আদায় করবার জন্য নিযুক্ত রাজকর্মচারী। দানী চৈতন্যদেবকে তাঁর সঙ্গে কতজন লোক আছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং পরং ব্রহ্ম' — বলে তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন। দানী এই তত্ত্বকথা বুঝতে না পেরে শুধুমাত্র চৈতন্যদেবকে ছেড়ে দেন এবং বৈষ্ণবভক্তদের কর আদায়ের জন্য আটকে রাখেন। পরে অবশ্য বৈষ্ণবদের কাছ থেকে চৈতন্যদেবের স্বরূপতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পেরে দানী প্রেমাবেশে লিপ্ত হয়ে ক্রন্দন করেন এবং চৈতন্য চরণ বন্দনা করেন। চৈতন্যদেব দানীর প্রতি কৃপা ভাজন হয়ে তখন প্রেমভক্তি প্রদান করেন।

এরপর সুবর্ণরেখা বা স্বর্ণরেখা নদীতীরে চৈতন্যদেব আগমন করেন এবং সেই স্থানে পরমানন্দে স্নান করেন। লক্ষণীয়, এখানে কবি পুনরায় নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। নিত্যানন্দ কীরূপে প্রেমাবেশে মত্ত হয়ে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করতেন কবি তার অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন। আবার

চৈতন্যদেবের প্রতি অত্যধিক প্রীতির কারণে নিত্যানন্দ তাঁর সন্ন্যাসের দণ্ডটি ভেঙে ফেলেন। জগদানন্দের মুখে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ কর্তৃক দণ্ড ভাঙার কথা শুনে বলেন —

''প্রভু বোলে 'সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ।। ২৩০
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, আমি বা আগ্নাই।।' ২৩১''[৪৪০]

চৈতন্যদেবের এই অভিন্ধির কথা শ্রবণ করে মুকুন্দ দত্ত তাঁকেই আগে গমন করতে বললে চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ চিত্তে সেখান থেকে প্রস্থান করেন এবং জলেশ্বর গ্রামে এসে উপস্থিত হন। সেখানে জলেশ্বর মন্দিরে শিবের পূজা দেখে চৈতন্যদেব পরমানন্দ প্রকাশ করেন এবং প্রেমাবেশে আপ্লুত হয়ে নৃত্য করতে থাকেন। চৈতন্যদেবের এই উৎফুল্ল চিত্ত দেখে বৈষ্ণবগণের পূর্বকৃত ভয় দূরীভূত হয়। তখন চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বলেন —

''কোথা তুমি আমারে করিবে সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সন্ন্যাস-রক্ষণ।। ২৫২
আরো আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর' তবে মোর মাথা খাও।। ২৫৩''[৪৪১]

এভাবে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের প্রতি সাবধানবাণী নিক্ষেপ করলেও, কবি জানিয়েছেন, নিত্যানন্দ তাঁর অধিক প্রিয় সহচর। যাই হোক, নিত্যানন্দের প্রতি চৈতন্যদেবের এই উক্তি প্রয়োগ থেকে আমরা নিত্যানন্দের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। পূর্বেও যেরূপ কবি নিত্যানন্দের চঞ্চলতা প্রকাশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন এক্ষেত্রেও তাই প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়।

এরপর চৈতন্যদেব জলেশ্বর থেকে বাঁশধায় যাওয়ার পথে সন্ন্যাসীর বেশধারী এক শাক্ততান্ত্রিক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। শাক্ততান্ত্রিক ব্যক্তিটি চৈতন্যদেবকে নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করে তাঁর মঠে যেতে অনুরোধ করেন এবং মদ্যপানের জন্য আহ্বান করেন। চৈতন্যদেব এই শাক্ততান্ত্রিক ব্যক্তিটির প্রতি প্রেমভক্তির কৃপা প্রদর্শন করে রেমুণা গ্রামে এসে উপস্থিত হন। কবি বলেছেন —

''রেমুণায় দেখি নিজ মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্তগণ সাথ।। ২৭৪''[৪৪২]

অর্থাৎ, স্বীয় গোপীনাথ কৃষ্ণের বিগ্রহ দেখে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে বিরহ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিছুদিন চৈতন্যদেব এখানে অবস্থান করে যাজপুরে এসে উপনীত হন। উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর তীরে অবস্থিত ব্রাহ্মণ প্রধান একটি নগর হল যাজপুর। এই স্থানে অবস্থিত আদিবরাহের অদ্ভুত প্রকাশিত বিগ্রহ দর্শন করে চৈতন্যদেব নাভিগয়ায় এসে উপস্থিত হন। এই নাভিগয়া থেকে নীলাচলের দূরত্ব

চল্লিশ ক্রোশ বা আশী মাইল। উল্লেখ করতে হয় যে, নাভিগয়া তীর্থস্থানটি যাজপুরেরই অন্তর্গত। কবি যাজপুর নগরের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গতই বলেছেন —

''যাজপুরে যতেক আছয়ে দেবস্থান।
লক্ষবৎসরেও নারি লৈতে সব নাম।। ২৮২
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথি স্থান।
কেবল দেবের বাস — যাজপুরগ্রাম।। ২৮৩''[৪৪৩]

এই যাজপুর মহাতীর্থের সমস্ত দেবস্থান দর্শন করে চৈতন্যদেব উড়িষ্যা রাজার রাজধানী কটক নগরে উপনীত হন। কটক নগরটি উড়িষ্যার মহানদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় চৈতন্যদেব এই নদীতে স্নান করে সাক্ষীগোপালের বিগ্রহ দর্শন করেন। সাক্ষীগোপালের বিগ্রহ দর্শন করে চৈতন্যদেব প্রেমাবেশে লিপ্ত হয়ে আনন্দ-ক্রন্দন করেন। এরপর চৈতন্যদেব উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে এসে উপস্থিত হন। ভুবনেশ্বরে শঙ্কর বা শিব অবস্থান করেন বলে এর অপর নাম গুপ্তকাশী। এই গুপ্তকাশীর শঙ্কর মন্দিরের পাশে অবস্থিত 'বিন্দুসরোবর' নামক প্রকাণ্ড কুণ্ডে স্নান করে চৈতন্যদেব জাগ্রত শিব-বিগ্রহ দর্শন করেন। এরপর কবি গুপ্তকাশীতে শঙ্করের অবস্থানের কারণ সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনির বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন —

''সেই স্থান শিব পাইলেন যেনমতে।
সেই কথা শুন স্কন্দপুরাণের মতে।। ৩১২''[৪৪৪]

এরপর কবি স্কন্দপুরাণের পৌরাণিক কাহিনির বিস্তৃত বর্ণনা দান করে ভুবনেশ্বরে শিবের অবস্থানের কারণ উত্থাপন করেছেন এবং কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন বর্ণনা করেছেন। এভাবে কবি দীর্ঘ পৌরাণিক প্রসঙ্গের বর্ণনা দেবার পর ভুবনেশ্বরে উপস্থিত চৈতন্যদেবের শিবের সম্মুখে নৃত্যের কথা বলেছেন। ভুবনেশ্বরে শিব দর্শন ও শিবের সম্মুখে নৃত্যের প্রকাশ করে চৈতন্যদেব উড়িষ্যার পুরীজেলার কাছে কমলপুর গ্রামে এসে উপনীত হন। এই কমলপুর গ্রাম থেকে নীলাচলের দূরত্ব তিন ক্রোশ বা ছয় মাইল। সুতরাং, এই কমলপুর গ্রাম থেকেই জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা দেখতে পেয়ে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে লিপ্ত হন। কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন করতে করতে চৈতন্যদেব নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে আঠারনালার কাছে এসে উপস্থিত হন। আঠারনালার কাছে উপস্থিত হয়ে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবভক্তদের প্রতি বিনয় প্রকাশ করে বলেন —

''তোমার ত আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ।। ৪১৭
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে, তাহা বোল মোরে।। ৪১৮''[৪৪৫]

চৈতন্যদেবের এই উক্তি শ্রবণ করে মুকুন্দ দত্ত তাঁকেই আগে জগন্নাথ বিগ্রহ পরিদর্শন করতে বলেন। বৈষ্ণব ভক্তদের এই ইচ্ছার কথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব একাকী জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং জগন্নাথ বিগ্রহ পরিদর্শনে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মূর্ছা যান। শুধু তাই নয়, প্রেমাবেশে চৈতন্যদেব জগন্নাথ বিগ্রহকে কোলে করতে উদ্যত হলে মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কেরা তাঁকে মারতে সচেষ্ট হন। জগন্নাথ মন্দিরে উপস্থিত সার্বভোম ভট্টাচার্য তখন চৈতন্যদেবের প্রেমাবেশ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তত্ত্বাবধায়কদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন। চৈতন্যদেবের অনুচর সপার্ষদ ভক্তেরাও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে এসে উপস্থিত হন এবং পরে জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন করতে যান। কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে সার্বভৌমের গৃহে তিন প্রহর মূর্ছিত থাকার পর চৈতন্যদেব নিজ চেতনা ফিরে পান এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের কারণে পরমানন্দ প্রকাশ করেন। লক্ষণীয়, এই সময় চৈতন্যদেব ভক্তদের প্রতি নিজ অভিসন্ধির কথা প্রকাশ করে বলেন —

> ''আজি হৈতে আমি এই বলি দঢ়াইয়া।
> জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া।। ৪৮৩
> অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
> গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব।। ৪৮৪'' [৪৪৬]

এভাবে সপার্ষদ বৈষ্ণবভক্তদের কাছে নিজ অভিসন্ধির কথা প্রকাশ করে চৈতন্যদেব সার্বভৌম গৃহে পরমানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করেন।

'অন্ত্যখণ্ড'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের তাত্ত্বিক কথোপকথনের বর্ণনা দিয়ে কবি কাহিনির সূচনা করেছেন। চৈতন্যদেব বলেছেন নীলাচলে তাঁর আসার আসল উদ্দেশ্যই হল সার্বভৌমের সঙ্গে সাক্ষাৎ গ্রহণ। কী উপায়ে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি লাভ করা যায় এবং সংসার-বন্ধন ছিন্ন করা যায় — এই বিষয়ে চৈতন্যদেব সার্বভৌমের কাছে জানতে চান। সার্বভৌম চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির উদয় দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হলেও তাঁকে প্রশ্ন করেন —

> ''পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
> তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে।। ২৩''[৪৪৭]

অর্থাৎ, প্রেমভক্তি লাভের ভজনের ক্ষেত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ যে অনাবশ্যক এবং নিতান্ত প্রতিকূল — এ কথাই ব্যক্ত করেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। শুধু তাই নয়, সন্ন্যাস গ্রহণের অনাবশ্যকতা ও অপকারিতার কথাও বর্ণনা করেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। কারণ হিসাবে তিনি বলেন — সন্ন্যাসীমাত্রই সন্ন্যাস গ্রহণের পর থেকে অহঙ্কারী হয়ে পড়েন। সন্ন্যাসী অপর সন্ন্যাসী ব্যতীত কাউকেই নমস্কার করেন না। কিন্তু সকলের কাছ থেকে নিজে নমস্কার গ্রহণ করেন। অথচ শাস্ত্রে বলা হয়েছে — অন্তর্যামি পরমাত্মারূপে সকল জীবের মধ্যেই ভগবান বিরাজিত। এছাড়া সন্ন্যাসী মাত্রই নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর 'নারায়ণ' মনে

করেন। কিন্তু একমাত্র জগতের ঈশ্বর হলেন ‘কৃষ্ণ’। এ কারণে শাস্ত্রে বলা হয়েছে — নিষ্কাম হয়ে কৃষ্ণভজনই হল ‘যোগী’ বা ‘সন্ন্যাসী’র লক্ষণ। এভাবে সার্বভৌম বৈষ্ণবধর্মের গূঢ় রহস্যের তত্ত্বকথা প্রকাশ করেন চৈতন্যদেবের কাছে। পাশাপাশি শঙ্করাচার্যের অভিমত বৈষ্ণবদের কাছে গ্রহণীয় না হবার যুক্তিসঙ্গত কারণও ব্যাখ্যা করেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তত্ত্ববিচারে অভেদ সত্ত্বেও জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে — বৈষ্ণবদের এই ধারণাই ব্যাখ্যা করেছেন সার্বভৌম। আর এই তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা গ্রহণ না করে যে শঙ্করাচার্যের অভিমত অনুসারে সন্ন্যাসী হন সে সাধন-ভজনের পক্ষে অনাবশ্যক হয়ে পড়েন। সুতরাং, সার্বভৌম ভট্টাচার্য শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে জানান— সাধন ভজনের ক্ষেত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ অপরিহার্য নয়। প্রেমভক্তিই হল ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায়।

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের এই গূঢ় তত্ত্বকথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব নিজেকে সন্ন্যাসী না ভাবতে বলেন। কৃষ্ণ বিরহের উদয়ের কারণেই তাঁর এই সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ বলে সার্বভৌমের কাছে তিনি জানান। যেহেতু কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণেই চৈতন্যদেবের এই গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস বেশ ধারণ তাই সার্বভৌমকে তিনি ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য কৃপা করতে বলেন। শুধু তাই নয়, সর্বতোভাবে চৈতন্যদেব সার্বভৌমের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছে ভাগবতের শ্লোকের অর্থ অধ্যয়ন করতে চান। সার্বভৌম তখন ‘শ্রীমদ্‌ভাগবত’-এর ‘আত্মারাম’ শ্লোকটির অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেন —

> ‘‘সার্ব্বভৌম বোলেন ‘শ্লোকার্থ এই সত্য।
> কৃষ্ণপদভক্তি সে সভার মূল তত্ত্ব।।’ ৮৩’’[৪৪৮]

অর্থাৎ, কৃষ্ণচরণে ভক্তিই যে সর্বজীবের তথা সকল শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব — একথা ব্যাখ্যা করেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। এভাবে সার্বভৌম ভাগবতের শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করেন এবং নিজেই তা খণ্ডন করে পুনরায় নব ব্যাখ্যা দান করেন। কিন্তু শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা যে আরো হতে পারে চৈতন্যদেব তা নবব্যাখ্যার দ্বারা সার্বভৌমকে জানান। সার্বভৌম চৈতন্যদেবের এই অতিরিক্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করে পরমাশ্চর্য হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেব তখন ঈশ্বর ভাবে আবিষ্ট হয়ে ষড়্‌ভুজ-রূপে প্রকটিত হন এবং কলিযুগে অবতরণের কারণ ব্যাখ্যা করেন। হরিনাম সঙ্কীর্তনের প্রচার এবং দুষ্টের দমন ও সাধুর পরিত্রাণের জন্যই যে চৈতন্যদেব কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছেন — একথা সার্বভৌমের কাছে প্রকাশ করেন। সার্বভৌম চৈতন্যদেবের ষড়্‌ভুজ রূপ প্রদর্শন করে মূর্ছিত হন এবং পরে চেতনা পেয়ে পরমানন্দে ও প্রেমময় আবেশে চৈতন্যদেবের পাদপদ্ম হৃদয়ে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করেন। এভাবে সার্বভৌম চৈতন্যদেবের স্বরূপতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে স্তব-স্তুতি করতে শুরু করেন। সার্বভৌম কর্তৃক দীর্ঘ স্তব-স্তুতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে চৈতন্যদেব তাঁর প্রতি কৃপা বর্ষণ করেন।

এভাবে চৈতন্যদেব সার্বভৌমের কাছে নিজ স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করে হরিনাম সঙ্কীর্তনের মধ্য দিয়ে প্রেমাবেশে নীলাচলে অবস্থান করেন। এই সময় চৈতন্যদেবের মধ্যে অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেমভক্তির প্রকাশ

দেখে নীলাচলের সকলেই তাঁকে 'সচল জগন্নাথ' বলে মনে করেন। নীলাচলে অবস্থান কালেই চৈতন্যদেবের সঙ্গে আবার পরমানন্দপুরীর সাক্ষাৎ ঘটে। পরমানন্দপুরী ছিলেন চৈতন্যদেবের পরমগুরু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। সুতরাং সতীর্থ পরমাননদপুরীকে কাছে পেয়ে চৈতন্যদেব নিজ পার্ষদ করে নেন। তবে শুধু পরমানন্দপুরীই নন, দামোদর স্বরূপের সঙ্গেও চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই স্বরূপ দামোদর ছিলেন চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলার অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত পুরুষোত্তম আচার্য। বারাণসীতে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি স্বরূপ দামোদর নামে পরিচিত হন। কবি আরো জানিয়েছেন, উৎকল তথা উড়িষ্যার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ ঘটলে হরিনাম সঙ্কীর্তনের প্রেমাবেশে সকলে লিপ্ত হন।

এরপর কবি নিত্যানন্দ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন। নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করে বলরামের বিগ্রহে আলিঙ্গন করতে গেলে তত্ত্ববধায়কেরা তাঁর হাত ধরে বিরত করেন। কিন্তু নিত্যানন্দ নিজ অপার শক্তি দ্বারা সকল তত্ত্বাবধায়কদের দূরে সরিয়ে বলরামের বিগ্রহের গলার মালা নিজে ধারণ করেন। এরপর থেকে তত্ত্বাবধায়কেরা নিত্যানন্দকে দেখলেই তাঁর প্রতি বিনয় প্রকাশ করেন। কবির এই বর্ণনা দেখে মনে হয়, নিজ গুরুদেব নিত্যানন্দের প্রতি তিনি এক্ষেত্রে প্রশস্তিমূলক উক্তি প্রয়োগ করেছেন।

এভাবে নিত্যানন্দের প্রতি মাহাত্ম্য কীর্তন করবার পর কবি পুনরায় চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন —

> ''তবে কথোদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
> সমুদ্রকূলেতে আসি করিলা বসতি।। ১৯৪''[৪৪৯]

অর্থাৎ, নীলাচলের সমুদ্রতীরে চৈতন্যদেব বসবাস করতে শুরু করেন এবং সমুদ্রতীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সকল ভক্তগণ সহ সারারাত্রি হরিনাম সঙ্কীর্তনের মধ্য দিয়ে প্রেমভক্তি বিকারের প্রকাশ করেন। প্রেমভক্তি রসে আবিষ্ট হয়ে নীলাচলে হরিনাম করবার সময় চৈতন্যদেবের সঙ্গে যে গদাধর থাকতেন নিরবধি এই কথা জানাতে কবি বলেছেন —

> ''নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
> প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি।। ২১৯
> কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
> গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে।। ২২০''[৪৫০]

এরপর চৈতন্যদেবের প্রভাবে পরমানন্দ পুরীর কর্দমময় জলপূর্ণ কূপে গঙ্গার নির্মল জল প্রবেশের কাহিনি কবি বর্ণনা করেন। পরমানন্দ পুরীর কর্দমাক্ত কূপে গঙ্গার জল প্রবেশ করিয়ে চৈতন্যদেব বলেন —

> ''প্রভু বোলে 'শুনহ সকল ভক্তগণ।

এ কূপের জলে কৈলে স্নান বা ভক্ষণ।। ২৪২

সত্যসত্য হৈব তার গঙ্গাস্নানফল।

কৃষ্ণে ভক্তি হৈব তার পরম নির্ম্মল।।' ২৪৩”[৪৫১]

এভাবে, চৈতন্যদেব পরমানন্দ পুরী ও নীলাচলের সকল ভক্তগণের কাছে নিজ মহিমা প্রকাশ করে সমুদ্র তীরে এসে পরমানন্দে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন। নীলাচলে সমুদ্রে সৌন্দর্য্যে ও রূপ-মাধুর্যে মুগ্ধ চৈতন্যদেব এই সময় সমুদ্রতীরে বাস করতেন বলে কবি জানিয়েছেন। আবার চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে আসেন, তখন রাজা প্রতাপ রুদ্র উৎকল তথা উড়িষ্যায় ছিলেন না। যুদ্ধের কাজে তিনি তখন উৎকলের বাইরে বিজয় নগরে ছিলেন। এ জন্য প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের দর্শন পান নি। চৈতন্যদেব এভাবে নীলাচলে কিছুদিন অবস্থান করার পর পুনরায় গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তন করেন বলে কবি জানিয়েছেন। গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তন করে চৈতন্যদেব সার্বভৌমের ভাই বিদ্যা বাচস্পতির কাছে আতিথ্য গ্রহণ করেন। অবশ্য লক্ষণীয়, চৈতন্যদেব গৌড়দেশে এসেছিলেন তাঁর অনুচর সকল পার্ষদবৃন্দের সঙ্গে। এভাবে বিদ্যা বাচস্পতির গৃহে অবস্থান কালেই চৈতন্যদেবের গৌড়ে অবস্থানের কথা প্রচারিত হয়ে যায় নবদ্বীপে। নবদ্বীপের সকলেই তখন চৈতন্যদেবকে দর্শনের জন্য বাচস্পতির গৃহের উদ্দেশ্যে গমন করেন। অর্থাৎ, চৈতন্যদেব যে স্বয়ং ভগবান একথা সেই সময় প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ লাভের পর সকল নবদ্বীপবাসী কৃষ্ণপ্রেমানন্দে হরিধ্বনি করেন এবং তাঁর স্তব কীর্তন করেন। অসংখ্য ‘লক্ষকোটি’ লোকের সঙ্গে বাচস্পতির গৃহে সাক্ষাতের পর চৈতন্যদেব সকলকে কৃষ্ণ অনুরাগী হবার প্রেমভক্তি প্রদান করে সকলের অগোচরে কুলিয়াগ্রামে গমন করেন। এমনকি, বাচস্পতিও চৈতন্যদেবের গমনের কথা জানতে পারেন নি। পরে কুলিয়ানগরে চৈতন্যদেবের অবস্থানের কথা শ্রবণ করে সকল লোকের সঙ্গে বাচস্পতিও সেই দিকেই গমন করেন। কুলিয়ানগরে এসে বাচস্পতি ও সকল ভক্তবৃন্দ চৈতন্যদেবের পুনরায় সাক্ষাৎ লাভ করে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হয়ে পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

এভাবে চৈতন্যদেব কুলিয়ানগরে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে মত্ত হয়ে হরিনামে নৃত্য করবার সময় এক ব্রাহ্মণ ভক্তির নিন্দারূপ পাপ স্কলনের জন্য আত্ম-অনুশোচনায় চৈতন্যদেবের শরণ গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব সেই ব্রাহ্মণের পাপ স্কালনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্যবস্থা দান করে বলেন —

“কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।

নিন্দা-বিষ-যত সব করিব সংহার।। ৪৪৬”[৪৫২]

অর্থাৎ, সেই ব্রাহ্মণকে চৈতন্যদেব কৃষ্ণের মহিমাদি স্তব-কীর্তন করতে ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের ভজনা করতে পরামর্শ দেন। শুধু এই ব্রাহ্মণকেই নয়, সকল বৈষ্ণব নিন্দকদের প্রতি চৈতন্যদেব এই উপায়ে প্রায়শ্চিত্ত বিধানের ব্যবস্থা দান করেন। ব্রাহ্মণের কৃত পাপের প্রতি প্রায়শ্চিত্ত বিধানের তত্ত্ব

উপদেশ বর্ণিত করবার সময় দেবানন্দ পণ্ডিত সেখানে প্রবেশ করেন। দেবানন্দ পণ্ডিতও চৈতন্যদেবের স্বরূপ তত্ত্বে তথা ভগবত্তায় পূর্বে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু চৈতন্যদেব নবদ্বীপ থেকে গমন করার পর তাঁর সঙ্গে পরম বৈষ্ণব বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সাক্ষাৎ ঘটে। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মত পরম বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভের ফলেই দেবানন্দ পণ্ডিতের চৈতন্যদেবের ভগবত্তায় বিশ্বাস জন্মে। অর্থাৎ, কবি দেবানন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শাস্ত্রের মতানুসারে বলতে চেয়েছেন —

> ''কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
> ভাগবত আদি সর্ব্বশাস্ত্রে কৈল দঢ়।। ৪৭৬''[৪৫৩]

সুতরাং, বৈষ্ণবসেবা বা ভক্তসেবার দ্বারাই যে কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি লাভ হতে পারে — এই তথ্যই কবি দেবানন্দ পণ্ডিতের কাহিনির দ্বারা বর্ণিত করেছেন। এরপর দেবানন্দ পণ্ডিত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চৈতন্যদেবের স্তব কীর্তন করেন এবং কি উপায়ে ভাগবতের অধ্যয়ন করা উচিত তা জানতে চান। চৈতন্যদেব তখন দেবানন্দকে 'শ্রীমদভাগবত'-এর গূঢ় তত্ত্ব কথা বর্ণনা করে ভক্তিমূলক দৃষ্টিতেই যে ভাগবতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করা উচিত তা ব্যাখ্যা করে বলেন —

> '' 'ভক্তিযোগ' মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।
> আদ্য-মধ্য-অন্ত্যে কভু না বুঝায়ে আন।। ৫১৭
> না বাখানে, ভক্তি, ভাগবত যে পঢ়ায়।
> ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায়।। ৫১৮''[৪৫৪]

এভাবে 'শ্রীমদ্‌ভাগবত'-এর গূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশ করে এবং ভাগবতের মহিমা কীর্তন করে চৈতন্যদেব আসলে সকল জীবকেই ভক্তিলাভের উপায় বর্ণনা দানের মধ্য দিয়ে কুলিয়াগ্রামে নিজ ভগবত স্বরূপের প্রকাশ করেন।

'অন্ত্যখণ্ড'-এর চতুর্থ অধ্যায়ে কবি চৈতন্যদেবের কুলিয়া নগর থেকে মথুরা যাবার পথে গৌড়ের গঙ্গাতীরবর্তী 'রামকেলি'-তে অবস্থানের কাহিনি বর্ণনা করে বলেছেন —

> ''গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
> ব্রাহ্মণসমাজ — তার 'রামকেলি' নাম।। ৫
> দিন-চারি-পাঁচ প্রভু সেই পুন্যস্থানে।
> আসিয়া রহিলা যেন কেহো নাহি জানে।। ৬''[৪৫৫]

অর্থাৎ, গৌড়েশ্বরের রাজধানীর নিকটবর্তী ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম ছিল 'রামকেলি'। বর্তমানে মালদা জেলায় এই গ্রামটির অবস্থান। এই গ্রামেই চৈতন্যদেব চার-পাঁচদিন অবস্থান করেন এবং অসংখ্য লোকের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন। লক্ষণীয়, কবি চৈতন্যদেবের রামকেলিতে অবস্থান কালে হরিনাম সঙ্কীর্তনের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন —

''নিকটে যবনরাজা — পরম দুর্ব্বার।

তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার।। ২২''[৪৫৬]

অর্থাৎ, অতি পরাক্রান্ত দুর্দমণীয় যবনরাজ যে রামকেলির সন্নিকটেই অবস্থান করতেন তা বুঝতে পারি। আবার এই যবনরাজের দ্বারা উৎপাত-উৎপীড়নের সম্ভাবনা থাকলেও চৈতন্যদেবের কারণে কারও চিত্তেই কোনরূপ ভয়ের সঞ্চার হয় নি। রামকেলিতে অবস্থান করে এভাবে চৈতন্যদেবের হরিনাম সঙ্কীর্তন করবার কথা নগররক্ষক 'কোটোয়াল' যবন রাজার কাছে প্রকাশ করেন। কোটোয়ালের কাছে তখন যবনরাজা চৈতন্যদেবের পরিচয় জানতে চান। কোটোয়াল তখন যবনরাজের কাছে চৈতন্যদেবের রূপগুণের সৌন্দর্যময় বর্ণনা দিয়েছেন এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নিরন্তর হরিনাম সঙ্কীর্তনের কথা বলেন। কোটোয়ালের মুখে চৈতন্যদেবের অদ্ভুত রূপ ও প্রেমবিকারের কথা শ্রবণ করে গৌড়েশ্বর যবনরাজ অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং চৈতন্যদেব সম্পর্কিত সঠিক তথ্য কেশবখান নাম গুপ্তচরের কাছে জানতে চান। এরপর যবনরাজ ঈশ্বরের প্রতি তীব্র আস্তিকতা প্রকাশ করে বলেন —

''হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ', 'খোদায়' যবনে।

সেই তিঁহো, নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে।। ৫৫''[৪৫৭]

অর্থাৎ, যবনরাজের এই উক্তি থেকে আমরা তাঁর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের যেমন পরিচয় পাই তেমনি তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি। যবনরাজ তাই তাঁর রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি আদেশ করেন চৈতন্যদেবের কোনপ্রকার বিঘ্ন যাতে না ঘটে তা দেখবার জন্য। অর্থাৎ কবি এখানে যবনরাজের পরধর্মসহিষ্ণুতার যেমন পরিচয় দিয়েছেন তেমনি উন্মুক্ত উদার মানসিকতারও পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এর পরেই কবি আবার গৌড়েশ্বর যবনরাজ হুসেনশাহের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

''যে হুসেন-সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।

দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে।। ৬৭

হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।

তথাপিহ এবে না মানয়ে যত অন্ধ।। ৬৮''[৪৫৮]

অর্থাৎ, কবি এখানে যবনরাজ হুসেন শাহের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। যবনরাজা হিন্দুদের দেবমূর্তি ভেঙেই কেবল যে ক্ষান্ত হন নি, দেবালয় পর্যন্ত ভেঙেছিলেন — এই ইতিহাসের সত্য তথ্যটি কবি এখানে বর্ণিত করেছেন। অবশ্য কবি বলতে চেয়েছেন, এত অত্যাচারী যবনরাজও চৈতন্যদেবের মহানুভবতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যবনরাজের এই হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাবের আশঙ্কা করে চৈতন্যদেবের সুজনেরা রামকেলি থেকে তাঁকে চলে যাবার নিবেদন জানানোর জন্য এক জনৈক ব্রাহ্মণকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবকে নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমানন্দে হরিনাম করতে দেখে জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে কিছুই প্রকাশ করতে না পেরে চৈতন্যভক্তদের কাছে নিবেদন

জ্ঞাপন করেন —

" 'রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া।'

এই কথা সভে টাঠাইলেন কহিয়া।। ৯৩"[৪৫৯]

জনৈক ব্রাহ্মণের কাছে এই কথা শ্রবণ করে চৈতন্য ভক্তবৃন্দেরা চিন্তিত হলে চৈতন্যদেব তাঁদের ভয় দূরীভূত করবার জন্য প্রবোধ দান করেন এবং নিজ স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করে জানান প্রেমভক্তি বিতরণের উদ্দেশ্যেই ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করবার জন্যেই তিনি কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছেন। চৈতন্যদেবের কাছ থেকে নিজ স্বরূপ তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে উপস্থিত সকল বৈষ্ণব ভক্তেরাই তখন পরমানন্দে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এরপর কবি জানিয়েছেন, চৈতন্যদেব মথুরা যাবার উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে এলেও তিনি আর মথুরায় গমন করতে চান না। রামকেলি থেকে পুনরায় নীলাচলে ফিরে যাবার ইচ্ছাতেই গঙ্গাতীরের পথে চলতে চলতে তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে এসে উপস্থিত হন। অদ্বৈতাচার্য তখন স্বীয় পুত্র অচ্যুতানন্দের মহিমা দর্শন করে আবিষ্ট হয়েছিলেন। কবি এক্ষেত্রে পাঁচ বছরের শিশু অচ্যুতানন্দের ভগবৎ বিষয়ে পারমার্থিক জ্ঞানের সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। এমন সময় চৈতন্যদেবকে সপার্ষদে উপস্থিত হতে দেখে অদ্বৈতাচার্য পরমানন্দে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েন এবং প্রেমাশ্রুতে চৈতন্যদেবের পাদপদ্ম বক্ষে জড়িয়ে ধরেন। এরপর চৈতন্যদেব অদ্বৈত গৃহে সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ সহ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন। চৈতন্যদেব অদ্বৈত গৃহে অবস্থান কালেই শচীমাতাকে আনবার জন্য শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে লোককে প্রেরিত করেন অদ্বৈতাচার্য। কিন্তু শচীদেবী পুত্র বিরহে বেদনাদীর্ণ হৃদয়ে যশোদামাতার ভাবে বাৎসল্যপ্রেমরস সমুদ্রে বিভোর হয়ে থাকতেন বলে কবি জানিয়েছেন। কৃষ্ণপ্রেমাবেশে শচীদেবী যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে মুহ্যমান, এমন সময় শান্তিপুরে চৈতন্যদেবের অবস্থানের শুভবার্তা শ্রবণ করেন তিনি। শুধু শচীদেবীই নন, চৈতন্যদেবের শান্তিপুরে অবস্থানের কথা শ্রবণ করে সকল নবদ্বীপবাসীই পরমানন্দে শান্তিপুরের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এরপর শচীদেবী গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে শান্তিপুরে এসে উপনীত হলে চৈতন্যদেব শাস্ত্রের শ্লোকানুযায়ী মাতার স্তব-স্তুতি করেন। চৈতন্যদেবকে দেখতে পেয়েও শচীমাতা বিরহের দুঃখ-জ্বালা ভুলে গিয়ে পরমানন্দে লিপ্ত হন এবং নিজ হস্তে বহুপ্রকার অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করেন। শচীমাতার রান্না করা অন্নব্যঞ্জন চৈতন্যদেব তখন সকল পার্ষদসহ পরমানন্দে ভোজন করেন।

এভাবে চৈতন্যদেব অদ্বৈতগৃহে পরমানন্দে ভোজন করে আচমন করতে উঠে গেলে সকল বৈষ্ণবভক্তেরাই তখন তাঁর অবশিষ্ট অধরামৃত ভোজন করতে চান। আসলে কবি বলতে চেয়েছেন — চৈতন্যদেবের অধরামৃত ভোজনেও বিষ্ণুভক্তির উদয় হয়। এরপর চৈতন্যদেবের আদেশে তাঁর কাছে মুরারি গুপ্ত স্বরচিত 'রামাষ্টক' পাঠ করেন। মুরারি গুপ্তের স্বরচিত রামমহিমা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব

তাঁর স্বীয় পাদপদ্ম মুরারি গুপ্তের মস্তকে অর্পণ করেন এবং তাঁকে জন্মে জন্মে 'রামদাস' হবার আশীর্বাদ দান করেন। এমন সময় বৈষ্ণব নিন্দুক এক কুষ্ঠরোগী চৈতন্যদেবের কাছে আগমন করেন এবং নিজের অসুখের কথা জানিয়ে আর্তনাদ করে আর্তি প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেব তখন তাকে বৈষ্ণব নিন্দা করবার জন্য ভর্ৎসনা করেন এবং শাস্ত্র অনুসারে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। এরপর কুষ্ঠরোগী চৈতন্যদেবের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করলে তিনি বলেন—

> ''চল কুষ্ঠরোগি! তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
> সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে।। ৩৭৫
> তাঁর ঠাঁই তুমি করিয়াছ অপরাধ।
> নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ।। ৩৭৬'' [৪৬০]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব বলেন কুষ্ঠরোগী যেহেতু শ্রীবাসের কাছে অপরাধ করেছেন তাই তিনিই অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন, অন্য কেউ কুষ্ঠরোগীর অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। চৈতন্যদেবের কাছে এই কথা শ্রবণ করে কুষ্ঠরোগী তখন শ্রীবাসের কাছে নিজ অপরাধের কথা স্বীকার করে রোগমুক্তি লাভ করেন। অবশ্য লক্ষণীয়, কবি এরপর বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য ও বৈষ্ণবের প্রতি নিন্দার কুফল বর্ণনা করতে গিয়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর গালাগালি বা কলহকে বাস্তবিক কলহ না বলে প্রেম কলহ বলেছেন। আর তাই সাধারণের প্রতি কবি পরামর্শ দান করে বলেছেন —

> ''ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
> আর বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয়।। ৩৮৮''[৪৬১]

সুতরাং, কবির দেওয়া এই বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটি প্রণয়নকালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আবার এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় অপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি যে গালমন্দ করত তাও কবি ইঙ্গিতে আভাষিত করতে চেয়েছেন বলেই মনে হয়। তবে, কবি বৈষ্ণবদের অভেদ দৃষ্টিতে ভজনা করবারই পরামর্শ দান করেন।

এরপর কবি শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে চৈতন্যদেবের অবস্থানকালেই মাধবেন্দ্র পুরীর আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। মাধবেন্দ্র পুরী ও অদ্বৈতাচার্যের মধ্যে পারমার্থিক বিচারে কোন প্রভেদ না থাকলেও অদ্বৈতাচার্য মাধবেন্দ্র পুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে তাঁর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেছিলেন কেন, কবি তার অণুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা দান করেছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবেরা পূর্বেই মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পরমানন্দে হরিনাম সঙ্কীর্তন করতেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে তৎকালীন নবদ্বীপের সামাজিক চিত্রের কবি পুনর্বার পরিচয় দান করেছেন এখানে। কবি বলেছেন ভক্তিশূন্য নবদ্বীপ সমাজে তখন কেউ কৃষ্ণের মহিমাদি কীর্তন করতেন না। অর্থাৎ, পারমার্থিক ঈশ্বর চিন্তা না করে সকলেই ইহলৌকিক সুখের জন্য দেবতার পূজা করতেন। কবি তাই বলেছেন —

"ধর্ম্ম কর্ম্ম' লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।। ৪০৯
দেবতা জানেন সব 'ষষ্ঠী বিষহরি'।
তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি।। ৪১০
'ধন বংশ বাঢ়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে।। ৪১১
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোক আনন্দিত।। ৪১২"[৪৬২]

সুতরাং, কৃষ্ণনাম বা হরিনাম শূন্য এরূপ জগৎ সংসার দেখে মাধবেন্দ্র পুরী বড় দুঃখিত হন এবং ব্যথিত হয়ে বনে গিয়ে বাস করবার বাসনা প্রকাশ করেন। মাধবেন্দ্র পুরী সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প যখন করছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে অদ্বৈতাচার্যের সাক্ষাৎ ঘটে। অদ্বৈতাচার্য মাধবেন্দ্র পুরীর কৃষ্ণপ্রেমাবেশ এবং বিষ্ণুভক্তির উদয় দেখে তাঁর কাছে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণবভক্ত সমাজে গুরুদেবের আবির্ভাব এবং তিরোভাব উৎসব পালনের রীতি বহু প্রচলিত প্রাচীন প্রথা হিসাবেই পরিচিত। মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোভাবের উৎসব তিথিতে সৌভাগ্যক্রমে চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের গৃহেই অবস্থান করেছিলেন বলে কবি জানিয়েছেন। আর তাই সেইদিন অদ্বৈতাচার্যের গৃহে মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোভাব তিথি উপলক্ষে মহামহোৎসবের আয়োজন করা হয়। অদ্বৈতাচার্যের গৃহে মহোৎসব উপলক্ষে বিস্তর আয়োজন দেখে চৈতন্যদেব 'অদ্বৈত-তত্ত্ব' প্রকাশ করে বলেন —

"মনুষ্যেরো এমত কি সম্পত্তি সম্ভবে'।
এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে' মহাদেবে।। ৪৬৭
বুঝিলাঙ আচার্য্য মহেশ অবতার।
এইমত হাসি প্রভু বোলে বারবার।। ৪৬৮"[৪৬৩]

এভাবে চৈতন্যদেব কর্তৃক 'অদ্বৈত-তত্ত্ব' প্রকাশের পর কবি শিবের দীর্ঘ মহিমা বর্ণনা করেন। শিবের মহিমাদি তত্ত্ব কথা প্রকাশ করবার পর কবি পুনর্বার জানিয়েছেন, অদ্বৈত গৃহে মহোৎসব উপলক্ষে হরিনাম সঙ্কীর্তনে নৃত্যের মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেব ও সকল বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের আনন্দ প্রকাশের কথা। হরিনাম সঙ্কীর্তনে মহানৃত্য প্রকাশের পর চৈতন্যদেব ও সকলভক্তবৃন্দ পরমানন্দে অদ্বৈতাচার্য গৃহে ভোজন করেন। এভাবে কবি অদ্বৈতাচার্য গৃহে মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোভাব উপলক্ষে মহামহোৎসবের অণুপুঙ্ক্ষ বিবরণ দিয়ে এই 'অন্ত্যখণ্ড'-এর চতুর্থ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি দান করেছেন।

'অন্ত্যখণ্ড'-এর পঞ্চম অধ্যায়ের সূচনাতে কবি আবার চৈতন্যদেবের শান্তিপুর থেকে কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহে আগমনের কাহিনি উত্থাপন করে বলেছেন —

"কথোদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট — শ্রীবাসমন্দিরে।। ৫"[৪৬৪]

কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে চৈতন্যদেবের আগমনের পর কৃষ্ণপ্রেমাবেশে সকলেই হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হয়ে পরমানন্দ প্রকাশ করেন। এভাবে চৈতন্যদেবের কুমারহট্টে আগমনে শ্রীবাস পণ্ডিত নিজেকে মহাভাগ্যবান বলে মনে করেন এবং প্রেমাশ্রুতে লিপ্ত হয়ে চৈতন্যচরণ বন্দনা করেন। কুমারহট্টে চৈতন্যদেবের আগমনের সংবাদ শ্রবণ করে আবার পুরন্দর আচার্য, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্ত প্রমুখ বৈষ্ণবগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত গ্রহণ করতে আসেন। চৈতন্যদেব তখন বাসুদেব দত্তের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করেন। এককথায় বাসুদেব দত্ত ছিলেন চৈতন্যদেবের পরম প্রিয় ব্যক্তি এবং সর্ব তত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ বৈষ্ণব পণ্ডিত। এরপর, চৈতন্যদেব শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে সাংসারিক বিষয় সম্পর্কে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তাঁর গৃহে যে কখনও দারিদ্র্য প্রবেশ করবে না — এরূপ অভিমত প্রকাশ করে বলেন —

"যদি কদাচিত বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র নহিব তোর ঘরে।। ৫৪"[৪৬৫]

শুধু তাই নয়, অদ্বৈত ও শ্রীবাসের প্রতি চৈতন্যদেব বার্ধক্যের গ্লানিমুক্ত জীবনেরও আশীর্বাদ দান করে বলেন —

"অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
'জরাগ্রস্থ নহিব দোঁহার কলেবর'।। ৬৪"[৪৬৬]

এরপর চৈতন্যদেব শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাই রামাই পণ্ডিতকে উপদেশ দান করে বলেন — জ্যেষ্ঠভাই শ্রীবাসকে ঈশ্বর জ্ঞানে সর্বদা পূজা করতে। এভাবে চৈতন্যদেব শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে কিছুদিন কৃষ্ণপ্রেমাবেশে অবস্থান করবার পর কুমারহট্ট থেকে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আগমন করেন। রাঘব পণ্ডিত চৈতন্যদেবকে দর্শন করে পরমানন্দে চৈতন্যচরণ বন্দনা করে কাঁদতে থাকেন এবং প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন চৈতন্যদেব রাঘব পণ্ডিতকে রন্ধন করবার পরামর্শ দিলে তিনি নিজ চিত্তের অভিলাস অনুসারে অপার ব্যঞ্জনাদি রান্না করেন এবং চৈতন্যদেবকে ভোজন করতে দেন। চৈতন্যদেব রাঘব পণ্ডিতের অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধনাদি ভোজন করে ঐকান্তিক প্রশংসা করে বলেন —

"প্রভু বোলে, 'রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক।।' ৮৮"[৪৬৭]

এরপর, রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে চৈতন্যদেবের অবস্থানের সংবাদ পেয়ে গদাধর দাস তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন বলে কবি জানিয়েছেন। শুধু গদাধর দাসই নয়, চৈতন্যদেবের পানিহাটি আগমনের

সংবাদ পেয়ে পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, রঘুনাথ বৈদ্য প্রভৃতি সকল পণ্ডিত বৈষ্ণবেরাই তাঁর সঙ্গে পরমানন্দে সাক্ষাৎ করতে আসেন। এরপর চৈতন্যদেব রাঘব পণ্ডিতের কাছে 'নিত্যানন্দ তত্ত্ব' প্রকাশ করেন। আসলে তাঁদের মধ্যে যে কোন প্রভেদ নেই, এই গূঢ় তত্ত্বকথাই তিনি প্রকাশ করেন রাঘব পণ্ডিতের কাছে। এভাবে গূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশ করে এবং হরিনাম সঙ্কীর্তনের মধ্য দিয়ে পরমানন্দে কিছুদিন পানিহাটিতে অবস্থানের পর চৈতন্যদেব বরাহনগরে এসে উপনীত হন। বরাহনগরে চৈতন্যদেব এক ব্রাহ্মণের ঘরে এসে উপস্থিত হন। এই ব্রাহ্মণ ছিলেন ভাগবতের সুশিক্ষিত পণ্ডিত। তিনি ভক্তিবিগলিত দৃষ্টিতে ভাগবতের অর্থ বিশ্লেষণ করতেন। তাঁর কাছে ভাগবতের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে আনন্দে নৃত্য করেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ প্রদান করে বলেন —

> ''প্রভু বোলে 'ভাগবত এমন পঢ়িতে।
> কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে।। ১১৮
> এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য্য'।
> ইহা বই আর কোন না করিহ কার্য্য।।' ১১৯'' [৪৬৮]

এভাবে চৈতন্যদেব গঙ্গার তীরে পরিভ্রমণ করে এবং সকল ভক্তের গৃহেই অবস্থান করে অবশেষে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। নীলাচলে চৈতন্যদেব পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলে সার্বভৌম এবং উড়িষ্যার সকল পারিষদগণ পরমানন্দে হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন। সকলেই চৈতন্যদেবকে দেখতে পেয়ে দীর্ঘ বিরহের অবসানের কারণে আনন্দে ক্রন্দন করতে থাকেন। এই সময় চৈতন্যদেব নীলাচলের পরম ভক্ত তথা বৈষ্ণব কাশী মিশ্রের গৃহে অবস্থান করেছিলেন বলে কবি জানিয়েছেন। আবার চৈতন্যদেব এই নীলাচলে অবস্থান কালে সর্বদাই প্রেমানন্দ সুখে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে জগন্নাথ পরিদর্শনের জন্য অদ্ভুত প্রেমবিকারের প্রকাশ করতেন বলেও কবি জানিয়েছেন। এই সময় রাজা প্রতাপরুদ্রও চৈতন্যদেবের দর্শন লাভের জন্য রাজধানী কটক থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব রাজাকে কিছুতেই দর্শন দেন না বলে সার্বভৌম এবং অপর সকল পার্ষদ ভক্তের কাছে রাজা আর্তি প্রকাশ করেন। এরপর সেই বৈষ্ণব ভক্তদের পরামর্শেই চৈতন্যদেবের দৃষ্টির অগোচর থেকে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁকে দর্শন করেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের অদ্ভুত প্রেমবিকারের কারণে সর্বাঙ্গে লালা-ধূলাদি পরিব্যাপ্ত থাকায় রাজা প্রতাপ রুদ্রের মনে দ্বিধা ও সন্দেহের সঞ্চার হয়। কিন্তু কারো কাছেই রাজা তা প্রকাশ না করে বাড়ি ফিরে গেলে রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখতে পান জগন্নাথের সর্বাঙ্গ ধূলাময়। শুধু তাই নয়, জগন্নাথই যে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন — এই তত্ত্ব সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান লাভ করেন রাজা। স্বপ্নযোগে রাজা চৈতন্যদেবের 'অবতার তত্ত্ব' সম্পর্কে জানতে পেরে নিজেকে অপরাধী মনে করে আত্মধিক্কার করতে থাকেন। এরপর একদিন চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ লাভ করে রাজা প্রতাপরুদ্র বিনয় সূচক উক্তিতে তাঁর নিজ অপরাধ ও দৈন্য স্বীকার করলে চৈতন্যদেব কৃপা করে বলেন—

"প্রভু বোলে 'কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য্য বিনে তুমি না করিহ আর।। ১৯৯
নিরন্তর গিয়া কর' কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।
তোমার রক্ষিতা— বিষ্ণুচক্র-সুদর্শন।।' ২০০"[৪৬৯]

এভাবে চৈতন্যদেব নিজ স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করে নীলাচলে হরিনাম সঙ্কীর্তনের প্রেমাবেশে অবস্থান করবার সময় তাঁর সঙ্গে উৎকলের সকল অনুচর বৈষ্ণব ভক্তেরা এসে মিলিত হন। উৎকল তথা উড়িষ্যার কাশীনাথ মিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি পরম বৈষ্ণবেরা চৈতন্যদেবের অনুচর ভক্ত হিসাবে সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থেকে হরিনাম সঙ্কীর্তন করতেন। এরপর কবি নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। নিত্যানন্দকে চৈতন্যদেব একদিন গৌড়দেশে যাবার জন্য আদেশ করে বলেন —

"প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে।।' ২২৩"[৪৭০]

লক্ষণীয়, এটাই ছিল চৈতন্য মতবাদের মূল কথা। ভক্তির দ্বারা সমাজের জাতি ভেদ প্রথার বিলোপ সাধন করে সকলকে একাসনে বসবার অধিকার দান করাই ছিল চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা। আর প্রেমভক্তিই ছিল এখানে মুখ্য। এই কারণে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ ও তাঁর পারিষদগণকে গৌড়দেশের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। লক্ষণীয়, চৈতন্যদেব একাই এই সময় নীলাচলে অবস্থান করেন। তাঁর নবদ্বীপলীলার সমস্ত পার্ষদগণ নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়ের উদ্দেশ্যে গমন করেন বলে কবি জানিয়েছেন। গৌড়ের উদ্দেশ্যে গমন করে নিত্যানন্দ ও পার্ষদেরা পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করেন এবং কৃষ্ণপ্রেমানন্দে লিপ্ত হন। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নিত্যানন্দ হরিনামে নৃত্য করবার পর নিজ অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। রাঘব পণ্ডিতের কাছে তিনি কদম্ব ফুলের মালা পরবার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাঘব পণ্ডিত জানান —

"করজোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
'কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে।।' ২৭৯"[৪৭১]

কিন্তু নিত্যানন্দের মহাপ্রভাবে 'জম্বীরের বৃক্ষে' অর্থাৎ জামির লেবুর গাছে সুগন্ধ কদম ফুল ফুটে আছে দেখে রাঘব পণ্ডিত পরমাশ্চর্য লাভ করেন এবং সেই অপূর্ব কদম ফুল চয়ন করে মালা গেঁথে নিত্যানন্দের গলায় পরান।

এরপর আবার একদিন নীলাচলের দমনক ফুলের মনোহর সুগন্ধ দশ দিক আমোদিত হলে নিত্যানন্দ বৈষ্ণব পার্ষদদের বলেন —

"চৈতন্যগোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন।। ২৯৪

সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক মালা।

একবৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা।। ২৯৫”[৪৭২]

এভাবে নিত্যানন্দ নিজ অলৌকিকত্ব প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে সকল বৈষ্ণবের হৃদয়ে মহাপ্রেম-ভক্তি প্রদান করেন। এরূপ প্রেমভক্তির প্রকাশ করে নিত্যানন্দ পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে তিন মাস অবস্থান করেছিলেন বলে কবি জানিয়েছেন। আবার, ব্রজের বলরাম ভাবের আবেশে নিত্যানন্দ যেমন বিবিধ অলঙ্কার ধারণ করেছিলেন তেমনি তাঁর পার্ষদগণও ব্রজরাখালের ভাবে আবিষ্ট হয়ে বিবিধ অলঙ্কার ধারণ করেছিলেন বলে কবি জানিয়েছেন। নিত্যানন্দ নিজের অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রকাশ করে গঙ্গার উভয়তীরে গ্রামে গ্রামে সপার্ষদ ভ্রমণ করে নিরন্তর হরিনাম সঙ্কীর্তন করতেন। শুধু তাই নয়, শিশুদের মনেও কৃষ্ণ প্রেমবিহ্বলতার উৎপাদন করতেন নিত্যানন্দ বাল্যভাবাবিষ্ট হয়ে। এভাবে নিত্যানন্দ সপার্ষদ ভ্রমণ করতে করতে গদাধর দাসের গৃহে আগমন করেন। গদাধর গোপীভাবে আবিষ্ট হয়ে পরমানন্দে শ্রীবালগোপাল মূর্তি পূজা করতেন। নিত্যানন্দ গদাধরের গৃহে সেই গোপালকৃষ্ণ বিগ্রহকে বুকে জড়িয়ে ধরে ব্রজের গোপভাবে আবিষ্ট হন এবং মাধব ঘোষের ‘দানখণ্ড’ কীর্তন শ্রবণ করে প্রেমাবেশে নৃত্য করেন। এক্ষেত্রে কবি নিত্যানন্দের কৃষ্ণপ্রেম বিকারে অদ্ভুত নৃত্যের বর্ণনা দান করেছেন।

এরপর কবি গদাধর দাসের কাজিগৃহে গমনের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। মহা প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় গদাধর দাস পরম দুর্বার-অত্যাচারী কাজি গৃহে প্রবেশ করে তাকে ‘হরি’ নাম উচ্চারণ করতে বলেন। কিন্তু কাজি গদাধরকে বলেন —

‘‘হাসি বোলে কাজী ‘শুন দাস-গদাধর!

কালি বলিবাঙ ‘হরি’ আজি যাহ ঘর।।’ ৪০৭”[৪৭৩]

এভাবে কাজির মুখে হরিনাম শ্রবণ করেই গদাধর কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে পড়েন। কাজিকে তখন গদাধর বলেন —

‘‘গদাধরদাস বোলে ‘আর কালি কেনে।

এই ত বলিলা ‘হরি’ আপন বদনে।।’ ৪০৯”[৪৭৪]

এরূপে কাজিকে দিয়ে হরিনাম উচ্চারণ করিয়ে গদাধর দাস নিজ গৃহে ফিরে আসেন এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হরিনাম সঙ্কীর্তন করেন।

এরপর কবি পুনরায় নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। নিত্যানন্দ শচীমাতাকে দেখবার জন্য গদাধরের গৃহ থেকে নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে গমন করেন। নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে গমন করে নিত্যানন্দ খড়দহে পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে আগমন করেন। পুরন্দর পণ্ডিত ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত প্রায়। সর্বদাই কৃষ্ণনামে নিয়োজিত পুরন্দর পণ্ডিতের গৃহে সপার্ষদ আশ্রয় গ্রহণ করে নিত্যানন্দ হরিনাম সঙ্কীর্তনের মধ্য দিয়ে এখানে কিছুদিন অবস্থান করবার পর ‘ত্রিবেণীঘাট’-এর কাছে সপ্তগ্রামে এসে উপনীত হন।

ত্রিবেণীঘাটে নিত্যানন্দ সপার্ষদ স্নান করেন এবং এই সপ্তগ্রামের অধিবাসী উদ্ধারণ দত্তের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। উদ্ধারণ দত্ত যেহেতু জাতিতে বণিক ছিলেন, তাই কবি বলেছেন —

“যতেক বণিক-কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে।। ৪৫২” [৪৭৫]

অর্থাৎ, উদ্ধারণ দত্তের প্রেমভক্তির প্রভাবেই সকল বণিক কুল পবিত্র হয়েছেন বলে কবি জানিয়েছেন। নিত্যানন্দ তাঁর পারিষদবর্গদের নিয়ে সপ্তগ্রামের সকল নগরে ও প্রত্যেক ঘরে ঘরে হরিনাম সঙ্কীর্তন প্রচার করেন। নিত্যানন্দের কৃষ্ণ প্রেমাবেশ দেখে ‘সপ্তগ্রাম’ ও ‘আম্বুয়া মুলুক’-এর প্রত্যেকের মনেই প্রেমভক্তির উদয় হয় এবং সকলে মিলে তখন হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হন।

এরপর নিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আগমন করেন। অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দকে দেখে আত্মস্মৃতি হারা হয়ে পড়েন। উভয়েই প্রেমানন্দে পরস্পরের প্রতি বিনয় প্রকাশ করেন এবং প্রেমানন্দজলে আপ্লুত হয়ে পরস্পরের চরণধূলি গ্রহণ করতে চান। এভাবে উভয়েই নিজের পরমানন্দ প্রকাশ করলে অদ্বৈতাচার্য নিত্যানন্দের দীর্ঘ স্তুতি পাঠ করেন। কবি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের মধ্যে এই মধুর সখ্যতার সম্পর্ক দেখিয়ে বলেছেন —

“তবে যে কলহ হের অন্যোহন্যে বাজে।
সে কেবল পরানন্দ, যদি জন বুঝে।। ৪৯১”[৪৭৬]

এভাবে নিত্যানন্দ অদ্বৈতের গৃহে পরমানন্দে অবস্থান করবার পর নবদ্বীপে শচীমাতার গৃহে আগমন করেন। নিত্যানন্দকে দেখতে পেয়ে শচীমাতা অপূর্ব আনন্দ অনুভব করেন এবং তাঁকে নবদ্বীপে থাকবার জন্য অনুরোধ করেন। নিত্যানন্দও শচীমাতাকে জানান —

“নিত্যানন্দ বোলে ‘শুন আই সর্ব্বমাতা।
তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছোঁ এথা।। ৫০৩
মোর ইচ্ছা তোমা’ দেখি থাকিব এথায়।
রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়।। ৫০৪”[৪৭৭]

অর্থাৎ, নিত্যানন্দ যে নবদ্বীপে অবস্থান করবার ইচ্ছাতেই এসেছেন একথা শচীমাতাকে জানান। এরপর নিত্যাননদ চৈতন্যদেব প্রবর্তিত হরিনাম সঙ্কীর্তনে লিপ্ত হয়ে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে তা প্রচার করেন। অবশ্য লক্ষণীয়, কবি এখানে নিত্যানন্দের অপূর্ব রূপের এবং মনোহর বেশ ভূষার যে পরিচয় দিয়েছেন তা কাব্যগুণে অনুপম হয়ে উঠেছে।

এরপর কবি নিত্যানন্দ কর্তৃক চোর-দস্যু প্রভৃতি অসাধু ব্যক্তিদের উদ্ধারের কাহিনির বিস্তৃত বর্ণনা দান করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে কবি নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ কুমারের কথা বলেছেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও সে ছিল চোর-দস্যুদের মহা সেনাপতি। নিত্যানন্দের সর্বাঙ্গে লক্ষ-কোটি টাকার স্বর্ণালঙ্কার দেখে

সে তা হরণ করবার বাসনা প্রকাশ করে। এই অভিলাষে সেই দস্যু একদিন রাত্রে নিত্যানন্দ গৃহে চুরি করতে এলেও তাঁকে ভোজনে ব্যস্ত দেখে এক গাছতলায় গিয়ে তার অনুচর দস্যুদের নিয়ে বিশ্রাম করতে গিয়ে নিদ্রিত হন। পরে দস্যুগণ মনে করে চণ্ডীপূজা করে দস্যুবৃত্তিতে বের হলেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাই এই দস্যুরা —

"এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।

মদ্য মাংস দিয়া সভে করিল পূজন।। ৫৬৬"[৪৭৮]

লক্ষণীয়, কবি এখানে তৎকালীন সামাজিক চিত্রের ছবি পরিস্ফুট করেছেন বলেই মনে হয়। এরপর সেই দস্যুগণ পুনরায় দস্যুবৃত্তি করতে এসে নিত্যানন্দ গৃহের সামনে রাজকর্মচারী পদাতিকগণের পাহারা দেখতে পান। ফিরে গিয়ে দস্যুগণ অপর একদিন মহা ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাত্রে নিত্যানন্দের অলঙ্কার চুরি করতে আসেন। কিন্তু সেইদিন প্রত্যেকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মহাবিপদের সম্মুখীন হয়ে উপলব্ধি করতে পারেন নিত্যানন্দ সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। আর তাই সেই দস্যুপতি নিত্যানন্দ শরণ গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ স্তব কীর্তন করতে থাকেন। নিত্যানন্দ দস্যুপতির কাতর নিবেদন শুনে তখন দস্যুগণের উদ্ধার করেন।

'অন্ত্যখণ্ড'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়েও কবি সেই নবদ্বীপের অসাধু দস্যুদের নিত্যানন্দ কর্তৃক উদ্ধারের বর্ণনা দান করেছেন। তবে লক্ষণীয়, নিত্যানন্দের কৃপায় নবদ্বীপের অসাধু দস্যুরা উদ্ধার হয়েছেন শুধুমাত্র এইটুকুই কবি আগের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু কিরূপে নিত্যানন্দ তাদের উদ্ধার করলেন তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন কবি এই 'অন্ত্যখণ্ড'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে। কবি বলেছেন, নিত্যানন্দের করুণায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অসাধু দস্যুরা প্রত্যেকেই বাড়ি ফিরে গিয়ে গঙ্গাস্নান করেন। আর দস্যুরা প্রত্যেকেই বাড়ি ফিরে গিয়ে গঙ্গাস্নান করেন। আর দস্যুসেনাপতি সেই ব্রাহ্মণকুমার নিত্যানন্দের কাছে গিয়ে তাঁর চরণ যুগল বন্দনা করেন। তখন কৃষ্ণপ্রেমের ভক্তির কারণে সেই ব্রাহ্মণের চোখে নিরবধি অশ্রুধারা প্রবাহমান। আনন্দসাগরে নিয়োজিত সেই ব্রাহ্মণকুমার নিত্যানন্দের প্রভাবে নিরন্তর হরিনাম সঙ্কীর্তনে নৃত্য করতে থাকেন। নিত্যানন্দের কাছে উপস্থিত সকলেই এই ব্রাহ্মণকুমারের কৃষ্ণপ্রেমানন্দে মানসিক পরিবর্তন দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন। নিত্যানন্দ তখন হরষিত চিত্তে সেই ব্রাহ্মণকুমারকে প্রশ্ন করে বলেন —

"প্রভু বোলে 'কহ বিপ্র! কি তোমার রীত।

বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত-চরিত।। ১৭

কি শুনিলা কি দেখিলা কৃষ্ণ অনুভব।

কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব।।' ১৮"[৪৭৯]

কিন্তু নিত্যানন্দের উক্তি শ্রবণ করে সেই ব্রাহ্মণ নিরুত্তরে শুধুই প্রেমাবেশে কান্না করেন। পরে অবশ্য

সেই ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দের কাছে নিজের পূর্বকৃত সমস্ত পাপের কথা স্বীকার করেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আত্মবিসর্জন দিতে চান। তখন নিত্যানন্দ সেই ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপাবর্ষণ করেন এবং তাঁকে হরিনাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে ধর্মপথে নিয়োজিত হবার পরামর্শ দান করেন। শুধু তাই নয়, নিত্যানন্দ নিজের গলার মালা খুলে সেই অনুতপ্ত ব্রাহ্মণের গলায় পরিয়ে দেন। তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নিত্যানন্দের চরণ ধরে ক্রন্দন করেন এবং নিত্যানন্দের দীর্ঘ স্তুতি পাঠ করেন। এতে নিত্যানন্দ সন্তুষ্ট হয়ে সেই ব্রাহ্মণের এবং তাঁর অনুচর দস্যুদের অপরাধ ক্ষমা করলে সকলেই তখন কৃষ্ণ ভক্তিতে আত্মনিবেদন করেন। তবে, লক্ষণীয় এই দীর্ঘ কাহিনির দ্বারা কবি নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য কীর্তন বর্ণনা করেছেন বলেই মনে হয়। সুতরাং বুঝতে পারি চৈতন্যদেবের জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে কবি নিজ গুরুদেব নিত্যানন্দেরও দীর্ঘ মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা করেছেন এই কাব্যে।

এরপর কবি পুনরায় নিত্যানন্দের পারিষদ সঙ্গে পরমানন্দে পরিভ্রমণ করবার পরিচয় দিয়েছেন। নবদ্বীপের কাছাকাছি যত গ্রাম ছিল, যেমন — 'খানাযোড়া', 'বড়গাছি', 'দোগাছিয়া' প্রভৃতি সমস্ত গ্রামেই নিত্যানন্দ সপার্ষদে হরিনাম সঙ্কীর্তনে বিহার করতেন। পরে কবি নিত্যানন্দের মহাভাগ্যবান পার্ষদদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেছেন। কবি এইসব পার্ষদদের নিত্যানন্দের দাস বলে যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি আবার ব্রজলীলার গোপ এবং গোপীর অবতার বলেও উল্লেখ করেছেন। নিত্যানন্দের সর্বশেষ দাস বলে কবি নিজের আত্মপরিচয় দান করে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে বলেছেন —

''সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান— বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র-নারায়ণী-গর্ভ জাত।। ১২১
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।।' ১২২''[৪৮০]

'অন্ত্যখণ্ড'-এর সপ্তম অধ্যায়ে কবি বহুত অলঙ্কার পরিহিত নিত্যানন্দের বাহ্যিক বিলাসিতার পরিচয় দান করেছেন। নিত্যানন্দের এরূপ বহুত অলঙ্কার পরিহিত সন্ন্যাসাশ্রমবিরোধী আচরণ দর্শন করে চৈতন্যদেবের শৈশবের এক সহপাঠীর মনে অবিশ্বাস তথা অশ্রদ্ধা জন্মায়। তখন সেই ব্রাহ্মণ ব্যক্তিটি নবদ্বীপ থেকে নীলাচলে গিয়ে চৈতন্যদেবের প্রতি দৃঢ় ভক্তি প্রকাশ করে নিত্যানন্দের বাহ্যিক সন্ন্যাস বিরোধী বিলাসিতার বিষয়ে অভিযোগ করেন এবং নিত্যানন্দের এরূপ আচরণের তাৎপর্য কী তা জানতে চান। চৈতন্যদেব তখন সেই ব্রাহ্মণকে নিত্যানন্দ সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেন —

''শুন বিপ্র! যদি মহা-অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্মায়।। ২৫''[৪৮১]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব বলেন, নিত্যানন্দ রাগ-দ্বেষ বিবর্জিত, সর্ববিষয়ে সমদর্শী এবং গুণাতীত ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন মহা অধিকারী। তাই তাঁর শাস্ত্রবিধি পালন করবার জন্য গুণ কিংবা শাস্ত্রবিধি

লঙ্ঘনজনিত দোষ — কোনটাই জন্মে না। এভাবে গূঢ় তত্ত্ব কথা প্রকাশ করে চৈতন্যদেব বলেন— নিত্যানন্দের স্বরূপ গত প্রভাব না জেনে যে তাঁর বাহ্যিক আচরণ নিয়ে উপহাস কিংবা নিন্দা করবেন সেই পাপে লিপ্ত হবেন।

এরূপ মহা অধিকারীর অসাধারণ মহিমার কথা না জেনে তাঁর আচরণে দোষ দেখলে কেমন কুফল হয় চৈতন্যদেব ভাগবতের উদাহরণ দিয়ে তা বর্ণনা করেছেন। মরীচির পুত্ররা ব্রহ্মার আচরণে দোষ দেখতে পেয়ে কীভাবে অশেষ দুর্গতি ভোগ করেছিলেন চৈতন্যদেব সেই ব্রাহ্মণের কাছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। লক্ষণীয়, এই বর্ণনা দানের মাধ্যমে কবি আসলে বৈষ্ণবের প্রতি নিন্দায় কি কুফল লাভ হয় তাই জানাতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। ভাগবতের উদাহরণ থেকে কবি তাই কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী উল্লেখ করে বলেছেন—

> ‘‘মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে।
> মোর ভক্ত নিন্দে’ যদি, তারো বিঘ্ন ধরে।। ৯১
> মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
> নিঃসংশয় নিঃসংশয় মোরে পায় সে।। ৯২’’[৪৮২]

এরপর, চৈতন্যদেবের কাছ থেকে নিত্যানন্দের মহিমা সম্পর্কে অবগত হয়ে সেই ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দের চরণে গিয়ে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নিত্যানন্দও সেই ব্রাহ্মণের প্রেমভক্তির উদয় হতে দেখে তাঁর প্রতি কৃপা বর্ষণ করেন। কবি এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতেও নিজ গুরুদেব নিত্যানন্দের প্রতি দীর্ঘ মাহাত্ম্য কীর্তন বর্ণনা করে তাঁর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণের জন্য বিশেষ মিনতি করেছেন। কিন্তু শেষে কবি ধৈর্য হারিয়ে নিত্যানন্দ নিন্দুকদের প্রতি মন্তব্য করেছেন —

> ‘‘এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
> তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।। ১২৯’’[৪৮৩]

‘অন্ত্যখণ্ড’-এর অষ্টম অধ্যায়েও কবি অনুরূপে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নিত্যানন্দের নবদ্বীপে হরিনাম সঙ্কীর্তন প্রচারের বর্ণনা দিয়েই কাহিনির সূত্রপাত করেছেন। নিরবধি এভাবে বৈষ্ণব ভক্তসঙ্গে প্রেমভক্তির প্রকাশ করে চৈতন্যদেবকে দর্শনের ইচ্ছায় নিত্যানন্দ নীলাচলের উদ্দেশ্যে গমন করেন। অবশ্য নিত্যানন্দ তাঁর সপার্ষদ ভক্তদের সঙ্গে নিয়েই নীলাচলের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। নীলাচলে এসে নিত্যানন্দ এক পুষ্পোদ্যানে অবস্থান করেন বলে কবি জানিয়েছেন। এরপর নিত্যানন্দের নীলাচলে আগমনের সংবাদ শ্রবণ করে চৈতন্যদেব সেই পুষ্পোদ্যানে আগমন করেন। নিত্যানন্দ তখন প্রেমাবেশে ধ্যানরত ছিলেন বলে চৈতন্যদেব তাঁকে প্রদক্ষিণ করেন এবং তাঁর স্তুতি পাঠ করেন। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের প্রতি যে স্তুতি করেন তা বর্ণনা করে কবি বলেছেন —

> ‘‘ ‘মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।

তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য' বোলে গৌরচন্দ্র।। ২৩"[৪৮৪]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব বললেন, নিত্যানন্দ যদি যবনীকে বিয়ে করেন কিংবা যদি মদ বিক্রেতার গৃহে প্রবেশও করেন তবু তাঁর চরণ ব্রহ্মার বন্দনীয়। এরপর নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবকে দর্শন করেন এবং উভয়ে প্রেমানন্দে লিপ্ত হয়ে অদ্ভুত প্রেমভক্তির প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ — উভয়েই পরস্পরকে যেমন প্রেমালিঙ্গন করেন তেমনি পরস্পরের চরণ ধূলি গ্রহণ করবার অভিলাষও প্রকাশ করেন। এরপর চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের পুনরায় স্তুতি পাঠ করে বলেন —

''যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার।। ৩৮
স্বর্ণ-মুক্তা-রূপা-কসা-রুদ্রাক্ষাদি-রূপে।
নববিধা ভক্তি ধরি আছ নিজসুখে।। ৩৯"[৪৮৫]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব বলেন নিত্যানন্দের অঙ্গের অলঙ্কার হল নববিধা ভক্তির অঙ্গরূপ প্রকাশ। এভাবে চৈতন্যদেব স্তুতি করলে নিত্যানন্দ লজ্জিত হয়ে তাঁর প্রতি নিজ দৈন্য ও বিনয় প্রকাশ করেন। লক্ষণীয়, এখানে নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের প্রতি যে বিনয় প্রকাশ করেছেন তাতে অনুযোগের সুরও আভাসিত হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। নিত্যানন্দ তাই চৈতন্যদেবকে বলেছেন —

''আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সভারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ।। ৫৪
মুনিধর্ম্ম ছাড়াইয়া কি কৈলে আমারে।
ব্যবহারি জন দেখি সভে হাস্য করে।। ৫৫"[৪৮৬]

নিত্যানন্দের এই অনুযোগের কথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব তাঁকে ব্রজের বলরামরূপে প্রকাশ করেন এবং নিত্যানন্দের বাল্যভাবের কার্যকলাপকে বৃন্দাবনের বাল্যলীলা বলে অভিহিত করেন।

এভাবে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ পরস্পরের প্রতি প্রেমাবেশে কথো পকথনের পর উভয়ে মিলে নিভৃতে পুষ্পোদ্যানে গিয়ে বাহ্য প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেব সম্পর্কে এরপর কবি বলেছেন, তিনি তাঁর স্বীয় স্বরূপ-তত্ত্ব কারো কাছে প্রকাশ করেন না। কিন্তু সকলেই মনে করেন— কেবলমাত্র তাঁর কাছেই চৈতন্যদেব গোপনীয় কথা প্রকাশ করেছেন। আর এই কারণেই মুনির ধর্ম বা সন্ন্যাসীর ধর্ম যারা গ্রহণ করেছেন তাঁরা যেমন নিজেদের শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করেন তেমনি অনেকেই আবার বৃন্দাবনের গোপক্রীড়াকে সমস্ত ধর্মের অধিক উৎকর্ষময় বলে মনে করেন। অর্থাৎ কবি এখানে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁরা প্রত্যেকেই যে নিজেদের পন্থাকে উৎকর্ষ বলে মনে করতেন— তার প্রতিই ইঙ্গিত দান করেছেন বলে মনে হয়। উল্লেখ করতে হয় যে এখানে মুনি ধর্ম বা সন্ন্যাসী ধর্ম বলতে অদ্বৈতাচার্যের পন্থাকে যেমন বোঝানো হয়েছে, তেমনি বৃন্দাবনের

গোপক্রীড়ার ধর্ম বলতে নিত্যানন্দ পন্থাকেই কবি বলতে চেয়েছেন। তবে, কবি বৃন্দাবন দাস নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বৈষ্ণবদের এই কলহের অবসান চেয়েছেন। তিনি যদিও ছিলেন নিত্যানন্দ মতাবলম্বী, তবু তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মিলনের চেষ্টা করে পূর্বের মতো এই অধ্যায়েও বলেছেন —

> ‘‘ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
> আর ঈশ্বরেরে নিন্দে’ সেই অভাগিয়া।। ৯০
> ঈশ্বরের অভিন্ন — সকল ভক্তগণ।
> দেহের যেহেন বাহু অঙ্গুলি চরণ।। ৯১’’[৪৮৭]

এরপর কবি বলেছেন, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ হল স্বয়ং ঈশ্বর তত্ত্ব। এই দু’জনকে চৈতন্যদেব বিশেষ ভালোবাসেন বলে এঁরা পরস্পর প্রেম-কলহ করলে কিংবা কোটি কোটি অলৌকিকত্ব প্রকাশ করলেও চৈতন্যদেব এঁদের শাস্তি দেন না। আসলে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের প্রতি চৈতন্যদেবের সর্বদাই ভক্তি প্রদর্শিত হয়।

এরপর কবি পুনরায় চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে পরমানন্দে অবস্থান করে চৈতন্যদেব নীলাচলের নিজ বাসায় প্রত্যাবর্তন করেন। আর নিত্যানন্দ জগন্নাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে গমন করেন। জগন্নাথকে দর্শন করে নিত্যানন্দ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে প্রেমাবেশে লিপ্ত হন। এভাবে নিজ প্রেমবিকার প্রকাশ করে নিত্যানন্দ গদাধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। গদাধরের গৃহের গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করে নিত্যানন্দ আনন্দাশ্রুতে লিপ্ত হন। গদাধর ও নিত্যানন্দ পরস্পরের প্রতি প্রেমভক্তির প্রকাশের মধ্য দিয়ে আনন্দ সাগরে উপনীত হন। তখন গদাধর নিত্যানন্দকে তাঁর গৃহে ভোজন করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। নিত্যানন্দ গদাধরকে নবদ্বীপ থেকে নিয়ে আসা তাঁর জন্য অতি সুগন্ধি ও সরু চাল এবং একখানা কাপড় দিয়ে বলেন—

> ‘‘ ‘গদাধর! এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
> শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন।।’ ১২৮’’[৪৮৮]

গদাধর এরপর নিজ হাতে রান্না করে গোপীনাথের ভোগ দিতে যাবার সময় চৈতন্যদেব তাঁর গৃহে এসে উপস্থিত হন এবং ভোজন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এরপর চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও গদাধর পরমানন্দে একসঙ্গে ভোজন করেন।

‘অন্ত্যখণ্ড’-এর নবম অধ্যায়ে কবি নীলাচলে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার বর্ণনা দান করেছেন। এই রথযাত্রা দর্শনের জন্য নবদ্বীপ তথা গৌড়ের সকল ভক্তগণ নীলাচলের উদ্দেশ্যে গমন করেন। রথযাত্রা দর্শন করতে নীলাচলে গৌড়ের তথা নবদ্বীপের কোন্ কোন্ বৈষ্ণবভক্ত এসেছিলেন কবি তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেছেন। প্রথমেই কবি উল্লেখ করেছেন অদ্বৈতাচার্যের নাম। এরপর কবি ক্রমান্বয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বক্রেশ্বর পণ্ডিত,

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, হরিদাস ঠাকুর, বাসুদেব দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দানন্দ, গোবিন্দ দত্ত, বিজয় দাস, সদাশিব পণ্ডিত, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, শ্রীমা পণ্ডিত, নন্দনাচার্য, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর পণ্ডিত, গোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, বনমালী পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্যভাগবত, বুদ্ধিমন্ত খান, পুরন্দর আচার্য, রাঘব পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, গরুড় পণ্ডিত, গোপীনাথ সিংহ, রামপণ্ডিত, নারায়ণ পণ্ডিত, পণ্ডিত দামোদর প্রভৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ণবভক্তের নাম উল্লেখ করে বলেন —

"অনন্ত চৈতন্য ভক্ত — কত জানি নাম।
সভে চলিলেন হই আনন্দের ধাম।। ৩৬"[৪৮৯]

এই নবদ্বীপের বৈষ্ণবভক্তেরা নীলাচলে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দর্শনের উদ্দেশ্যে আসবার সময় চৈতন্যদেবের জন্য তাঁর পছন্দের সমস্ত প্রীতিকর দ্রব্য নিয়ে আসতেন বলেও কবি জানিয়েছেন। আবার প্রত্যেক বৈষ্ণবভক্তই যে হরিনাম সঙ্কীর্তন করতে করতে নীলাচলের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন তাও জানাতে ভোলেন নি কবি।

এভাবে নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণব ভক্ত পরমানন্দে নীলাচলের সম্মুখে কমলপুরের আঠারনালায় এসে পৌঁছোলে চৈতন্যদেব সপার্ষদে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে যান। আবার, অদ্বৈতাচার্যের প্রতি বিশেষ প্রীতির কারণে তিনি যখন কটক পর্যন্ত আগমন করেছিলেন তখনই চৈতন্যদেব তাঁর জন্য প্রসাদ প্রেরণ করেছিলেন বলে কবি জানিয়েছেন। এভাবে নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভক্তের সঙ্গে চৈতন্যদেবের নীলাচলবাসী ভক্তগণের সাক্ষাৎ হলে প্রত্যেকেই প্রেমাবেশে লিপ্ত হন এবং বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ করে আনন্দ-ক্রন্দন করতে থাকেন। শুধু তাই নয় তখন সকল ভক্তগণ নিজের প্রেম ভক্তির প্রকাশ করে এক মহাসমারোহে হরিনাম সঙ্কীর্তনে নৃত্য করতে থাকেন। চৈতন্যদেব নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণবভক্তবৃন্দকে মালা ও চন্দন দিয়ে বরণ করলে প্রত্যেকে তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলেন —

"সভেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি।
জন্মে জন্মে যেন প্রভু! তোমা' না পাসরি।। ৯১
কি মনুষ্য পশু পক্ষী ঘরে জন্মি যথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা।। ৯২"[৪৯০]

এভাবে আঠারনালায় সকল বৈষ্ণবভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে লিপ্ত থাকার পর চৈতন্যদেব তাঁদের নরেন্দ্র সরোবরের তীরে নিয়ে আসেন। সেসময় জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা উপলক্ষে নরেন্দ্র সরোবরের তীরে উৎসবের আয়োজন চলছিল। অর্থাৎ জগন্নাথদেবের বিজয় বিগ্রহ রাম, কৃষ্ণ ও গোবিন্দের মূর্তিকে নরেন্দ্র সরোবরে নিয়ে এসে জলকেলি করবার যে প্রথা সেদিন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সেদিন চৈতন্যদেব সকল বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত হন। রাম, কৃষ্ণ ও গোবিন্দের বিগ্রহকে নরেন্দ্র সরোবরে নৌকারোহণে নিয়ে এসে যখন মহাসমারোহে জলকেলি করানো হয় তখন চৈতন্যদেব ও

তাঁর সকলভক্তবৃন্দ তা দর্শন করে পরমানন্দ লাভ করেন। এরপর চৈতন্যদেব নিজে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নরেন্দ্র সরোবরের জলে ঝাঁপ দিয়ে জলকেলি করেন। লক্ষণীয়, নরেন্দ্র সরোবরে চৈতন্যদেবের সপার্ষদে অপূর্ব জলকেলির বর্ণনা করতে গিয়ে কবি ভক্তিহীন সন্ন্যাসীদের চৈতন্যদেবের প্রতি বিরূপ মন্তব্যের প্রকাশ করে বলেছেন —

> ''আরো বোলে 'চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি।
> কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন-হুড়াহুড়ি।। ১৩২
> সর্ব্বদাই প্রণায়াম — এই সে যতিধর্ম্ম।
> নাচিব কাঁদিব — একি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম।। ১৩৩'' [৪৯১]

আসলে কবি এখানে শঙ্করাচার্যের ভক্তিহীন মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উক্তিই প্রকাশ করেছেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা বেদান্ত পাঠকেই সন্ন্যাসীর ধর্ম বলে মনে করতেন এবং কৃষ্ণপ্রেমাবেশে কীর্তন-নৃত্য ও ক্রন্দনকে কখনোই সন্ন্যাসীর কর্তব্য বলে মনে করতেন না। কিন্তু কবি বলতে চেয়েছেন এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা 'চৈতন্যতত্ত্ব' সম্পর্কে না জেনেই এরকম বিরূপ মন্তব্য করতেন।

এভাবে পরমানন্দে চৈতন্যদেব জলক্রীড়া সম্পন্ন করে জগন্নাথ বিগ্রহ পরিদর্শনের জন্য সপার্ষদে যাত্রা করেন। এরপর জগন্নাথ বিগ্রহকে দর্শন করে চৈতন্যদেব ও সকল বৈষ্ণবভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে ক্রন্দন করতে থাকেন। এমন সময় কাশীমিশ্র জগন্নাথের গলার মালা এনে চৈতন্যদেবের গলায় পরাতে গেলে তিনি পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সেই মালা গ্রহণ করেন। এরপর কবি চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব, তুলসী ও গঙ্গার প্রতি সশ্রদ্ধ ভক্তির প্রকাশ করেছেন। কবি জানিয়েছেন, চৈতন্যদেব নিজে সন্ন্যাসী হলেও গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে নিজের সশ্রদ্ধ ভক্তির পরিচয় দেন। আবার, তুলসীর প্রতি নিজের ভক্তির কথা প্রকাশ করতে গিয়ে চৈতন্যদেব নিজেই বলেছেন —

> ''প্রভু বোলে 'মুঞি তুলসীরে না দেখিলে।
> ভালো নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে।।' ১৫৫'' [৪৯২]

চৈতন্যদেব সপার্ষদে জগন্নাথ বিগ্রহ পরিদর্শন করে নীলাচলের নিজ বাসায় অর্থাৎ কাশী মিশ্রের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন বলে কবি জানিয়েছেন। এরপর কবি এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে শাস্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, চৈতন্যদেবের পার্ষদ বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের কর্মবন্ধন বিষয়ক জন্ম-মৃত্যু নেই। কারণ স্বয়ং ভগবান যখন অবতীর্ণ হন তখন তাঁর সপার্ষদকেও আগে অবতীর্ণ করান।

'অন্ত্যখণ্ড'-এর দশম অধ্যায়েও কবি চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁর অনুচর ভক্তবৃন্দের নীলাচলে পরমানন্দে হরিনাম সমকীর্তনের বর্ণনা দিয়েই কাহিনির সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়েই কবি জানিয়েছেন, চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের বৈষ্ণব ভক্তেরা নীলাচলে আসবার সময় তিনি যে সব দ্রব্য ছেলেবেলায় খুব ভালোবাসতেন তা সঙ্গে করে নিয়ে গমন করেছিলেন। এই অধ্যায়েও কবি সেই

বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন —

"সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ।। ৬
যে দিনে যে ভক্তগৃহে হয় নিমন্ত্রণ।
তথাই পরমশ্রীতে করেন ভোজন।। ৭"[৪৯৩]

অর্থাৎ, সকল বৈষ্ণব গৃহিণীই চৈতন্যদেবের পছন্দের অন্নব্যঞ্জন রান্না করে তাঁকে পরম প্রীতির সঙ্গে ভোজন করাতে ন। এরকমই একদিন নীলাচলে চৈতন্যদেবকে অদ্বৈতাচার্য তাঁর গৃহে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। অদ্বৈতাচার্য তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করলে চৈতন্যদেব সাগ্রহে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার বাসনা প্রকাশ করেন। এরপর অদ্বৈতাচার্য হরষিত চিত্তে গৃহে ফিরে গিয়ে চৈতন্যদেবের ভোজনের ব্যবস্থাদি করতে থাকেন। বহুত প্রকারের অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করবার পর অদ্বৈতাচার্য মনে মনে চিন্তা করেন —

"অদ্বৈত চিন্তেন মনে 'হেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি করেন বিজয়।। ৩০
তবে ইহা সব মুঞি পারোঁ খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধ হয় কোন্ মতে।।' ৩১"[৪৯৪]

অর্থাৎ, অদ্বৈতাচার্য যে সমস্ত দ্রব্য চৈতন্যদেবের জন্য রন্ধন করেছেন তা একমাত্র তাঁকেই খাইয়ে পরিতৃপ্তি পাবার বাসনা প্রকাশ করেন। অদ্বৈতের এই ইচ্ছার কারণেই হঠাৎই সেদিন মধ্যাহ্নে ইন্দ্র কর্তৃক ভয়ঙ্কর ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাপাতের সৃষ্টি হয়। প্রবল ঝড়-বৃষ্টির কারণে চৈতন্যদেবের পার্ষদ বৈষ্ণবভক্তেরা কেউই অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আগমন করতে না পারায় চৈতন্যদেব একা অদ্বৈত গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতে আসেন। চৈতন্যদেবকে একা আসতে দেখে পরমানন্দে বিহ্বল অদ্বৈতাচার্য পরম সযত্নে তাঁকে ভোজন করান। চৈতন্যদেবও অদ্বৈত আচার্যের ইচ্ছা পূরণের কারণে সমস্ত অন্নব্যঞ্জনাদি পরিতৃপ্তি সহ গ্রহণ করেন। এরপর অদ্বৈতাচার্য ইন্দ্রের স্তব কীর্তন পাঠ করেন। চৈতন্যদেব অদ্বৈতকে ইন্দ্রের স্তব কীর্তন পাঠ করতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে অদ্বৈতাচার্য তা ব্যাখ্যা না করে গোপন করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব অদ্বৈতের ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরে বলেন—

" 'সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইব আমি' এ তোমার মন।। ৬৯
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল।
খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা করিবা সফল।। ৭০"[৪৯৫]

আর এই কারণেই অদ্বৈতাচার্য ইন্দ্রকে আদেশ করিয়ে ঝড়-বৃষ্টি উপদ্রবের যে সৃষ্টি করিয়েছেন তা

বুঝতে পারেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব প্রসঙ্গক্রমে এরপর অদ্বৈতাচার্যের মহিমা বর্ণনা করলে অদ্বৈতাচার্যও তাঁর ভক্ত-বৎসল হবার কৃপা প্রার্থনা করেন। এভাবে পরমানন্দে চৈতন্যদেব অদ্বৈতগৃহে ভোজন সমাপন করেন বলে কবি জানিয়েছেন। অবশ্য লক্ষণীয়, কবি এরপর অদ্বৈত-চৈতন্যদেবের মধ্যে অভেদ তত্ত্বের প্রকাশ করে বলেন —

"একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরি-হরে যেন-তেন চৈতন্য-অদ্বৈত।। ৮৪"[৪৯৬]

অর্থাৎ, কবি বলতে চেয়েছেন চৈতন্য ও অদ্বৈতের মধ্যে বাস্তবিক কোন প্রভেদ নেই। তাই একজনের প্রতি প্রীতি এবং অপর জনের প্রতি অপ্রীতিতে উভয়েই অপ্রীতিবোধ করেন। এ জন্য চৈতন্যদেব ও অদ্বৈতকে অভেদ জ্ঞান করে উভয়ের প্রতিই সমান প্রেমভক্তির প্রদর্শন করতে বলেন কবি।

এরপর কবি জানিয়েছেন দামোদর পণ্ডিত শচীমাতাকে দেখবার জন্য যে নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন সেখান থকে তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। চৈতন্যদেব দামোদর পণ্ডিতকে শচীমাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করে বলেন —

"প্রভু বোলে, 'তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ, আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে?' ৯৩" [৪৯৭]

চৈতন্যদেব শচীমাতা সম্পর্কে এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় দামোদর পণ্ডিত তাঁর প্রতি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন। দামোদর পণ্ডিত তখন শচীমাতার শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তির পরিচয় দান করে চৈতন্যদেবকে বলেন —

"আইর প্রসাদে সে তোমার বিষ্ণুভক্তি।
যত কিছু তোমার, সকল তাঁর শক্তি।। ৯৬
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয়।। ৯৭"[৪৯৮]

দামোদর পণ্ডিতের শচীমাতা সম্পর্কে এই শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখে চৈতন্যদেব তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হন এবং উভয়েই তখন পরস্পরের প্রতি প্রেমভক্তির প্রকাশ করেন। এরপর কবি বলেছেন, আসলে জগতে ভক্তির মহিমা প্রকাশ করবার কারণেই চৈতন্যদেবের এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দামোদরের কাছে। চৈতন্যদেব মনে করতেন — যার বিষ্ণুভক্তি রয়েছে তার সমস্তই কুশল। দরিদ্র হলেও যদি বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হয় তবে সে বৈষ্ণব মতে 'ধনবন্ত', আর বিষ্ণুভক্তিহীন বহুত সম্পত্তির অধিকারীও বৈষ্ণবের কাছে দরিদ্র। আসলে প্রেমভক্তিই যে বৈষ্ণবের প্রধান অবলম্বন তাই প্রকাশ করেছেন চৈতন্যদেব।

এরপর কবি বলেছেন, চৈতন্যদেব তাঁর নিজ গুরু কেশব ভারতীর কাছে একদিন জানতে চান — ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? গুরু কেশব ভারতী তখন শাস্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করে চৈতন্যদেবকে বলেন যে জ্ঞান নয়, ভক্তিই হল শ্রেষ্ঠ। গুরুদেব কেশব ভারতীর কাছ থেকে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা

শ্রবণ করে চৈতন্যদেব তখন পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এরপর কবি নব কাহিনির উত্থাপন করে বলেছেন, অদ্বৈতাচার্য একদিন সকল বৈষ্ণবভক্তকে চৈতন্যদেবের ভগবত্তা-গুণ বিষয়ক মহিমাদি কীর্তন করতে আদেশ করেন। চৈতন্যদেব যেহেতু নিজ তত্ত্ব বা গুণমহিমার প্রচার করা পছন্দ করেন না তাই রুষ্ট হবেন মনে করে কীর্তনিয়াগণ প্রাথমিক ভাবে ভয় পান। কিন্তু অদ্বৈতাচার্যের আদেশের কারণে কীর্তনিয়ারা চৈতন্যের মঙ্গলময় গুণমহিমা কীর্তন করতে শুরু করেন। অদ্বৈতাচার্য তখন চৈতন্যদেবের চরণযুগল চিন্তা করে নৃত্য করতে শুরু করেন। কিন্তু এমন সময় কীর্তনের পরম উদ্দাম ধ্বনি শুনে চৈতন্যদেব সেখানে উপস্থিত হন। চৈতন্যদেবকে দেখতে পেয়ে অদ্বৈতাচার্য এবং সকল বৈষ্ণব ভক্তগণ পরমানন্দে অধিক উল্লাসে তাঁর মহিমা কীর্তন করতে থাকেন। চৈতন্যদেব তখন নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর না বলে ঈশ্বরের 'দাস' বলে পরিচয় দান করেন। কিন্তু তবু বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁকে স্বয়ং ভগবানের অবতার বলে মহিমা কীর্তন করতে থাকলে লজ্জিত চৈতন্যদেব আত্মস্তুতি শুনে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রেমানন্দে বৈষ্ণব ভক্তেরা চৈতন্যদেবের প্রত্যাবর্তনের কথা বুঝতে পারেন না। প্রেমানন্দে এভাবে চৈতন্যমহিমা কীর্তন করবার পর বৈষ্ণবেরা তখন চৈতন্যদেবের দর্শনের জন্য তাঁর গৃহে আগমন করেন। কিন্তু চৈতন্যদেব সকল ভক্তবৃন্দকে ভয় দেখানোর জন্য রুষ্ট হবার ভান করে শুয়ে থাকেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাদের এরূপ অদ্ভুত কীর্তন করবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উপস্থিত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দদের মধ্যে শ্রীবাস তখন চৈতন্যদেবকে বলেন—

> ''মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলেন 'গোসাঞি!
> জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে কিছু নাঞি।। ১৯৬
> যেন করায়েন যেন বোলায়েন ঈশ্বরে।
> সেই আজি বলিলাঙ, কহিল তোমারে।।' ১৯৭''[৪৯৯]

শ্রীবাসের একথা শ্রবণ করে চৈতন্যদেব বলেন— যে নিজেকে লুকিয়ে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে কেন তাঁকে তোমরা প্রকাশ করতে চাও? এরপর শ্রীবাস নিজের হাত দিয়ে সূর্যের আচ্ছাদনের দ্বারা চৈতন্যদেবের আত্মগোপন যে প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব তা প্রতিপন্ন করেন। শুধু তাই নয় শ্রীবাস চৈতন্যদেবের ভগবত্তার পরিচয়ও দান করেন। এরপর কবি বলেছেন, অসংখ্য লোক জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন করে চৈতন্যদেবকে দর্শন করবার জন্য তাঁর গৃহে আগমন করেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করেন। সুতরাং, কবির দেওয়া এই বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি চৈতন্যদেব তাঁর জীবিত কালেই নিজ মহানুভবতার দ্বারা ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আসলে প্রিয়কে দেবতা করবার যে বাসনা আমাদের অন্তঃস্থলে বিরাজিত তাই চৈতন্যদেবকে দেবত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল বলে মনে হয়। কবি জানিয়েছেন শুধু বঙ্গদেশই নয়, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশের সকলেই তাঁকে স্বয়ং ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করেছিলেন। অবশ্য কবি আরো জানিয়েছেন — এসময় অনেকেই নিজেকে স্বয়ং

ঈশ্বর বলে প্রকাশ করতেন। কিন্তু চৈতন্যদেবই যে একমাত্র স্বয়ং ঈশ্বর একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বোঝাতে কবি বলেছেন —

''নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সভে বোলে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।।' ২২৪
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে যে বোলে 'কৃষ্ণ' সে-ই অভাগিয়া।। ২২৫''[৫০০]

এরপর কবি চৈতন্যদেবের সঙ্গে নীলাচলে রূপ সনাতনের সাক্ষাতের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সনাতন ছিলেন গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী সাকর মল্লিক। আর রূপ ছিলেন গৌড়েশ্বরের একান্ত সচিব বা প্রাইভেট সেক্রেটারী দবীর খাস। চৈতন্যদেব যখন সকল বৈষ্ণব ভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণকথা ও হরিনাম সঙ্কীর্তনে মগ্ন তখন সাকর মল্লিক ও রূপ — দু'ভাই সেখানে প্রবেশ করেন এবং দূর থেকে চৈতন্যদেবকে দেখতে পেয়ে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা রাজকার্যের বিষয়সুখে নিয়োজিত থাকায় আত্মধিক্কারে চৈতন্যদেবের স্তুতি পাঠ করে তাঁর কাছে উদ্ধারের জন্য বিনয় প্রকাশ করেন। রূপ-সনাতনের সশ্রদ্ধ ভক্তি বিগলিত বিনয় দেখে চৈতন্যদেব তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে প্রেমভক্তি লাভের উপায় হিসাবে বলেন —

''প্রেমভক্তি বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি পড় এই অদ্বৈতচরণে।। ২৫১
ভক্তির ভাণ্ডারী — শ্রীঅদ্বৈতমহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায়ে সে কৃষ্ণভক্তি হয়।। ২৫২''[৫০১]

চৈতন্যদেবের একথা শ্রবণ করে রূপ সনাতন অদ্বৈতের কাছে গিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করেন। চৈতন্যদেবও এই দুই ভাইয়ের সংসারের প্রতি অনাসক্তির পরিচয় দিয়ে অদ্বৈতের কাছে অনুরোধ করলে অদ্বৈতাচার্য তখন তাঁদের প্রেমভক্তি দান করেন। চৈতন্যদেব এরপর রূপ সনাতনকে মথুরা তথা বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে হরিনাম প্রচার করবার জন্য প্রেরণ করেন এবং নিজেও তাঁদের কাছে মথুরা যাবার বাসনা প্রকাশ করেন।

এভাবে কবি চৈতন্যদেব কর্তৃক রূপ সনাতনের উদ্ধারের কথা বর্ণনা করবার পর এক নব কাহিনির উত্থাপন করেছেন। কবি জানিয়েছেন — চৈতন্যদেব একদিন কৃষ্ণপ্রেমাবেশে সকল বৈষ্ণবভক্ত সহ হরিনাম করবার সময় শ্রীবাসকে 'অদ্বৈত-তত্ত্ব' বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। অর্থাৎ, শ্রীবাস অদ্বৈতাচার্যকে কি দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন তাই জানতে চান। উত্তরে শ্রীবাস চৈতন্যদেবকে বলেন —

''মনে ভাবি বলিনা শ্রীবাসমহাশয়।
'শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর চিত্তে লয়।।' ২৭৮''[৫০২]

অর্থাৎ, শ্রীবাস অদ্বৈতাচার্যকে শুক বা প্রহ্লাদ বলে প্রত্যক্ষ করেন — একথা জানালে চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ

হয়ে তাঁকে চড় মারেন। কারণ চৈতন্যদেবের কাছে ভক্তিমহিমায় অদ্বৈতাচার্য পরম প্রবীণ আর শুকদেব সেখানে কালকের বালকমাত্র। সুতরাং, অদ্বৈতাচার্য কখনই শুকদেব হতে পারেন না। এরপর চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যের মহিমা কীর্তন বর্ণনা করলে শ্রীবাস স্বীয় অপরাধ বুঝতে পেরে চৈতন্যদেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চান। তখন শ্রীবাসের সশ্রদ্ধ বিনয় প্রকাশ করতে দেখে চৈতন্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন। এরপর কবি বলেছেন— 'বিষ্ণুতত্ত্ব' যেমন সাধারণে জানতে পারে না তেমনি 'বৈষ্ণব তত্ত্ব'ও সাধারণে জানতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর বা ভগবান কৃপা করে জানালেই তা জানা সম্ভব। আবার 'বৈষ্ণব তত্ত্ব'-এর মত সিদ্ধ বৈষ্ণবের আচার-ব্যবহারও সাধারণের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। সিদ্ধ বৈষ্ণবের বাহ্যিক ব্যবহার দেখে তাঁর সম্পর্কে সম্যক ধারণা যে লাভ করা যায় না তা বোঝাতে কবি 'শ্রীমদ্ভাগবত'-এর ভৃগুর কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা দান করেছেন। ভৃগু বিষ্ণু-বক্ষে পদাঘাত করলেও যেমন বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত তেমনি সিদ্ধ বৈষ্ণবের বাহ্যিক ব্যবহার দেখে তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্য না করে শ্রদ্ধা বিনয় প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয় বলে কবি জানিয়েছেন।

'অন্ত্যখণ্ড'-এর শেষ অধ্যায়ে তথা একাদশ অধ্যায়ে কবি নীলাচলে চৈতন্যদেবের ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথায় নিয়োজিত থাকবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এরকমই একদিন চৈতন্যদেব ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথায় যখন নিয়োজিত তখন অদ্বৈতাচার্য সেখানে এসে উপস্থিত হন। চৈতন্যদেব প্রফুল্ল চিত্তে অদ্বৈতাচার্যকে প্রশ্ন করেন—

> ''সন্তোষে বোলেন প্রভু 'কহ ত আচার্য্য!
> কোথা হৈতে আইলা, করিলা কোন কার্য্য?' ৭''৫০৩

অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবের এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে জানান— জগন্নাথদেবকে দর্শন করে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্যকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন — জগন্নাথ দর্শন করে তিনি আর কি করেছেন? তখন অদ্বৈতাচার্য বলেন— জগন্নাথ দর্শন করবার পর তিনি পাঁচ সাতবার বিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করেছেন। অদ্বৈতাচার্যের এই কথা শুনে চৈতন্যদেব তাঁকে বলেন যে তিনি পরাজিত হয়েছেন। অদ্বৈতের পরাজিত হবার কারণ হিসাবে চৈতন্যদেব বলেন —

> ''প্রভু বোলে 'সামগ্রী শুনহ হারিবার।
> তুমি যে করিলা প্রদক্ষিণব্যবহার।। ১৩
> যত-ক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিগেরে চলিলা।
> তত-ক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা।।' ১৪'' [৫০৪]

অর্থাৎ, চৈতন্যদেব বলেন যে, অদ্বৈতচার্য যখন জগন্নাথকে প্রদক্ষিণ করতে পেছনের দিকে গিয়েছিলেন তখন তিনি জগন্নাথের মুখ দর্শন করতে পারেন নি। আর এই কারণে চৈতন্যদেব নিজে যতক্ষণ ধরে জগন্নাথ দর্শন করেন ততক্ষণ জগন্নাথের মুখ ছাড়া অন্য কোন দিকে চোখ ঘোরান না। চৈতন্যদেবের

কাছে এই তত্ত্বকথা শ্রবণ করে অদ্বৈতাচার্য তখন নিজের পরাজয় স্বীকার করেন।

এরপর গদাধর একদিন চৈতন্যদেবকে বলেন — তিনি পূর্বে যে দীক্ষামন্ত্র নিয়েছিলেন সেই ইষ্টমন্ত্র তাঁর মনে ভালমত স্ফুরিত হয় নি। অর্থাৎ, ইষ্টদেবের রূপ তাঁর চিত্তে ভালভাবে প্রকাশ পায় না। কারণ হিসাবে গদাধর বলেন — তিনি দীক্ষামন্ত্র কারো কাছে প্রকাশ করেছিলেন বলেই আজ তাঁর এরূপ অবস্থা। এরপর গদাধর চৈতন্যদেবের কাছে অনুরোধ করেন সেই দীক্ষামন্ত্র পুনরায় তাঁর কর্ণগোচর করবার জন্য। কিন্তু চৈতন্যদেব গদাধরকে বলেন—

''প্রভু বোলে 'তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান — তথা অপরা হয় পাছে।। ২৫
মন্ত্রের কি দায় প্রাণো আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার।।' ২৬''[৫০৫]

অর্থাৎ, দীক্ষাগুরু প্রকট থাকা অবস্থায় অপর কোন মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করা যে বৈষ্ণবীয় শিষ্টাচার সম্মত নয়, তাই গদাধরের মাধ্যমে জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন চৈতন্যদেব। এরপর গদাধর জানিয়েছেন, তাঁর দীক্ষাগুরু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি যেহেতু নীলাচলে অবস্থান করেন না তাই চৈতন্যদেব যেন তাঁকে দীক্ষা দান করেন। তখন চৈতন্যদেব গদাধরকে বলেন — তাঁর গুরুদেব পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি দশ দিনের মধ্যেই নীলাচলে আসবেন তাঁকে দর্শন করতে। এরূপ ইষ্টমন্ত্র বা দীক্ষামন্ত্র সম্পর্কে তত্ত্বকথা আলোচনার পর চৈতন্যদেব পরমানন্দে গদাধরের কাছে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন। চৈতন্যদেব এই সময় কৃষ্ণপ্রেমাবেশে এতই বিভোর হয়ে পড়েছিলেন যে সর্বদাই কৃষ্ণনাম কীর্তন করতেন। চৈতন্যদেবের প্রেমানন্দে নৃত্যের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে সঙ্কীর্তন করতেন স্বরূপ দামোদর। চৈতন্যদেব এই স্বরূপ দামোদর ও পরমানন্দ পুরী গোস্বামীকে তাঁর নীলাচলের পার্ষদদের মধ্যে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন বলে কবি জানিয়েছেন —

''দামোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী।। ৪৭
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ।। ৪৮''[৫০৬]

আবার এই স্বরূপ দামোদরই যে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের অন্তরঙ্গ পার্ষদ পুরুষোত্তম আচার্য— এথাও কবি জানিয়েছেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করলে পুরুষোত্তম আচার্যও বারাণসীতে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তখনই তাঁর নব নামকরণ হয়— স্বরূপ দামোদর। সুতরাং লক্ষণীয়, কবি চৈতন্যদেবের জীবন চরিত বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর অনুচর পার্ষদগণেরও অণুপুঙ্ক্ষ পরিচয় দান করেছেন।

এরপর কবি চৈতন্যদেবের প্রেমাবিষ্ট হয়ে কূপমধ্যে পড়ে যাবার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমাবেশে সম্যকরূপে যে বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন কবি তাই প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য আশ্চর্যের বিষয় যে কূপমধ্যে পড়ে গেলেও চৈতন্যদেবের অঙ্গের কোথাওই ক্ষতের সৃষ্টি হয় নি। কবি নিজেও বলেছেন —

> ‘‘এ কোন্ অদ্ভুত ! যাঁর ভক্তির প্রভাবে।
> বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কন্টক না লাগে।। ৬২’’[৫০৭]

এরপর অদ্বৈত ও সকল ভক্ত মিলে চৈতন্যদেবকে কূপমধ্য থেকে উত্তোলন করেন। অর্থাৎ প্রেমভক্তির আবেশে চৈতন্যদেব যে সম্পূর্ণ রূপে বাহ্যজ্ঞান হীন হয়ে পড়েছিলেন তা কবির বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি।

এভাবে চৈতন্যদেব প্রেমাবেশে যখন সম্যক রূপে বাহ্যজ্ঞানহীন তখন পুণ্ডীরক বিদ্যানিধি নীলাচলে আসেন এবং চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন। এখানেই পুণ্ডীরক বিদ্যানিধির সঙ্গে আবার স্বরূপ দামোদরের পরিচয় হয় এবং উভয়েই পরস্পরের প্রতি বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ করেন। চৈতন্যদেব বিদ্যানিধিকে কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করতে বললে তিনি এই কথা শ্রবণে মহা সন্তোষ প্রকাশ করেন। আবার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে গদাধর পুনর্বার দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন বলেও কবি জানিয়েছেন। এরপর কবি গদাধরের নিজের মুখে স্বীকার করা বিদ্যানিধির মহিমা কথা বর্ণনা করেছেন। কবি জানিয়েছেন — বিদ্যানিধি নীলাচলে এলে চৈতন্যদেব তাঁকে সমুদ্রের কাছে ‘যমেশ্বর’ আশ্রমে থাকতে দেন। এমন সময় ‘ওড়ন ষষ্ঠী’ নামে জগন্নাথের এক উৎসব উপস্থিত হয়। এই ‘ওড়ন ষষ্ঠী’-তে জগন্নাথদেবকে নতুন কাপড় পরিধান করানো হয়। সেবারও ‘ওড়ন ষষ্ঠী’তে জগন্নাথের সেবকগণ জগন্নাথকে মাড়যুক্ত বসন দিয়েছিলেন বলে বিদ্যানিধি তা দর্শন করে স্বরূপ দামোদরের কাছে অভিযোগ করেন। কারণ শাস্ত্রানুযায়ী মাড়যুক্ত কাপড় ধুয়ে নিয়েই পরা উচিত। কিন্তু দামোদর বলেন — হয়ত জগন্নাথদেবেরই এই মাড়যুক্ত কাপড় পরবার ইচ্ছা, নইলে রাজাই বা কেন নিষেধ করেন না। তখন বিদ্যানিধি জগন্নাথের সেবকদেরও একই রীতি পালন করবার জন্য সমালোচনা করেন। এভাবে জগন্নাথের সেবকদের নিন্দা ও সমালোচনা করে বিদ্যানিধি নীলাচলের বাসায় ফিরে গিয়ে শয়ন গ্রহণ করলে স্বপ্নযোগে জগন্নাথ ও বলরাম আবির্ভূত হন এবং জগন্নাথ সেবকের নিন্দা-সমালোচনা করবার জন্য শাস্তিরূপে বিদ্যানিধির গালে চড় মারেন। তখন বিদ্যানিধি নিজ অপরাধ স্বীকার করে জগন্নাথ চরণ ধরে ক্রন্দন করলে জগন্নাথ তাঁর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন বলে কবি জানিয়েছেন। এভাবে কবি পুণ্ডরিক বিদ্যানিধির স্বপ্নযোগে জগন্নাথ দর্শনের সৌভাগ্য বর্ণনা করে ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যের পরিসমাপ্তি দান করেছেন। তবে লক্ষণীয়, চৈতন্যদেবের শেষ পর্যায়ের জীবনকথাকে কিন্তু কবি বিন্দাবন দাস বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করেন নি তাঁর ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যে। মনে হয় কবি যেন হঠাৎ করে তাঁর কাব্যটি থামিয়ে দিয়েছেন।

তবে কবি তাঁর ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যটিকে যে সহজ-সরল ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় সর্বজনচিত্তাকর্ষী করে তুলেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সুকুমার সেন প্রসঙ্গতই মন্তব্য করেছেন যে— ‘‘রচনা

গৌরবে 'চৈতন্যভাগবত' বাংলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদার অধিকারী। লেখকের মন বিষয়ের সঙ্গে এমন জড়াইয়া গিয়াছে যে তাঁহার স্পষ্ট অত্যুক্তিও বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয় না। কবির বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের কিছুমাত্র অভাব নাই।"[৫০৮] অর্থাৎ এই কাব্যের কিছু কিছু অংশের যে অলৌকিকতা রয়েছে তা আমরা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু স্বীকার করতেই হয় কবির বর্ণনার গুণে সেই সব অলৌকিকতা বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। আবার এই জীবনীকাব্যে চৈতন্য জীবন কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি চৈতন্যসমসাময়িক নবদ্বীপ তথা বাংলার যে সমাজ চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন তাও বাস্তব সম্মত হয়ে উঠেছে। তবে সব কিছুর উর্দ্ধে চৈতন্যদেবের বাল্য ও কৈশোরলীলা বর্ণনায় কবি যে বাস্তবতার ও সরসতার পরিচয় দিয়েছেন, তা অন্য কোন চৈতন্যজীবনী কাব্যে প্রত্যক্ষগোচর হয় না। এক কথায় চৈতন্যদেবের মানবমূর্তি ও ভগবৎ মূর্তি — এই উয়কেই সমান গুরুত্ব দিয়ে চিত্রিত করেছেন বৃন্দাবন দাস। তবে ভগবৎ মূর্তির অন্তরালে চৈতন্যদেবের মানব সত্তাটাই কোথাও যেন বেশি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আবার লক্ষণীয়, কাব্যটিতে বৃন্দাবন দাসের যে কবিত্বশক্তির পরিচয় পাই তাও বেশ প্রশংসনীয়। বর্ণনার পরিচ্ছন্নতা, করুণ বেদনাময় আবেগ-ব্যাকুলতা, কিংবা উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলংকার ব্যবহারের দিক দিয়েও প্রথম শ্রেণির কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন কবি। তাই পরিশেষে বলতে হয়, 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যটি শুধুমাত্র এক মহাপুরুষের জীবনালেখ্য হয়নি, কবির বর্ণনার গুণে সমসাময়িক গৌড়ের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রের বাস্তব প্রতিবিম্বও হয়ে উঠেছে। আর এদিক থেকেও কাব্যটির বিশেষ মূল্য স্বীকার করতেই হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. মজুমদার, বিমানবিহারী	-	শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃ. ১৮০
২. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত)	-	বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত', আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, সাধনা প্রকাশনী, ৭৫/২ বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪, ১ম প্রকাশ-আষাঢ়, ১৩৭৩, শকাব্দ -১৮৮৮; চৈতন্যাব্দ ৪৮৯, জুন ১৯৬৬, নবকলেবর- আষাঢ়, ১৪১৯, জুন, ২০১২, পৃ. ৩৮।
৩. তদেব,	-	মধ্যখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪০২।
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার	-	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতন্যযুগ, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংকরণ - ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৮-০৯, পৃ. ২২০।

৫. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) - বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত', অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, সাধনা প্রকাশনী, ৭৫/২ বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪, ১ম প্রকাশ-আষাঢ়, ১৩৭৩, শকাব্দ -১৮৮৮; চৈতন্যাব্দ ৪৮৯, জুন ১৯৬৬, নবকলেবর- আষাঢ়, ১৪১৯, জুন, ২০১২, পৃ.২৪৯।

৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১০-১১১।

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতন্যযুগ, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংকরণ - ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৮-০৯, পৃ. ২২০।

৮. তদেব, - দ্বিতীয় খণ্ড, চৈতন্যযুগ, পৃ. ২২৬।

৯. মজুমদার, বিমানবিহারী - শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃ. ১৮৫।

১০. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) - বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত', মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাধনা প্রকাশনী, ৭৫/২ বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪, ১ম প্রকাশ-আষাঢ়, ১৩৭৩, শকাব্দ -১৮৮৮; চৈতন্যাব্দ ৪৮৯, জুন ১৯৬৬, নবকলেবর- আষাঢ়, ১৪১৯, জুন, ২০১২, পৃ. ১১০-১১১।

১১. তদেব, - আদি খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৫৭।

১২. মজুমদার, বিমানবিহারী - শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃ. ১৮৯।

১৩. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) - কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' আদিলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, সাধনা প্রকাশনী, ৬৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ-২১শে চৈত্র, ১৩৬৯ সন, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৩ খ্রিঃ, পৃ. ৫৯৯-৬০০।

১৪. তদেব, - আদিলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬০১।

১৫. তদেব, - আদিলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬৩৬।

১৬. ঠাকুর, গৌরগুণানন্দ - শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, শ্রীখণ্ড, বর্ধমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, সন ১৩৬১ সাল, ২৪ শে কার্ত্তিক, পৃ. ৫৪।

১৭. মজুমদার, বিমানবিহারী - শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃ. ২৫৬।

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পা.)- দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, আর্য ম্যানসন, নবম তল, ৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, প্রকাশকাল, পর্ষদ কর্তৃক দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৯১/বি, পৃ. ৩৬৪।

১৯. সেন, সুকুমার - বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, দশম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০১১, পৃ. ২৬২-২৬৩।

২০. মজুমদার, বিমানবিহারী - শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃ. ১৮৯-১৯০।

২১. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) - বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত', আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, সাধনা প্রকাশনী, ৭৫/২ বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪, ১ম প্রকাশ-আষাঢ়, ১৩৭৩, শকাব্দ-১৮৮৮; চৈতন্যাব্দ ৪৮৯, জুন ১৯৬৬, নবকলেবর-আষাঢ়, ১৪১৯, জুন, ২০১২, পৃ. ৪১।

২২. তদেব, - আদি খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪৪।

২৩. তদেব, - আদি খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫০।

২৪. তদেব, - আদি খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫২।

২৫. তদেব, - আদি খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ভূমিকা-৫।

২৬. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) - বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত', আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, সাধনা প্রকাশনী, ৭৫/২ বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা-৩৪, ১ম প্রকাশ-আষাঢ়, ১৩৭৩, শকাব্দ -১৮৮৮; চৈতন্যাব্দ ৪৮৯, জুন ১৯৬৬, নবকলেবর- আষাঢ়, ১৪১৯, জুন, ২০১২, পৃ. ২।

২৭. তদেব, - আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ২।

২৮. তদেব, - আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ.১১।

২৯. তদেব, - আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১২।

৩০. তদেব, - আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৮।

৩১. তদেব, - আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩৮।

৩২. তদেব, - আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩৮।

৩৩. তদেব, - আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩৯-৪০।

৩৪. তদেব, - আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪১।

৩৫. তদেব, - আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ.৪২।

৩৬. তদেব, - আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫২।

৩৭. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৫৩।

৩৮. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৫৭।

৩৯. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৬১।

৪০. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৬৭।

৪১. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৬৮।

৪২. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৬৯।

৪৩. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭০।

৪৪. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭০।

৪৫. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭১।

৪৬. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭১।

৪৭. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭১-৭২।

৪৮. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭৬।

৪৯. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৮২।

৫০. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৮৪।

৫১. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৯৮।

৫২. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৯৮।

৫৩. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১০৫।

৫৪. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১০৫।

৫৫. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১০৫।

৫৬. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১০৫।

৫৭. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১০৭।

৫৮. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১০৭।

৫৯. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১০৭।

৬০. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১২।

৬১. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১২।

৬২. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৩।

৬৩. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৪।

৬৪. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৫।

৬৫. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৬।

৬৬. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৬।

৬৭. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৬।

৬৮. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৮।

৬৯. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৮।

৭০. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৮।

৭১. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২০।

৭২. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২০।

৭৩. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২০।

৭৪. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২০।

৭৫. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২২।

৭৬. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৩।

৭৭. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৩।

৭৮. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৪।

৭৯. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৭।

৮০. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৮।

৮১. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৮।

৮২. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৯।

৮৩. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৯।

৮৪. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৯।

৮৫. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩০।

৮৬. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩০।

৮৭. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩০।

৮৮. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩১।

৮৯. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩১।

৯০. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩২।

৯১. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩৩।

৯২. তদেব, - আদিখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩৬।

৯৩. তদেব, - আদিখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৩।

৯৪. তদেব, - আদিখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৩।

৯৫. তদেব, - আদিখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৪।

৯৬. তদেব, - আদিখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৭।

৯৭. তদেব, - আদিখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৮।

৯৮. তদেব, - আদিখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৮।

৯৯. তদেব, - আদিখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৫১।

১০০. তদেব, - আদিখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৫৩।

১০১. তদেব, - আদিখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৫৯।

১০২. তদেব, - আদিখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৫৯।

১০৩. তদেব, - আদিখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৬০।

১০৪. তদেব, - আদিখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৬৩।

১০৫. তদেব, - আদিখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৬৬।

১০৬. তদেব, - আদিখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৭৮।

১০৭. তদেব, - আদিখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৭৯।

১০৮. তদেব, - আদিখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৮৪।

১০৯. তদেব, - আদিখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৮৫।

১১০. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৯১।

১১১. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৯২।

১১২. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৯৩।

১১৩. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৯৪।

১১৪. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৯৫।

১১৫. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৯৮।

১১৬. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৯৯।

১১৭. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২০১।

১১৮. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২০৩।

১১৯. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২০৪।

১২০. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২০৪।

১২১. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২০৪।

১২২. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২০৫।

১২৩. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২১১।

১২৪. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২১৪।

১২৫. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২১৪।

১২৬. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২২৩।

১২৭. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২২৭।

১২৮. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৩৯।

১২৯. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৪৫।

১৩০. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৪৬।

১৩১. তদেব, - আদিখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৫১।

১৩২. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৫৪।
১৩৩. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৫৭।
১৩৪. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৫৯।
১৩৫. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৬০।
১৩৬. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৬০।
১৩৭. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৬১।
১৩৮. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৬২।
১৩৯. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৬৪।
১৪০. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৬৪।
১৪১. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৬৬।
১৪২. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৭৪।
১৪৩. তদেব, - আদিখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৭৫।
১৪৪. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৮৭।
১৪৫. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৮৮।
১৪৬. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৮৯।
১৪৭. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৯০।
১৪৮. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৯৩।
১৪৯. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৯৫।
১৫০. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৯৭।
১৫১. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৯৮।
১৫২. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ৩০০।
১৫৩. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ৩০৩।
১৫৪. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ৩০৪।
১৫৫. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ৩০৪।
১৫৬. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ৩০৫।
১৫৭. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ৩০৭।
১৫৮. তদেব, - আদিখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ৩১৩।
১৫৯. তদেব, - আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩১৯।
১৬০. তদেব, - আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩২১।
১৬১. তদেব, - আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩২৪।
১৬২. তদেব, - আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩২৬।
১৬৩. তদেব, - আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩৩২।

১৬৪. তদেব, - আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩৪০।

১৬৫. তদেব, - আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩৪০।

১৬৬. তদেব, - আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩৪২।

১৬৭. তদেব, - আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩৪৩।

১৬৮. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৪৮।

১৬৯. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৪৯।

১৭০. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৫২।

১৭১. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৫৩।

১৭২. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৫৩।

১৭৩. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৫৪।

১৭৪. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৫৫।

১৭৫. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৫৮।

১৭৬. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৫৯।

১৭৭. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৬০।

১৭৮. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৬৫।

১৭৯. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৭২।

১৮০. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৭৩।

১৮১. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৭৫।

১৮২. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৭৭।

১৮৩. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৮৪।

১৮৪. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৮৬।

১৮৫. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৮৬।

১৮৬. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৮৭।

১৮৭. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৮৭।

১৮৮. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৮৭।

১৮৯. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৮৯।

১৯০. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৯০।

১৯১. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৯৪।

১৯২. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৯৪।

১৯৩. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৯৫।

১৯৪. তদেব, - আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৯৬।

১৯৫. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৯৮।

১৯৬. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৯৮।

১৯৭. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৯৯।

১৯৮. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৯৯।

১৯৯. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪০০।

২০০. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪০১।

২০১. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪০১।

২০২. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪০৬।

২০৩. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪০৬।

২০৪. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪০৬।

২০৫. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪০৯।

২০৬. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪১২।

২০৭. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪১৩।

২০৮. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪১৬।

২০৯. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪১৮।

২১০. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪২০।

২১১. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪২৫।

২১২. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪২৯।

২১৩. তদেব, - আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৩৫।

২১৪. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৩৭।

২১৫. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৩৮।

২১৬. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৪২।

২১৭. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৪৪।

২১৮. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৪৫।

২১৯. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৪৯।

২২০. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৫২।

২২১. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৫৫।

২২২. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৫৫।

২২৩. তদেব, - আদিখণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৫৬।

২২৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪।

২২৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪।

২২৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪।

২২৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫।

২২৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫।

২২৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৭।

২৩০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৮।

২৩১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৮।

২৩২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১১।

২৩৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৩।

২৩৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৫।

২৩৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৬।

২৩৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৮।

২৩৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ২১।

২৩৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ২৯।

২৩৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩০।

২৪০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩৫।

২৪১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪৩।

২৪২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪৪।

২৪৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪৪।

২৪৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪৯।

২৪৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫০।

২৪৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫০।

২৪৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫৩।

২৪৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫৪।

২৪৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫৪।

২৫০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫৬।

২৫১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫৮।

২৫২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৬৩।

২৫৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৬৫।

২৫৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৬৬।

২৫৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৬৭।

২৫৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৬৯।

২৫৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৭০।

২৫৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৭১।

২৫৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৭৩।

২৬০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৭৮।

২৬১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৭৮।

২৬২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৭৯।

২৬৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৮১।

২৬৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৮১।

২৬৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৮২।

২৬৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৮৩।

২৬৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৮৩।

২৬৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৮৪।

২৬৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৮৬।

২৭০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৯০।

২৭১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৯১।

২৭২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৯৪।

২৭৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৯৪।

২৭৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৯৮।

২৭৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১০৫।

২৭৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১০৬।

২৭৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১১১।

২৭৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১১৩।

২৭৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১১৪।

২৮০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৫।

২৮১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৪।

২৮২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৬।

২৮৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৬।

২৮৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১২৯।

২৮৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩৩।

২৮৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৪০।

২৮৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৫।

২৮৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৫১।

২৮৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৫৬।

২৯০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৫৯।

২৯১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৬২।

২৯২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৬৮।

২৯৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৭৩।

২৯৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৮১।

২৯৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৮৩।

২৯৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৮৯।

২৯৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৯২।

২৯৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ১৯৩।

২৯৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২০৫।

৩০০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২০৫।

৩০১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২১২।

৩০২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২১৫।

৩০৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২১৬।

৩০৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২২০।

৩০৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২২১।

৩০৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২২১।

৩০৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২২২।

৩০৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২২৪।

৩০৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২২৪।

৩১০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২২৬।

৩১১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৩১।

৩১২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৩৪।

৩১৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৩৫।

৩১৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৩৮।

৩১৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৩৯।

৩১৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৪০।

৩১৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৪১।

৩১৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৪২।

৩১৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৪৩।

৩২০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৪৩।

৩২১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৪৭।

৩২২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৫৪।

৩২৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৫৪।

৩২৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৫৭।

৩২৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৫৯।

৩২৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৭০।

৩২৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৪৮।

৩২৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৮৬।

৩২৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, নবম অধ্যায়, পৃ. ২৯১।

৩৩০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, নবম অধ্যায়, পৃ. ২৯৪।

৩৩১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, নবম অধ্যায়, পৃ. ২৯৫।

৩৩২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩০৫।

৩৩৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩১১।

৩৩৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩১৮।

৩৩৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩১৮-৩১৯।

৩৩৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩২০।

৩৩৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩২২।

৩৩৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩২৪।

৩৩৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩২৫।

৩৪০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৩৪।

৩৪১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৩৫।

৩৪২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৪৮।

৩৪৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৫৩।

৩৪৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৫৮।

৩৪৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৮০।

৩৪৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৮৪।

৩৪৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৮৬।

৩৪৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৯৩।

৩৪৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৯৫।

৩৫০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৯৯।

৩৫১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৯৯।

৩৫২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪০৫।

৩৫৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৪০৮।

৩৫৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৪১০।

৩৫৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৪১৬।

৩৫৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৪২১।

৩৫৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৪২৩।

৩৫৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৩৪।

৩৫৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৩৭।

৩৬০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৬৭।

৩৬১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, প্রথমার্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৭১।

৩৬২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, চতুর্দশ অধ্যায়, পৃ. ৩।

৩৬৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃ. ১০।

৩৬৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃ. ২০।

৩৬৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃ. ২৩।

৩৬৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষোড়শ অধ্যায়, পৃ. ২৪।

৩৬৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষোড়শ অধ্যায়, পৃ. ২৪।

৩৬৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষোড়শ অধ্যায়, পৃ. ৩৫।

৩৬৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষোড়শ অধ্যায়, পৃ. ৪০।

৩৭০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষোড়শ অধ্যায়, পৃ. ৪৩।

৩৭১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, সপ্তদশ অধ্যায়, পৃ. ৪৯।

৩৭২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, সপ্তদশ অধ্যায়, পৃ. ৬৫।

৩৭৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, সপ্তদশ অধ্যায়, পৃ. ৭১।

৩৭৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, সপ্তদশ অধ্যায়, পৃ. ৭২।

৩৭৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃ. ৭৩।

৩৭৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃ. ৭৪।

৩৭৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃ. ৭৫।

৩৭৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃ. ৭৭।

৩৭৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, পৃ. ১০৪।

৩৮০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ঊনবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১১৬।

৩৮১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ঊনবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১১৮।

৩৮২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ঊনবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১২২।

৩৮৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ঊনবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৩৬।

৩৮৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ঊনবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৪২।

৩৮৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ঊনবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৫৬-১৫৭।

৩৮৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ঊনবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৪৯।

৩৮৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, বিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৬২।

৩৮৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, বিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৬৫।

৩৮৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, বিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৬৯।

৩৯০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, বিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৭২।

৩৯১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, বিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৭৭।

৩৯২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, একবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৮২।

৩৯৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, একবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৮৪।

৩৯৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, একবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৮৭।

৩৯৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, একবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৯০।

৩৯৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৯৩।

৩৯৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৯৪।

৩৯৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ.১৯৬।

৩৯৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৯৭।

৪০০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২০০।

৪০১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২০২।

৪০২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ.২০৩।

৪০৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ.২০৩।

৪০৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ.২০৫।

৪০৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ.২০৬।

৪০৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ.২১৩।

৪০৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২১৪।

৪০৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২১৭।

৪০৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২১৮।

৪১০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২১৯।

৪১১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৩১-২৩২।

৪১২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৩৩।

৪১৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৩৮।

৪১৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৫৮।

৪১৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৬১।

৪১৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৭৭।

৪১৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, চতুর্বিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৮০।

৪১৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, চতুর্বিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৮২।

৪১৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, চতুর্বিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৯৬।

৪২০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, পঞ্চবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৯৮।

৪২১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ,পঞ্চবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২৯৯।

৪২২. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ,পঞ্চবিংশ অধ্যায়, পৃ. ৩০২।

৪২৩. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ,পঞ্চবিংশ অধ্যায়, পৃ. ৩০৪।

৪২৪. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ,পঞ্চবিংশ অধ্যায়, পৃ. ৩১৫।

৪২৫. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষড়বিংশ অধ্যায়, পৃ. ৩৩৪।

৪২৬. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষড়বিংশ অধ্যায়, পৃ. ৩৩৭।

৪২৭. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষড়বিংশ অধ্যায়, পৃ. ৩৪৭।

৪২৮. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষড়বিংশ অধ্যায়, পৃ. ৩৫০।

৪২৯. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষড়বিংশ অধ্যায়, পৃ. ৩৫৪।

৪৩০. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষড়বিংশ অধ্যায়, পৃ. ৩৫৮।

৪৩১. তদেব, - মধ্যখণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ, ষড়বিংশ অধ্যায়, পৃ. ৩৬৭।

৪৩২. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ২।

৪৩৩. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১০।

৪৩৪. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৩।

৪৩৫. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৮।

৪৩৬. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৩২।

৪৩৭. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৩৪।

৪৩৮. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৩৭।

৪৩৯. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৪৭।

৪৪০. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৫৪।

৪৪১. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৫৬।

৪৪২. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৫৮।

৪৪৩. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৫৯।

৪৪৪. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৬১।

৪৪৫. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭০-৭১।

৪৪৬. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ৭৮।

৪৪৭. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৮৩।

৪৪৮. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৯৮।

৪৪৯. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৫।

৪৫০. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৮।

৪৫১. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১১৯।

৪৫২. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩২।

৪৫৩. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৩৫।

৪৫৪. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৪১।

৪৫৫.তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৪।

৪৫৬. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৫।

৪৫৭. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৮।

৪৫৮. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৪৯।

৪৫৯. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৫১।

৪৬০. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৭৪।

৪৬১. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৭৭।

৪৬২. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৭৮।

৪৬৩. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ১৮৩।

৪৬৪. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৯১।

৪৬৫. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৯৪।

৪৬৬. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৯৫।

৪৬৭. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৯৬।

৪৬৮. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১৯৮।

৪৬৯. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২০৪।

৪৭০. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২০৯।

৪৭১. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২১২।

৪৭২. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২১৩।

৪৭৩. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২২২।

৪৭৪. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২২২।

৪৭৫. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২২৭।

৪৭৬. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২৩০।

৪৭৭. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২৩১।

৪৭৮. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ২৩৫।

৪৭৯. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৪২।

৪৮০. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৪৯।

৪৮১. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৫৩।

৪৮২. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৬৪।

৪৮৩. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, পৃ. ২৭০।

৪৮৪. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৭২।

৪৮৫. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৭৩।

৪৮৬. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৭৪।

৪৮৭. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৮১।

৪৮৮. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, অষ্টম অধ্যায়, পৃ. ২৮৫।

৪৮৯. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ২৯৩।

৪৯০. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ২৯৭।

৪৯১. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩০০।

৪৯২. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৩০২।

৪৯৩. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩০৭।

৪৯৪. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩০৮।

৪৯৫. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩১১।

৪৯৬. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩১৩।

৪৯৭. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩১৩।

৪৯৮. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩১৪।

৪৯৯. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩২৫।

৫০০. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩২৭।

৫০১. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩২৮।

৫০২. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, পৃ. ৩৩১।

৫০৩. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৪৭।

৫০৪. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৪৮।

৫০৫. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৪৯।

৫০৬. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৫১।

৫০৭. তদেব, - অন্ত্যখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩৫৩।

৫০৮. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) - বৃন্দাবন দাস বিরচিত ‘চৈতন্যভাগবত’, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী-০১, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ.‘ভূমিকা’ অংশ-৬।